



- বাংলাবুক.অর্গ -

অ্যাভি মুলিগান

দ্বিগুণ

অনুবাদ : শাহেদ জামান

ব্রাজিলের এক শহরে, আবর্জনার ভাগাড়ের মধ্যে ছেলেগুলোর বসবাস, একদিন সেই আবর্জনা ঘেঁটে অসাধারণ একটি জিনিস পেয়ে গেলো তারা-মারাত্মক একটি সিক্রেট। সেই থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে বেড়াতে শুরু করলো নির্দয় কিছু লোকজন, যাদের কাছে টোকাই ছেলেগুলোর জীবন আবর্জনার চেয়ে বেশি কিছু না। ভয়ঙ্কর বিপদ ছেলেগুলোকে তাড়িয়ে বেড়ালো শহরের নোংরা অংশ থেকে শুরু করে অভিজাত আর সম্পদশালীদের এলাকা পর্যন্ত। কিন্তু এভাবে পালিয়ে থাকতে পারে না তারা, এর থেকে বাঁচতে হলে তাদের প্রয়োজন অলৌকিক কোনো কিছুর। তারা কি সেটার দেখা পাবে?

এ প্রশ্নের জবাব পাঠক পাবেন অ্যান্ডি মুলিগানের সাড়া জাগানো উপন্যাস 'ট্র্যাশ'-এ। দুরন্ত গতিময়তার সাথে পাঠক আশ্চর্য রকমের সাযুজ্য খুঁজে পাবেন আমাদের দেশের নোংরা রাজনীতির সাথেও।

‘অসাধারণ একটি উপন্যাস...বৈচিত্র্যপূর্ণ, তুমুল উত্তেজনাধার আর দক্ষহাতে লেখা।’

– জন বয়েন, দ্য বয় ইন দি স্ট্রাইপড পাজামাস-এর লেখক

‘দুর্দান্ত প্লট, আকর্ষণীয় চরিত্র আর গতিময়তার কারণে ট্র্যাশ পাঠককে মুগ্ধ করবে।’

– দ্য বুকসেলার

‘বছরের সেরা রোমাঞ্চকর এবং অরিজিনাল একটি গল্প।’

– ডেইলি মেইল

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

www.BanglaBook.org

<http://www.facebook.com/pages/batighar-prokashoni>



অ্যান্ডি মুলিগান বড় হয়েছেন দক্ষিণ লন্ডনে। দশ বছর থিয়েটার ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করার পর এশিয়ায় ঘুরতে গিয়ে সিদ্ধান্ত নেন শিক্ষক হবার। ব্রিটেন, ভারত, ব্রাজিল এবং ফিলিপাইনে ইংরেজি এবং ড্রামা শিখিয়েছেন তিনি। এখন কাজ করছেন লন্ডন আর ম্যানিলায়।

তার নিউ ইয়র্ক টাইমস বেস্টসেলার উন্যাস *ট্র্যাশ*-এর কল্যাণে হলিউড পর্যন্ত তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে।


অ্যাভি মুনিগান

দ্র্যাপ

 *The Online Library of Bangla Books*
BanglaBook.org

অনুবাদ : শাহেদ জামান


পাণ্ডিত্য প্রকাশনী


বাতিঘর প্রকাশনী

ট্রাশ

মূল : অ্যান্ডি মুলিগান

অনুবাদ : শাহেদ জামান

Trash

Copyright©2018 by Andy Mulligan

অনুবাদস্বত্ব © বাতিঘর প্রকাশনী

প্রচ্ছদ : ডিলান

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১৮

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয়তলা),
ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ:
একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর;
গ্রাফিক্স: ডটপ্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার; কম্পোজ : অনুবাদক

মূল্য : দুইশত বিশ টাকা মাত্র

 *The Online Library of Bangla Books*
BanglaBook.org

উৎসর্গ :

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিনভাইকে...

ফ্রেন্ড অ্যান্ড ফিলোসফার গাইড

বুক কোড সম্পর্কে আমি প্রথম জানতে পারি জন লে কার-এর একটা বইতে। খুব সাধারণ একটা কোড, যেটা বুঝতে পারে শুধু একটা বিশেষ বইয়ের দুটো কপিধারী দুজন মানুষ। যেমন, আমি যদি জানি যে আপনার কাছে আন্ডার দ্য ভলকানোর পেন্সুইন ১৯৭৫ সংস্করণটা আছে, তাহলে আমি আমার কপিটা বের করে এভাবে বলতে পারি :

234•15•1•3•3•7•4•16 •4/8• 2•6 •15•5•3•16 •
2•3•4•19•16•

এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে প্রথমটি। এটা আসলে পৃষ্ঠা নাম্বার। এই পৃষ্ঠায় যাওয়ার পর চলে যান পনেরো নাম্বার লাইনে, যেখানে প্রথম অক্ষর হচ্ছে একটা বড় হাতের 'বি'। এবার সেখান থেকে যেতে হবে তিন নাম্বার লাইনে, তৃতীয় অক্ষরে। পাওয়া যাবে 'ই'। এভাবে চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত যা জানা যাবে তা হলো বেস্ট। এবার একটা স্ল্যাশ বা বাঁকা দাগ, মানে পরের পৃষ্ঠায় যেতে হবে। আট লাইন নেমে যাওয়ার পর দ্বিতীয় অক্ষরটা হলো 'ডব্লিউ'। এভাবে পাওয়া যাবে উইশেস।

তার মানে বাঁকা দাগগুলো হলো পৃষ্ঠা ওল্টানোর সংকেত, আর নতুন শব্দ তৈরি হওয়ার। বাম থেকে ডানে গোণার সময় ফাঁকা জায়গা এবং বিরতিচিহ্নগুলোকেও অক্ষর হিসেবে ধরতে হবে। বিভ্রান্তি দূর করার জন্য ইনডেন্ট করা লাইনগুলো অগ্রাহ্য করা যেতে পারে। কিন্তু এমনিতেও এই পদ্ধতিতে অসংখ্য বিন্যাস তৈরি করা সম্ভব, আর নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী নিয়মগুলো সাজানো যায়। বুক কোডের সবচেয়ে মজার দিকটি হলো, সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী তৈরি করা যায় এটি।

কোড ভাঙতে হলে কোনো বই ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা জানা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। হোসে অ্যাঞ্জেলিকো যে কোড ব্যবহার করেছে তা নেয়া হয়েছে বাইবেলের ১৯৮৪ সালের কিং জেমস টমাস নেলসন সংস্করণ থেকে। গ্যাব্রিয়েল ওলোন্দ্রিজের কাছে ছিল একটা কপি, আর তার কাছে

যারা গোপন মেসেজ পাঠাত তাদের কাছেও ছিল একটা করে। কোডটাকে নিজেদের মতো বদলে নিয়েছিল তারা, ডান থেকে বামে পড়ত, আর সামনে ওল্টানোর বদলে পেছন দিকে ওল্টাত পৃষ্ঠা। আমার মনে হয়, খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ কখনও চালাচালি হতো না তাদের মধ্যে, স্রেফ ধাঁধা সমাধানের আনন্দের জন্যই কাজটা করত তারা। কিন্তু এভাবেই হোসে অ্যাঞ্জেলিকো তার পরিকল্পনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটা গোপন রেখেছিল।



বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন
বাংলা বই এর পিডিএফ
ডাউনলোড করার জন্য
আমাদের ওয়েবসাইটে
(**BANGLABOOK.ORG**)
আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :



অধ্যায় ১

আমার নাম রাফায়েল ফার্নান্দেজ, আর আমি একজন টোকাই।

মানুষ আমাকে বলে, ‘ময়লা ঘাটতে ঘাটতে কোন দিন কি পেয়ে যাবি কে জানে! হতে পারে আজই তোর সেই সৌভাগ্যের দিন।’ আমি জবাব দিই, ‘কি পাব তা আমার ভালই জানা আছে।’ সত্যি কথা বলতে, শুধু আমি নই, আর সবাই কি পেতে পারে তাও আমি জানি। এতগুলো বছর ধরে এখানে কাজ করার পর কি জোটে কপালে, তা তো দেখেই আসছি। এগারো বছর হয়ে গেল। এখানে সবচেয়ে বেশি যা পাওয়া যায় তার নাম : স্টুপ, যার অর্থ হলো-গুনে খারাপ লাগলে মাফ করবেন-মানুষের গু। কারও মন খারাপ করিয়ে দিতে চাই না আমি, আমার উদ্দেশ্য সেটা নয়। কিন্তু আমাদের শহরে অনেক কিছুই অভাব আছে, তার মধ্যে দুটো প্রধান জিনিস হলো টয়লেট এবং পানি সরবরাহ। তাই কারও যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার প্রয়োজন হয়, যেখানে পারে কাজটা সেরে নেয় সে। বেশিরভাগ মানুষই এখানে বাক্সের মধ্যে বাস করে, আর সেই বাক্সগুলো একটার উপর আরেকটা-এভাবে সাজানো থাকে। তাই, টয়লেট করার দরকার হলে একটা কাগজের প্যাকেটের মধ্যে কাজটা সারে তারা, তারপর সেটাকে মুড়িয়ে ছুড়ে ফেলে আবর্জনার মধ্যে। তার সাথে আসে ময়লার ব্যাগ। পুরো শহর থেকে গাড়িতে করে ময়লার ব্যাগগুলো নিয়ে আসা হয় এখানে। গাড়িতে করে, ট্রাকে করে, এমনকি ট্রেনে করেও-এই শহরে যে কি পরিমাণে আবর্জনা তৈরি হয় তা দেখলে অবাক হয়ে যাবেন। পাহাড়ের মতো উঁচু সেই ময়লার বোঝার শেষ গতি হয় আমাদের কাছে এসে। ট্রাক আর ট্রেনগুলো আসতেই থাকে, আর আমরাও কাজ করতেই থাকি। অবিশ্রান্তভাবেই ঘুরে বেড়াই সেই ময়লার মধ্যে, ঘাটাঘাটি করি।

জায়গাটার নাম বেহালা। আবর্জনার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ছোট্ট এক শহর। তিন বছর আগেও আবর্জনাগুলো যেখানে ফেলা হতো তার নাম ছিল স্মোকি মাউন্টেন। কিন্তু সেই জায়গাটার অবস্থা এত খারাপ হয়ে যায়

যে সবকিছু গুটিয়ে অন্য জায়গায় ব্যবস্থা করা ছাড়া উপায় ছিল না। আবর্জনার পাহাড় এখানে প্রায় হিমালয়ের সমান উঁচু-সারা জীবন ধরে বাইলেও মনে হয় চূড়ায় ওঠা যাবে না, এতই বিশাল। অনেকে ওঠেও...তারপর আবার নেমে আসে নিচের উপত্যকায়। ডক থেকে গুরু করে জলাভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত এই পাহাড়গুলো। জলাভূমি মানেও অবশ্য আবর্জনা, তবে সব সময় কুয়াশায় ঢাকা থাকে সেগুলো। আর এখানে যেসব টোকাই ছেলেপুলে কাজ করে আমি তাদের একজন। আমার কাজ হলো পুরো শহর থেকে যে-সব পরিত্যক্ত জিনিস বেরিয়ে আসে সেগুলো ঘাটাঘাটি করে অপেক্ষাকৃত দরকারি জিনিসগুলো খুঁজে বের করা।

‘কিন্তু তাই বলে কখনও কখনও যে আলাদা কিছু পাওয়া যায় না, এমন নিশ্চয়ই নয়?’ একজন জিজ্ঞেস করেছিল আমাকে। ‘কিছু না কিছু তো পাওয়া যাবেই, তাই না?’

অনেকে বেড়াতে আসে এখানে, বিশেষ করে বিদেশিরা। বেশ কয়েক বছর আগে একটা মিশন স্কুল স্থাপিত হয়েছিল এখানে, সেই স্কুল দেখতে আসে তারা। তাদের দেখলেই হাসি আমি, জবাব দিই, ‘মাঝে মাঝে পাই, স্যার! মাঝে মাঝে পাই, ম্যাডাম!’

তবে সত্যি কথাটা হলো-কখনওই কিছু পাওয়া যায় না, কারণ এখানে সবচেয়ে বেশি যা পাওয়া যায় তা হলো গু।

‘কী পেলি?’ প্রশ্ন করলাম গার্দোকে।

‘কী পেয়েছি বলে মনে হয় তোর?’ পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ল সে।

বুঝে ফেললাম আমি। সুন্দর কাগজের মোড়ক, দেখলেই মনে হয় ভেতরে ভালো কিছু আছে। সারপ্রাইজ! ওতে আসলে গু ছাড়া আর কিছু নেই। গায়ের জামায় হাত মুছে সামনে এগোতে গুরু করল গার্দো, আশা করছে, বিক্রি করার মতো কিছু একটা পাওয়া যাবে। সেদিন হোক আর বৃষ্টি, সারা দিন ধরে আমাদের এই একটাই কাজ।

দেখতে আসতে চান? বেহালায় পৌছানোর আগেই এর গন্ধ গিয়ে লাগবে আপনার নাকে। কমপক্ষে দুই শ ফুটবল মাঠের সমান লম্বা তো হবেই, অথবা এক হাজার বাল্কেটবল কোর্টের সমান-সঠিক জানি না আমি, কিন্তু মনে হয় যেন কোনো শেষ নেই এর। এর মধ্যে ঠিক কতখানি গু আর কতখানি অন্য জিনিস তা-ও জানা নেই আমার, কিন্তু কপাল যে-দিন খারাপ থাকে সেদিন মনে হয় গু ছাড়া এরমধ্যে আর কিছু নেই, ছিলও না

কোনোকালে। সারা জীবন ধরে তাই ঘেটে যাওয়া, তার মধ্যে নিঃশ্বাস নেয়া, রাতের বেলা তার পাশে শুয়ে ঘুমানো... শুধু একটা আশায় যে, কোনো একদিন 'ভালো কিছু' পাওয়া যাবে।

কিন্তু একদিন সত্যিই পেয়ে গেলাম।

যখন থেকে কারও সাহায্য ছাড়া হাঁটতে শিখেছি, বা জিনিসপত্র ধরতে শিখেছি দু-হাতে, তখন থেকেই আমি টোকাই। সেটা হচ্ছে আমার বয়স যখন তিন বছর তখনকার কথা। তখন থেকেই ময়লা ঘাটতে শিখে গেছি আমি।

আমরা প্রধানত কি খুঁজি তার একটু বর্ণনা দেয়া যাক।

প্লাস্টিক, কারণ প্লাস্টিক বিক্রি করে দ্রুত নগদ পয়সা পাওয়া যায়-কেজিদরে বিক্রি করি আমরা। সাদা প্লাস্টিক সবচেয়ে ভালো, সেগুলো রাখি একপাশে। আর অন্য পাশে রাখা হয় নীল প্লাস্টিকগুলো।

কাগজ-যদি সাদা, পরিষ্কার হয়, মানে আমরা পরিষ্কার করতে পারি তাহলে। সেই সাথে কার্ডবোর্ড।

টিনের ক্যান-ধাতব যে কোনো কিছু। কাঁচ, যদি কাঁচের বোতল হয় তাহলে সবচেয়ে ভালো। যে কোনো ধরনের কাপড়। মাঝে মাঝে টিশার্ট, প্যান্ট বা কোনো কিছুকে মুড়িয়ে রাখার জন্য ব্যবহৃত অন্য কোনো কাপড় পাওয়া যায়। আমরা যা কিছু পরি তার মধ্যে অর্ধেকই কুড়িয়ে পাওয়া। তবে বেশিরভাগ জিনিসই আমরা বস্তাবন্দি করি, ওজন করি, আর বিক্রি করে দেই। আমার কাপড়চোপড় দেখলে জীবনেও ভুলবেন না, আমি নিশ্চিত। আমার পরনে থাকে হাঁটু থেকে কেটে ফেলা একটা জিনিসের প্যান্ট, আর অনেক টোলা একটা টিশার্ট। রোদ চড়ে গেলে ওই টিশার্টটা তাই মাথার উপর টেনে দিতে পারি। জুতো পরি না-তার এক সম্ভাব্য কারণ হলো আমার কোনো জুতোই নেই, আর দুই নাম্বার কাপড়-পায়ের তলাটাকে আমরা ব্যবহার করি দরকারি কিছু খুঁজে পাওয়ার জন্য। মিশন স্কুল আমাদের সবাইকে জুতো পরতে বাধ্য করার অনেক চেষ্টা করলেও আমাদের বেশিরভাগই জুতোগুলো স্রেফ বিক্রি করে দিয়েছে। আবর্জনার পাহাড় বেশ নরম, আর আমাদের পায়ের তলা এখন খুরের মতো শক্ত হয়ে উঠেছে।

রাবার পেলে বেশ ভালো। গত সপ্তাহেই কোথা থেকে যেন একগাদা পুরনো টায়ার এসে হাজির হয়েছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অবশ্য সব

ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যায়। বড়রা আগেই চলে গিয়েছিল জায়গামতো, আমাদের ঘেষতে দেয়নি কাছে। মোটামুটি ভালো একটা টায়ার প্রায় আধ-ডলারে বিক্রি হয়, আর নষ্ট টায়ার ব্যবহার করা যায় ঘরের ছাদ জায়গামতো ধরে রাখার কাজে। ফাস্ট ফুডও পাওয়া যায় এখানে, সেটা সম্পূর্ণ আলাদা একটা ব্যবসা। আমার বা গার্দোর কাছে অবশ্য আসে না, চলে যায় একেবারে নিচে। প্রায় একশ’ ছেলেমেয়ে খাবারের উচ্ছিষ্টগুলো আলাদা করার কাজ করে। সব কিছু পরিষ্কার করার পর ব্যাগে ভরে পাঠিয়ে দেয়া হয় ওজন করতে, তারপর সেগুলো বিক্রি করা হয়। ট্রাকে ভর্তি হয়ে চলে যায় শহরে, যেখান থেকে এসেছিল। দিন ভালো হলে দুইশ’ পেসোর মতো ইনকাম করতে পারি। আর যে-দিন কপাল খারাপ থাকে, পঞ্চাশের বেশি কামানো যায় না। দিন আনি দিন খাই আমরা, আর মনে মনে আশা করি যেন অসুস্থ হয়ে না পড়ি। যে ছকটা দিয়ে ময়লা ঘাটি সেটাই আমাদের জীবন।

‘কী পেয়েছিস ওটা, গার্দো?’

‘ও। তুই?’

কাগজটা উলটে দেখালাম ওকে। ‘ও।’

তবে এটা না বলে পারছি না যে, টোকাই হলেও আমার একটা স্টাইল আছে। গার্দোর সাথেই বেশিরভাগ সময় কাজ করি আমি, আর আমাদের কাজ হয় অত্যন্ত দ্রুত। ছোট এবং বুড়োরা কেবল ময়লা খুঁচিয়েই চলে, যেন সব কিছু উল্টেপাল্টে না দেখলে চলবে না। কিন্তু গুয়ের ভেতর থেকেও আমি কাগজ এবং প্লাস্টিক খুব দ্রুত আলাদা করতে পারি, তাই আমাদের ইনকাম একেবারে খারাপ হয় না। গার্দো আমার পার্টনার, সব সময় একসাথে কাজ করি আমরা। ও আমার দিকে খেয়াল রাখে।

তাহলে কোথা থেকে শুরু করা যায়?

আমার সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্যের দিন, নাকি যেই দিনটা আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল সেই দিন? দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। আমি আর গার্দো ক্রেন-বেল্টগুলোর একটার উপর চড়ে বসেছিলাম। বিশাল সব চাকার সাথে লাগানো বেল্টগুলো, পাহাড়ের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত লম্বা। এর উপরে করে আবর্জনাগুলোকে অনেক উপরে পাঠিয়ে দেয়া হয়, যেখানে প্রায় দেখাই যায় না ওগুলোকে, তারপর আবার ঠেলে ফেলে দেয়া হয় নিচে। নতুন যে আবর্জনাগুলো আসে সেগুলো ওর উপরেই পাঠানো হয়। বেল্টের উপর চড়ে কাজ করার কথা নয় আমাদের, কারণ এটা বেশ বিপজ্জনক। বৃষ্টির মতো ঝরে পড়া ময়লার নিচে কাজ করতে হয়, আর গার্ডরা চেষ্টা করে আমাদের সরিয়ে রাখতে। কিন্তু যদি সবার আগে থাকতে হয়—যদি একেবারে ট্রাকে চড়ে বসতে না পারি, তাহলে বেল্টের উপর উঠে পড়াই ভাল। ট্রাকে চড়তে যাওয়া বেশ বিপজ্জনক—একটা ছেলেকে চিনি, যে তার হাত হারিয়েছিল এই কাজ করতে গিয়ে। ট্রাকগুলো ময়লা নামায়, বুলডোজারগুলো সেই ময়লা বেল্টে তোলে, তারপর সেটা চলে আসে পাহাড়ের উপর, আমাদের কাছে।

পাহাড়ের একদম উপরে রয়েছি আমরা, এখান থেকে সাগর দেখা যায়।

গার্দোর বয়স চোদ্দ, আমারও তাই। কাঠির মতো সরু শরীর ওর, হাত পাগুলো লম্বা লম্বা। আমার চাইতে সাত ঘণ্টা আগে জন্ম ওর। লোকে বলে একই চাদরের উপর জন্ম হয়েছিল আমাদের। আমার আপন ভাই না হলেও ভাইয়ের মতোই, কারণ আমার মাথায় কী চিন্তা চলছে, আমি কী অনুভব করছি—সব আগেই বুঝে ফেলে ও, কিছু বলার আগেই। আমার চাইতে বয়সে কিছুক্ষণের বড় হওয়ায় একটু খবরদারিও করে আমার উপর, কী করতে হবে না হবে বলার চেষ্টা করে। বেশিরভাগ সময় আমি আপত্তি করি না। লোকে বলে, ও নাকি খুব গম্ভীর, মুখে কখনও হাসি ফোটে না। গার্দো

জবাব দেয়, ‘হাসির মতো কিছু তো দেখতে পাই না আমি।’ একটু রুক্ষ স্বভাবের, ঠিক...কিন্তু তার কারণ হয়তো এটাই, অনেক বেশি মার খেতে হয়েছে ওকে। তবে একটা ব্যাপার আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি-ওকে সব সময় আমার পাশে দেখতে চাই।

একসাথে কাজ করছিলাম আমরা, আবর্জনার ব্যাগগুলো নেমে আসছিল নিচে। কোনোটা ছিঁড়ে গেছে ইতোমধ্যেই, আবার কোনোটা অক্ষত। এই সময় একটা ‘স্পেশাল’ ব্যাগ খুঁজে পেলাম আমি। ‘স্পেশাল’ হচ্ছে সেই ব্যাগগুলো, যেগুলো অক্ষত থাকে, আর আসে কোনো ধনী এলাকা থেকে। এমন ব্যাগের আশায় সব সময় চোখকান খোলা রাখি আমরা। ভেতরে কী পেয়েছিলাম এখনও মনে আছে আমার-একটা সিগারেট কার্টন, ভেতরে তখনও একটা সিগারেট ছিল। আমাদের জন্য বোনাস। একটা ধুন্দুলের মতো সজ্জি, তখনও বেশ তাজা, তার সাথে একগাদা টিনের ক্যান। একটা ফুরিয়ে যাওয়া কলম, কিছু শুকনো কাগজ-সরাসরি আমার বস্তায় ভরে ফেললাম সেগুলোকে। তারপর শুধু আবর্জনা আর আবর্জনা, যেমন পচা খাবার, ভাঙা আয়না, ইত্যাদি। আর তারপরই আমার হাতে এসে পড়ল...ভালো কিছু পাওয়া যায় না এখানেই, আগে বলেছিলাম বটে। কিন্তু, জীবনে একবারের জন্য হলেও...

আমার হাতে এসে পড়ল একটা ছোট্ট চামড়ার ব্যাগ, শক্ত করে চেইন আটকানো, কফির দাগ লাগা। খুলতেই ভেতরে পাওয়া গেল একটা ওয়ালেট, আর তার পাশে একটা ভাজ করা ম্যাপ। সেই ম্যাপের মধ্যে একটা চাবি। গার্দো চলে এল আমার পাশে। হাঁটু গেঁড়ে বসলাম আমরা। আমার আঙুলগুলো কাঁপছে, কারণ মানিব্যাগটা বেশ ভারি। ভেতরে রয়েছে এগারো শ’ পেসো! বলে রাখছি, এটা বেশ বড় অংকের টাকা। একটা মুরগি কিনতে লাগে এক শ’ আশি পেসো, একটা বিয়ারের দাম পনেরো। ভিডিও হলে এক ঘন্টা কাটাতে লাগে পঁচিশ পেসো।

পাগলের মতো হাসতে শুরু করলাম আমি, দিশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। খুশিতে আমার কাঁধে ঘুমি মারতে লাগল গার্দো। আনন্দের চোটে শুধু নাচানাচি করতে বাকি রাখলাম আমরা। পাঁচ শ’ দিলাম গার্দোকে, কারণ ব্যাগটা আমি খুঁজে পেয়েছি। আমার কাছে থাকল ছয় শ’। এবার আর কিছু আছে কিনা খুঁজে দেখলাম। কিন্তু কিছু পুরনো কাগজ, ছবি আর একটা...আইডি কার্ড ছাড়া কিছু পাওয়া গেল না। একটু পুরনো,

তোবড়ানো, কিন্তু কী লেখা আছে তা পড়া গেল বেশ ভালোভাবেই। আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা, মানে সরাসরি ক্যামেরার দিকে, চোখে হালকা ভয়-যেটা ক্যামেরার ফ্ল্যাশের দিকে তাকানোর সময় খুব স্বাভাবিক। নাম? হোসে অ্যাঞ্জেলিকো। বয়স? তেত্রিশ বছর, পেশায় হাউসবয়, অর্থাৎ গৃহপরিচারক। অবিবাহিত, বাস করে গ্রিন হিল্‌সের কোনো জায়গায়। ধনী লোক নয়, ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মন খারাপ লাগল। কিন্তু কী করার আছে আমাদের? শহরে গিয়ে খুঁজে বের করব লোকটাকে, বলবো, ‘মি. অ্যাঞ্জেলিকো...আপনার ওয়ালেটটা আমরা ফিরিয়ে দিতে এসেছি, স্যার?’

স্কুল ডেস পরা একটা বাচ্চা মেয়ের দুটো ছবি। বয়স কত হবে বলা মুশকিল, তবে আন্দাজ করলাম সাত কি আট। লম্বা কালো চুল, চোখগুলো সুন্দর। গম্ভীর মুখ, গার্ডের মতো-যেন কেউ তাকে হাসতে বলে দেয়নি।

এবার চাবিটার দিকে তাকলাম আমরা। হলুদ প্লাস্টিকের একটা ট্যাগ লাগানো আছে চাবির সাথে। তার দুই পিঠে একটা সংখ্যা লেখা : ১০১।

ম্যাপটা স্রেফ শহরের একটা মানচিত্র।

সব কিছু নিয়ে আমার প্যান্টের পকেটে ভরে ফেললাম, তারপর আবার লেগে পড়লাম ময়লা ঘাঁটতে। কারও মনোযোগ আকর্ষণ করা যাবে না, তাহলে যা পেয়েছি সব হারাতে হতে পারে। কিন্তু মনে মনে দারুণ উত্তেজিত বোধ করছি। আমরা দুজনেই উত্তেজিত, আর উত্তেজিত হওয়ার অধিকার আছে আমাদের, কারণ ওই মানিব্যাগটা সব কিছু বদলে দিয়েছে। অনেক অনেক দিন পর আমি চিন্তা করব : সবারই একটা চাবি দরকার।

সঠিক চাবিটা দিয়ে খুলে ফেলা যায় কাক্সিত দরজা, কারণ অন্য কেউ সেটা আপনার হয়ে খুলে দেবে না।

রাফায়েলই বলছি।

গাদৌ বলবে এর পর থেকে-মানে, আজ সন্ধ্যার পরের ঘটনাগুলো।

সন্ধ্যা নামার পরেই বুঝতে পারলাম আমার কাছে যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পুলিশ এসে হাজির হলো, ফেরত চাইল জিনিসগুলো।

বেহালায় পুলিশ খুব বেশি আসে না। নিজেদের সমস্যাগুলো আমরা নিজেরাই মিটিয়ে নেয়ার চেষ্টা করি। চুরি করার মতো বেশি কিছু নেই এখানে, আর নিজেদের জিনিস সাধারণত চুরি করি না আমরা-তবে ব্যাপারটা ঘটে মাঝে মাঝে। কয়েক মাস আগে একটা খুন হয়েছিল, তখন এসেছিল পুলিশ। এক বুড়ো তার বৌয়ের গলা কেটে ফেলে রেখেছিল তার কুঁড়েঘরের নিচে। পুলিশ যখন এলো ততক্ষণে বুড়ো পালিয়ে গেছে, পরে আর কখনও জানতে পারিনি সে ধরা পড়েছে কিনা। নির্বাচনের সময় মেয়র পদপ্রার্থী এক লোকের সাথে চার গাড়ি পুলিশ এসেছিল। উজ্জ্বল আলো আর রেডিওর কড়কড় শব্দ সঙ্গি করে এসেছিল তারা, কারণ পুলিশদের সবাই নিজেদের জাহির করতে খুব ভালোবাসে। এছাড়া কখনও আমাদের এখানে দেখা যায় না তাদের, আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে কিনা।

আজ এল পাঁচজন পুলিশ। একজনকে দেখেই মনে হলো কেউকেটা কেউ হবে, সম্ভবত সিনিয়র অফিসার-অপেক্ষাকৃত বয়স্ক, একটু মোটাসোটা। ভাঙা নাক দেখলে মনে হয় মুষ্টিযোদ্ধা ছিল এক কালে। মাথায় চুল নেই, বদরাগি চেহারা।

সূর্য ডুবে গেছে। রান্নার আগুন জ্বালানো হয়েছে, সেখানে ভাত রান্না করছে আমার আন্টি। আজ রাতে এক শ' আন্টি পেসো দিয়ে মুরগি কেনা হয়েছে একটা-আমি যে টাকাটা পেয়েছি তার সুবাদে। প্রায় ত্রিশজন জড়ো হয়েছে আগুনের চারপাশে, তাই বলে ভাববেন না, ওই একটা মুরগিই খাবে সবাই মিলে! ওটা শুধু আমাদের পরিবারের জন্য। তবে আজ রাতে বেশ গরম পড়েছে, তাই সবাই বাইরে এসে গল্পগুজন করছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে।

যদুর মনে পড়ে, গার্দোর কাছে একটা বল ছিল, সেটা নিয়ে কাছেই খেলে বেড়াচ্ছিলাম আমরা। কিন্তু এই মুহূর্তে সবাই দাঁড়িয়ে আছি কালো রঙের ফোর হুইল ড্রাইভ জিপটার হেডলাইটের আলোতে। গাড়ি থেকে নেমে এল লোকগুলো।

মুষ্টিযোদ্ধা পুলিশ টমাসের সাথে কয়েকটা কথা বলল। আমাদের ছোট্ট মহল্লার সর্দার বলা যায় টমাসকে। তারপর আমাদের সবাইকে উদ্দেশ্য করে কথা বলতে শুরু করল পুলিশের লোকটা।

‘আমাদের এক বন্ধু একটা সমস্যায় পড়ছে,’ জোরালো গলায় বলল সে। ‘বেশ বড় সমস্যা, তাই আশা করছি আপনারা আমাদের সাহায্য করবেন। সমস্যাটা হলো, একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হারিয়ে ফেলেছে সে। ওটা যে খুঁজে পাবে তাকে মোটা অংকের টাকা পুরস্কার দেয়া হবে। আরেকটা কথা বলে রাখি—যদি এখানকার কেউ জিনিসটা খুঁজে পায়, তাহলে প্রতিটি পরিবারকে এক হাজার পেসো পুরস্কার দেবো আমরা, বুঝতে পেরেছেন? আমাদের বন্ধুর কাছে জিনিসটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ। আর যে ওই জিনিসটা খুঁজে এনে আমাদের হাতে তুলে দেবে—তাকে দেয়া হবে দশ হাজার পেসো পুরস্কার।’

‘কি হারিয়েছেন আপনারা?’ জানতে চাইল একজন।

‘একটা...ব্যাগ,’ বলল পুলিশ। ঠাণ্ডা হয়ে এল আমার শরীর, কিন্তু প্রাণপণে ঢেকে রাখলাম সেটাকে। ঘুরে দাঁড়িয়ে পেছনের জনের কাছ থেকে একটা জিনিস নিল পুলিশ অফিসার, উঁচু করে দেখাল আমাদের। কালো প্লাস্টিকের তৈরি একটা ব্যাগ, আমার হাতের সমান বড় হবে। ‘দেখতে অনেকটা এরকম,’ বলল সে। ‘আরেকটু বড় বা ছোটও হতে পারে। একেবারেই এক রকম তা বলছি না, তবে মিল আছে এর সাথে। আমাদের ধারণা, ওই ব্যাগের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আছে, যেটা একটা অপরাধের কিনারা করতে আমাদের সাহায্য করবে।’

‘কখন হারিয়েছে ওটা?’ আরেকজন জিজ্ঞেস করল।

‘গত রাতে,’ বলল অফিসার। ‘ভুল করে আবর্জনার মধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছিল। ম্যাককিনলি হিলের কাছে কোনো একটা জায়গা থেকে হারিয়েছে। আজ সকালে ম্যাককিনলি হিলের সকল আবর্জনা তুলে এনেছে ট্রাকগুলো। যার অর্থ হলো, জিনিসটা এখানেই আছে, অথবা আগামিকাল চলে আসবে।’ আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল সে, আর আমরাও চেয়ে রইলাম তার দিকে।

‘কেউ কি এমন কোনো ব্যাগ পেয়েছে?’

অনুভব করলাম, গার্ডের চোখগুলো আঠার মতো সঁটে আছে আমার উপর।

প্রায় হাত উঁচু করে বসতে যাচ্ছিলাম আমি, ডাক দিতে যাচ্ছিলাম, কারণ দশ হাজার পেসো বেশ বড় একটা অংক। তাছাড়া, প্রতি পরিবারকে হাজার পেসো করে দেয়ার কথাও বলেছে ওরা। যদি তাই হয়, তাহলে মহান্নার সবচেয়ে জনপ্রিয় বালকে পরিণত হব আমি, নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু তেমন কিছু আমি করলাম না, কারণ ততক্ষণে অন্যান্য দিকগুলোও চিন্তা করতে শুরু করেছি। তাছাড়া, এখন না দিয়ে সকালেও তো ফেরত দেয়া যাবে ওটা। পরিস্কার করে বলে রাখি এখানে : পুলিশের সাথে আমার কোনো ঝামেলা হয়নি কখনও, তাই এমন না যে, ওদের আমি পছন্দ করি না, বা সাহায্য করতে চাই না। কিন্তু এখানে সবাই জানে, কাউকে বেশি বিশ্বাস করতে নেই। পুলিশগুলো যদি ব্যাগটা নিয়ে হাসতে হাসতে চলে যায়, তাহলে ওদের থামাবো কী করে? একটু চিন্তা করার সময় দরকার আমার, তাই ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম চুপচাপ। একটু হিসেব নিকেশও হয়তো করে দেখলাম মনে মনে। ওদের কাছে যদি দেয়ার মতো টাকা থাকেই, তাহলে দেশের বেশি আদায় করা যাবে না কেন? আমরা সবাই বড় অংকের টাকা পাবো তখন। জিনিসটা যদি এতই মূল্যবান হয়ে থাকে, যার জন্য ওরা এখানে চলে এসেছে, তাহলে দশ হাজারের বদলে বিশ দিতেও নিশ্চয়ই ওদের আপত্তি থাকবে না?

‘রাফায়েল কী যেন পেয়েছে, স্যার,’ হঠাৎ বলে উঠল আমার আন্টি।

মাথা ঝাঁকিয়ে আমার দিকে ইঙ্গিত করল সে। সাথে সাথে সব ক’টা পুলিশের চোখ ঘুরে গেল আমার দিকে।

‘কী পেয়েছো তুমি?’ প্রশ্ন করল ওদের নেতা।

‘কোনো ব্যাগ পাইনি, স্যার,’ জবাব দিলাম আমি।

‘কী পেয়েছো?’

‘একটা...জুতা পেয়েছি।’

কে যেন হেসে উঠল।

‘কী ধরনের জুতা? একটা, না এক জোড়া? কখন পেয়েছো?’

‘একটাই জুতা, স্যার-মেয়েদের জুতা। আপনি চাইলে নিয়ে আসতে পারি, আমার ঘরেই আছে।’

‘তোমার কেন মনে হলো, ওটা দেখতে আশ্চর্যী হবো আমরা? মজা করছো আমাদের সাথে?’

আন্টির দিকে তাকাল লোকটা। চোখ নামিয়ে ভাতের দিকে তাকাল আন্টি, তারপর আড়চোখে আমার দিকে, তারপর আবার ভাতের দিকে ফিরে গেল তার চোখ।

‘ও বলছিল কী যেন পেয়েছে,’ বলল আন্টি। ‘কিন্তু কী পেয়েছে তা বলেনি। আমি শুধু সাহায্য করতে চাইছিলাম, স্যার।’

জোরালো গলায় কথা বলে উঠল পুলিশদের নেতা। ‘শুনুন। কাল সকালে আবার আসব আমরা। কেউ যদি কাজ করতে চায় তাহলে তাকে বেতন দেয়া হবে। এক দিন লাগুক, এক সপ্তাহ লাগুক—কিছু আসে যায় না। ওই ব্যাগটা খুঁজে বের করতেই হবে, আর তার জন্য টাকা দেবো আমরা।’

অন্য পুলিশদের একজন আমার দিকে এগিয়ে এল। বয়স বেশ কম তার। আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল গার্দো। সামনে এসে আমার থুতনি ধরে মুখটা উঁচু করল তরুণ পুলিশ। তার চোখে চোখ রাখলাম আমি, চেষ্টা করছি ভয় না পেতে। হাসছে লোকটা, তবুও গার্দো আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে বুঝতে পেরে স্বস্তি পেলাম আমি। যতটা পারলাম পাল্টা হাসি ফোটানোর চেষ্টা করলাম মুখে।

‘কি নাম তোমার?’ প্রশ্ন করল লোকটা।

বললাম আমি।

‘ভাই-বোন আছে? এটা কি তোমার ভাই?’

‘আমার বন্ধু, স্যার। ওর নাম গার্দো।’

‘কোথায় থাকো তুমি?’

সব প্রশ্নের জবাব দিলাম আমি, হাসি মুখে—আর দেখলাম আমাদের বাড়ির অবস্থানটা মুখস্ত করে নিল ঐ পুলিশ। তারপর আবার আমার দিকে তাকাল। আলতো করে হাত বোলাল আমার মাথায়, যেন আমি একটা বাচ্চা। ‘কাল আমাদের সাহায্য করবে তো, রাফায়েল? বয়স কত তোমার?’

‘চোদ্দ, স্যার,’ জবাব দিলাম, যদিও জানি, এর চাইতে কমবয়স্ক লাগে আমাকে।

‘তোমার বাবা কোথায়?’

‘বাবা নেই, স্যার।’

‘ওই মহিলা কি তোমার মা?’

‘আন্টি।’

‘কাজ করতে চাও, রাফায়েল? সাহায্য করতে চাও আমাদের?’

‘অবশ্যই,’ বললাম আমি। ‘কত টাকা বেতন দেবেন আমাকে? সারা জীবন কাজ করব আমি!’ আরও চওড়া করলাম হাসিটা, বড় বড় করলাম চোখ। নিষ্পাপ, উচ্ছসিত এক ছোট্ট টোকাই হওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছি।

‘এক শ’,’ বলল সে, ‘প্রতি দিন এক শ’ করে পাবে, কিন্তু যদি তুমি ওই ব্যাগটা খুঁজে পাও...’

‘আমিও সাহায্য করতে চাই,’ বলল গার্দো, বয়সের চাইতেও ছোট দেখাতে চাইছে নিজেকে। দাঁত বের করে হেসে বলল, ‘ব্যাগে কী আছে, স্যার? আরও টাকা?’

‘আছে কিছু জিনিস। মূল্যবান কিছু নয়, কিন্তু—’

‘কি ধরনের অপরাধ?’ প্রশ্ন করলাম আমি। ‘বললেন যে একটা অপরাধের কূলকিনারা করতে সাহায্য করবে আপনাদের। খুন হয়েছে নাকি, স্যার?’

আমার দিকে তাকিয়ে আরও একটু হাসল পুলিশটা। তারপর গার্দোর দিকেও তাকাল। ‘খুব একটা সাহায্য হবে বলে মনে হয় না,’ বলল সে। ‘কিন্তু চেষ্টার ক্রটি রাখতে চাই না আমরা।’ আবারও তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকাল সে। বাহুতে গার্দোর বাহুর স্পর্শ পেলাম আমি। ‘কাল দেখা হবে,’ বলল পুলিশটা।

এরপর গাড়িতে উঠে বসল পুলিশদের সবাই, চলে গেল যেই পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথে। আমরা খুব কাছাকাছি চলে গেলাম তাদের, বোঝাতে চাইছি, মোটেও ভয় পাইনি, এমনকি গাড়ির সাথে দৌড়াতে দৌড়াতে হাত নেড়ে তাদের বিদায় জানালাম পর্যন্ত। বেহালায় অবশ্য আমাদের মতো আরও অনেক মহল্লা আছে। আমরা যে কুঁড়েগুলোতে বাস করি সেগুলো সব ময়লার পাহাড়ের উপর বানানো, দড়ি আর বাঁশ দিয়ে। একটার উপর আরেকটা...মনে হয় যেন পাহাড়ের গায়ে গড়ে ওঠা ছোট ছোট গ্রাম। পুলিশের গাড়িটা হেলে দুলে চলে গেল রাস্তা দিয়ে, ঝাঁকি খেতে লাগল হেডলাইটের আলোটা। যদি সব মহল্লায় যেতে হয়, তাহলে একই কথা কম করেও দশবার বলতে হবে ওদের।

পরে এক সময় আমার আন্টি কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, ‘মিথ্যে কথা বললি কেন, রাফায়েল ফার্নান্দেজ?’

‘একটা ওয়ালেট পেয়েছি আমি,’ বললাম তাকে। ‘ভেতরে যা ছিল দিয়ে দিয়েছি তোমাকে। তুমি ওদের ওই কথা বলতে গেলে কেন?’

আরও কাছে সরে এল আন্টি। নিচু গলায় বলল, ‘ব্যাগটা তাহলে তুই-ই পেয়েছিস, তাই না? বল আমাকে?’

‘না,’ বললাম আমি। ‘কিছু টাকা পেয়েছি শুধু।’

‘তাহলে জুতার কথা বললি কেন? সত্যি কথা বললি না কেন ওদের?’

কাঁধ বাঁকালাম আমি, একটু বুদ্ধি খাটানোর চেষ্টা করছি। ‘মা, আমার মনে হয়েছিল, ওরা ওয়ালেটটা ফেরত নিয়ে যাবে,’ বললাম আমি।

‘ওয়ালেটের মধ্যে টাকা ছিল? সেই ওয়ালেটটা কোথায়?’

‘আনছি! তখন সবার সামনে বলতে চাইনি কথাটা। সবাই আমার দিকে তাকিয়েছিল, আর-’

‘ওয়ালেটটা কি ব্যাগের মধ্যে পেয়েছিস তুই? মিথ্যা বলবি না আমার কাছে।’

‘না!’ বললাম আমি। ‘না।’

আবারও কড়া চোখে আমার দিকে তাকাল আন্টি, মাথা নাড়ছে। ‘অনেক বড় ঝামেলায় ফেলবি তুই আমাদের। কার ওয়ালেট ছিল ওটা? মানুষের তো নাম থাকে, তাই না? আর তুই যদি-’

‘আমি শুধু টাকাটা নিয়েছি,’ বললাম তাকে। ‘বাকি সব কিছু এখনই ফেলে দেবো।’

‘পুলিশকে দিয়ে দে ওগুলো।’

‘কেন? ওরা তো এগুলো খুঁজছে না, মা। আমি কোনো ব্যাগ পাইনি।’

‘ওহ, খোদা,’ বলে উঠল মা। ‘রাফায়েল, আমার কি মনে হচ্ছে জানিস? ওরা যেহেতু এভাবে টাকা ছিটানোর জন্য প্রস্তুত, ওদের সাথে কোনো গুপ্তগোলে যাওয়া উচিত হবে না। সত্যি কথা বলছি আমি, রাফায়েল। যদি এমন কিছু তুই খুঁজে পেয়ে থাকিস যেটা ওরাও খুঁজছে, তাহলে কাল সকালেই ওদের দিয়ে দিবি জিমিসটা।’

গার্দোও খাবার খেল আমাদের সাথে। প্রায়ই খায়, আর আমিও মাঝে মাঝেই ওর আংকেল আর ওর সাথে বেতে বাই। রাত্রে থাকলাম ওর ওখানেই, যেমন ও মাঝে মাঝে আমার বাসার থাকে। প্রায়ই ওর সঙ্গে ঘুম ভেঙে উঠে বসি, ঠিক আন্দাজ করতে পারি না মেথার আছি, ওর সঙ্গে পাশে কে ঘুমাচ্ছে। বাই হোক, খাওয়া শেষ হতেই দেখলাম আমার কিংবদন্তি আসছে পুলিশের গাড়িটা। আমাদের চোখের সামনেই মহান্নার ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেল ওটা।

আন্টি যে কথাটা বলেছে তা আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না।

আমি জানি, আমার বাবার কারণে পুলিশের সাথে আগেও ঝামেলা হয়েছে তার। আমার ধারণা, তখনই সে বুঝতে পেরেছিল, পরিস্থিতি আস্তে আস্তে জটিল হয়ে উঠবে। চেয়েছিল সব কিছু শুরুতেই থেমে যাক-কিন্তু তারপরেও বলবো, ভুল হয়েছিল তার। সে কারণেই পরে সব কিছু ছেড়ে চলে যাওয়াটা আমার জন্য সহজ হয়েছিল।

গার্দোকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে চলে এলাম আমি। অন্যদের তুলনায় আমাদের ঘরটা বেশ উঁচুতে। টাকের ভাঙাচোরা অংশ দিয়ে তৈরি করা দুটো ঘর, প্লাস্টিক আর ক্যানভাস দিয়ে বাঁধা। নিচে আরও তিনটে পরিবার থাকে। তিনধাপ মই টপকে তারপর আমাদের ঘরে উঠতে হয়। প্রথম অংশটায় থাকে আমার আন্টি আর তার মেয়ে, তার উপরে আরেকটা ছোট বাক্স, সেখানে ঘুমাই আমি আর আমার কাজিনরা। কখনও কখনও যখন গার্দো আসে তখন ও এখানেই ঘুমায়। আমার কাজিনরা এখন বাক্সের মধ্যে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। চারপাশ থেকে ভেসে আসছে প্রতিবেশীদের হাসি আর কথাবার্তার আওয়াজ, রেডিওর শব্দ। কে যেন চিৎকার করে ডাকছে কাউকে।

আমার ভাইদের একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে জায়গা করে নিলাম আমি, তারপর সরে এলাম একপাশে। আমার জিনিসগুলো সব এখানেই রাখা থাকে। বিয়ার রাখার একটা ক্রেটের মধ্যে রাখি সব কিছু। একজোড়া অতিরিক্ত হাফপ্যান্ট, দুটো টিশার্ট, আর একজোড়া স্যান্ডেল আছে ভেতরে। সেই সাথে আছে আমার সযত্নে জমানো কিছু গুপ্তধন, যেমনটা সব কিশোরের কাছেই থাকে। আমার সম্পদগুলোর মধ্যে আছে ফলা ভাঙা একটা পেননাইফ-যদিও এখনও বেশ কাজের, সেই সাথে আছে ভার্জিন মেরির ছবিসহ একটা কাপ, একটা নষ্ট ঘড়ি। একটা ছোট প্লাস্টিকের হাঁস, মাঝে মাঝে আমার কাজিনরা খেলে ওটা দিয়ে। আর আছে অতিরিক্ত একটা জিন্সের প্যান্ট। ওটা দিয়েই মুড়িয়ে রেখেছি মূল্যবান ব্যাগটাকে। এখন এমনকি খুলতেও ভয় লাগল মোড়কটা।

একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে আমার কাছাকাছি এসে বসল গার্দো। দুজনেই ঝুঁকে এলাম ব্যাগটার দিকে। ওর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। চোখের সাদা অংশগুলো ডিমের আকার ধারণ করেছে।

‘এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে,’ বলল গার্দো। ‘এখানে রাখলে বিপদ।’

‘ঠিক বলেছিস,’ বললাম আমি। ‘কিন্তু রাখব কোথায়?’

চুপ করে রইল গার্দো।

আইডি কার্ডটা বের করে লোকটার দিকে চেয়ে রইলাম আমি। হোসে অ্যাঞ্জেলিকো তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বিষন্ন চোখ, আর গম্ভীর চেহারার সেই বাচ্চা মেয়েটি।

‘লোকটা কি করেছে বলে তোর মনে হয়?’ প্রশ্ন করলাম আমি।

‘নিশ্চয়ই খারাপ কিছু,’ বলল গার্দো। ‘পুলিশগুলো আবার যখন আসবে, তোর সাথে কথা বলবে বলে মনে হচ্ছে...ওই লোকটা কিভাবে তাকাচ্ছিল তোর দিকে, দেখেছিস?’

মাথা ঝাঁকালাম আমি।

‘কিভাবে ধরেছিল তোকে, মনে আছে? তোর চেহারা মনে গেঁথে নিয়েছে ব্যাটা।’

‘আমি জানি,’ বললাম তাকে। ‘তোকেও চিনে নিয়েছে সম্ভবত,’ কথাটা বলেই হেসে ফেললাম। ‘আমাদের বন্ধু হতে চায় মনে হয়।’

‘এখন মজা করার সময় না,’ বলল গার্দো। ‘র‍্যাটকে দরকার আমাদের।’

‘র‍্যাটকে কেন?’

‘কারণ, আমার ধারণা একমাত্র ওর ওখানেই খুঁজতে যাবে না কেউ।’

‘কিন্তু ও কি রাজি হবে? র‍্যাট আর যাই হোক বোকা নয়।’

‘দশ পেসো দিলেই কাজ হয়ে যাবে। আর যদি রাজি না হয় তাহলে ওর হাত ভেঙে ফেলব।’ আইডি কার্ডটা নিয়ে সরিয়ে রাখল গার্দো। পুলিশ ওখানে নামবে বলে মনে হয় না—র‍্যাটকে দেখতেই পাবে না ওরা।

পরিকল্পনাটা ভালো, বুঝতে পারছি আমি। তাছাড়া, এটাই আমাদের একমাত্র পরিকল্পনা। ব্যাগটাকে আমাদের বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যেতে হবে।

‘এখনই যাবি?’ প্রশ্ন করলাম আমি।

মাথা ঝাঁকাল গার্দো।

‘ওকে ভয় দেখাস না তাই বলে,’ বললাম আমি। ‘আমাকে দেখলেই রাজি হবে ও।’

এখনও রাফায়েল বলছি।

অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু র্যাটের ব্যাপারে আমি নিজেই বলতে চাই, তারপর বলার ভার দিয়ে দেবো গার্দোকে।

র্যাট একটা ছেলে-আমাদের চাইতে তিন কি চার বছরের ছোট হবে বয়সে। আসল নাম জুন-জুন। কেউ অবশ্য ওকে এই নামে ডাকে না, কারণ ইঁদুরদের সাথে থাকে ও, আর দেখতেও ওই রকমই। আমার জানামতে ও হচ্ছে বেহালার একমাত্র ছেলে যার কোনো পরিবার নেই। যে সময়ের কথা বলছি, তখনও ওর অতীত সম্পর্কে বেশি কিছু জানা ছিল না আমার। এখানে অনেক ছেলেপুলেই আছে যাদের বাবা নেই, আরও অনেকে আছে যাদের বাবা-মা কোনোটাই নেই। কিন্তু যাদের বাপ-মা থাকে না তাদের চাচা বা চাচি থাকে, বড়ভাই থাকে, কাজিন থাকে-মোট কথা, যিদের সময় একটু খাবার, আর আশ্রয়ের দরকার হলে মাথার উপর একটু ছাদ জোগাড় করার জন্য কেউ না কেউ থাকেই। কিন্তু র্যাটের একেবারেই কেউ নেই, কারণ আমাদের শহরের কেউ নয়-ও এসেছে বাইরে থেকে। মিশন স্কুলটা না থাকলে অনেক আগেই পটল তুলতে হতো ওকে।

গার্দো আর আমি মোমবাতি হাতে নেমে এলাম মই দিয়ে। ব্যাগটা নিয়েছি আমার টিশার্টের নিচে, দু-হাত চেপে রাখার চেষ্টা করছি যেন বোঝা না যায়। কিন্তু সবাই যেন ইচ্ছে করেই আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে রেখেছে। বিশেষ করে আন্টি অন্য দিকে তাকিয়ে ছিল, আমাদের দেখেই উল্টো দিকে ঘুরে গুলো। রাস্তা পার হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই আবর্জনার পাহাড়গুলোর মধ্যে চলে এলাম আমরা।

এখানে বলে রাখা ভালো, আবর্জনাগুলো কিন্তু রাতের বেলা জীবন্ত হয়ে ওঠে; কারণ ওই সময়ই ইঁদুরগুলোর বের হওয়ার সময়। দিনের বেলায় সাধারণত দেখা যায় না ওদের, মানুষ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে ওরা। কখনও কখনও অবশ্য লুট করে দুই একটা সামনে পড়ে যায়, ঠিকমতো বাগে পেলে লাখি কষিয়ে পায়ের সুখও করে নেয়া যায়। তবে সেটা খুব

বেশি নয়। খুব চালাক ওরা, আর যে কোনো জায়গা থেকে গুড়ি মেরে, লাফ দিয়ে, বা উড়াল দিয়ে নিজেদের বাঁচানোর পথ করে নেয়ার বুদ্ধিও ঠিকই আছে।

গার্দোকে অনুসরণ করছি আমি, বুঝতে পারছি আমাদের দু-পাশেই নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে গাঢ় ধূসর রঙের প্রাণীগুলো। বেহালার আকাশ আলোকিত, কারণ কিছু কিছু ট্রাক রাতের বেলাতেও আসে-বড় বড় ফ্লাডলাইট জ্বালানো হয়েছে সেজন্যে। বামে, ডানে মোড় নিয়ে এগিয়ে চলেছি আমরা। একটা নালা পার হলাম, মরা জীবজন্তুর গন্ধ আসছে পানি থেকে। তারপর একটা সরু গলিতে ঢুকলাম, যেটার খোঁজ শুধু ময়লা কুড়ানো লোকজনই জানে। কোনো ট্রাক ঢোকে না এই রাস্তায়, মানুষও খুব বেশি আসে না। পায়ের নিচে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত প্যাচপ্যাচে ময়লা। একটু পরেই চলে এলাম পুরনো বেন্ট মেশিনগুলোর একটার কাছে। এটা এখন আর ব্যবহৃত হয় না, পচে নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করেছে। বেন্টটা খুলে ফেলা হয়েছে আগেই, কাঠের প্যানেলগুলোও সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এখন শুধু পড়ে আছে বিশাল ধাতব ফ্রেমটা, জং ধরে গেছে জায়গায় জায়গায়। বেন্টটা যেখানে আটকানো ছিল সেই জায়গাটা এখন দাঁড়িয়ে আছে বিশাল একটা আঙুলের মতো। কখনও কখনও আমরা ওটার উপর উঠে বসে বাতাস খাই। মাটিতে ডেবে আছে ওটার নিচের অংশ, আর তার নিচে আছে একটা গর্ত।

এক সময় নিশ্চয়ই ওখানে যন্ত্রপাতি ছিল, কারণ নিচে নামার জন্য সিঁড়ির ব্যবস্থা আছে। সিঁড়িগুলো খুব পিচ্ছিল। আবর্জনাগুলো প্রায়ই ভেজা থাকে, এটা সে কারণেই হয়েছে। এখানে হয়তো মাটি একটু নিচে, আমি জানি না—কিন্তু জায়গাটা সব সময় কর্দমাক্ত হয়ে থাকে।

সিঁড়ির মুখে থমকে দাঁড়ালাম আমরা। জোরে ডাক দিলাম, ‘র্যাট!’

বেশি জোরে অবশ্য বললাম না কথাটা, কারণ টাই না কেউ আমাদের দেখে ফেলুক এখানে। সমস্যাটা হলো, ছেলেরা যদি নিচে থাকে তাহলে আমার কথা শুনতে পাবে না। আর আমি মোটামুটি নিশ্চিত, ও ওখানেই আছে। আর কোথায় থাকবে?

‘র্যাট, আছিস?’ আবার ডাক দিলাম। সরু গলার কিচকিচ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। গার্দো এখন আমার পেছনে। আমার চাইতে গায়েগতরে বড় ও, শক্তিও বেশি। কিন্তু ও ইঁদুর ভয় পায়। ইঁদুর দেখলে পা দিয়ে মাড়িয়ে

মেয়ে ফেলি আমি। কিন্তু কিছু দিন আগে একবার ইঁদুরের কামড় খেয়ে পুরো হাত ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছিল গার্দোর। দরকার হলে যে ইঁদুর মারতে পারে না ও, তা নয়। কিন্তু ওদের এড়িয়ে চলতেই বেশি পছন্দ করে। সিঁড়ি বেয়ে কিছুটা নেমে এলাম। একটা ইঁদুর ডেকে উঠল আমার পেছনে, তারপর আরেকটা।

‘র‍্যাট!’ ডাক দিলাম আরেকবার। মেশিন রাখার গর্তের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হলো আমার কণ্ঠ। মোমবাতি ধরা হাতটা নিচু করে ডাক দিলাম, দম আটকে রাখছি কারণ খুব দুর্গন্ধ এখানে। শুনতে পেলাম, বিছানায় পাশ ফিরল র‍্যাট।

‘কী ব্যাপার?’ বলে উঠল ও। সরু, উঁচু লয়ের কণ্ঠস্বর র‍্যাটের। ‘কে?’

‘রাফায়েল আর গার্দো। একটা উপকার করতে হবে। ভেতরে আসব?’

‘আসো।’

গর্তে বাস করে এমন একটা ছেলের কাছে তার গর্তে ঢোকার জন্য অনুমতি চাওয়াটা একটু অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু র‍্যাটের সম্পদ বলতে ওর গায়ের জামাকাপড় বাদে শুধু এই গর্তটাই আছে। আমি হলে ওখানে কিছুতেই থাকতে চাইতাম না-অন্য যে কোনো জায়গাই এর তুলনায় ভালো। প্রথমেই বলতে হয় যে, জায়গাটা ভেজা ভেজা, অন্ধকার। আরেকটা ব্যাপার হলো, ওখানে থাকলে আমার ভয় হতো, উপরে স্থূপ করে রাখা ময়লাগুলো যে কোনো সময় ধসে পড়বে, বন্ধ করে দেবে সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার পথ। তাহলে ভেতরে বন্দি হয়ে পড়ব আমি, স্মোকি মাউন্টেনে যেমন হয়েছিল। আমরা আবর্জনার পাহাড়ের উপরে উঠি বলেই যে ওগুলো ধসে পড়ে তা নয়। মেশিনগুলো এত বেশি ময়লা ওগুলোর উপর স্থূপ করে যে, নিজেদের ওজনেই এক সময় ভেঙে পড়ে সব। পড়ে যাওয়ার সময় ওখানে আটকা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে, আর আবর্জনাগুলো বেশ ভারিও বটে। কেউ এতে মারা গেছে বলে শুনিনি কখনও, কিন্তু একবার একটা ছেলের বেশ কয়েকটা হাড় ভেঙে গিয়েছিল ওখান থেকে পড়ার ফলে। স্মোকি মাউন্টেন যখন ধসে পড়ে তখন প্রায় শ’খানেক মানুষ মারা গিয়েছিল। সবাই জানে, ওই লোকগুলোর মধ্যে কেউ কেউ এখনও আবর্জনার নিচেই আছে, নিজেরাও পরিণত হয়েছে আবর্জনায়!

যাই হোক, সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে এলাম আমি, মাথা থেকে জোর করে সরিয়ে রাখতে চাইছি চিন্তাগুলো। মোমবাতিটা নিচু করে রাখলাম।

কালো রঙের কী একটা যেন লাফিয়ে সরে গেল—আরেকটা ইঁদুর, ইয়া বড়—আমার কাঁধের উপর দিয়েই লাফ মারল ব্যাটা।

বিছানায় উঠে বসেছে র্যাট, পরনে শুধু হাফপ্যান্ট। ভয়ার্ত, বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ভাঙাচোরা, বাঁকা দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে ঠোঁটের উপর দিয়ে।

‘রাফায়েল?’ বলে উঠল ও। ‘কী চাও তুমি?’

আমার মনে হলো, কিছুটা খাবার আনা দরকার ছিল ওর জন্য। অনেকের চাইতে কম খাবার পায় ও, মুখটা শুকিয়ে থাকে সব সময়। র্যাট নাম হওয়ার আগে ওকে বান্দর বলে ডাকত সবাই, কারণ ওর চেহারাটা বাঁদরের মতোই—বড় বড় চোখ, হাঁ করে তাকিয়ে থাকে সব সময়। কয়েক পরত কার্ডবোর্ডের উপর বসে আছে ও, আর ওর চারপাশে ময়লার স্তুপ—নিশ্চয়ই ওগুলো ঘাঁটছিল। দেয়াল আর ছাদ তৈরি হয়েছে ভেজা ইট দিয়ে, সব জায়গায় অসংখ্য ফাটল। ওই ফাটলগুলো দিয়েই ইঁদুরের দল যাওয়া আসা করে। আন্দাজ করলাম, দেয়ালের ওপাশে ইঁদুরের বাসা আছে। র্যাটের হাতগুলো পেন্সিলের মতো সরু সরু, তাই গার্দো ওগুলো ভেঙে দেয়ার কথা বলেছিল ভাবতেই হাসি পেল আমার। জুনের হাতগুলো ভাঙতে তর্জনি আর বুড়ো আঙুলের বেশি কিছু দরকার হবে না। ও আসলে ইঁদুর নয়, মাকড়সা!

‘তোমার সাহায্য লাগবে আমাদের,’ বললাম আমি।

‘ঠিক আছে।’

‘কী সাহায্য লাগবে তাই তো বলিনি এখনও,’ বলল গার্দো। ‘তাহলে ঠিক আছে বললে কী করে?’

‘বললাম তো, ঠিক আছে,’ বলে হাসল ছেলেটা। আলো লেগে ঝিলিক দিল বাকাত্যাড়া দাঁতগুলো। চোখ পিটপিট করছে ওর। ভয় পেলে ওর মাথাটা থরথর করে কাঁপতে শুরু করে। এই মুহূর্তে অবশ্য ভয় পায়নি, বরং আগ্রহ ঝিলিক দিচ্ছে চোখে। তাছাড়া, আমি জানি আমাকে পছন্দ করে ও। আমি আর ও যে বন্ধু তা বলব না। কিন্তু ওর পাশে কাজ করতে খারাপ লাগে না আমার, মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে কথাও হয় কিছু কিছু। ওর কথা আর গান শুনতে পাই আমি। বেশিরভাগ ছেলেরা তো ওর দিকে ময়লার টুকরো ছুঁড়ে মারতে পারলেই সবচেয়ে খুশি হয়।

বসলাম আমি, তবে গার্দো সিঁড়িতেই কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

‘একটা জিনিস লুকিয়ে রাখতে হবে তোমাকে,’ তাকে বললাম। তারপর ব্যাগটা রাখলাম ওর কার্ডবোর্ডের বিছানার উপর, মোমবাতিটা রাখলাম পাশে। আরেকটা মোম খুঁজে বের করে জ্বালাল র্যাট। তিনজন চুপচাপ বসে রইলাম মোমগুলো ঘিরে।

‘আচ্ছা,’ বলল র্যাট। ‘জিনিসটা কি? কার জিনিস?’ ছয় বছরের বাচ্চার মতো চিকন শোনাল ওর কণ্ঠস্বর।

ব্যাগের মুখ খুললাম আমি। ভেতর থেকে জিনিসগুলো বের করে এনে সাজিয়ে রাখলাম বিছানার উপর—ওয়ালেট, চাবি, ম্যাপ।

‘লুকিয়ে রাখতে কোনো অসুবিধে নেই তো তোমার? পুলিশ এসেছিল, শুনেছ?’

‘আমি কোনো পুলিশ দেখিনি,’ বলল র্যাট। ‘তবে তোমরা চাইলে লুকিয়ে রাখতে পারি। ওই ইটটা দেখছ? টেনে খুলে আনা যায় ওটাকে, পাশেরটাকেও। বেশি দিন অবশ্য টিকবে না ওখানে রাখলে, ইঁদুরে খেয়ে ফেলবে। ঠিক আছে?’

‘দাঁড়াও,’ বলল গার্দো। ‘একটু ভেবে দেখি। ব্যাগটা তো আসলে পুলিশদের দরকার নেই, তাই না? ওরা আসলে ব্যাগের ভেতরের জিনিসগুলো চায়।’

‘তারপরেও এটা লুকিয়ে রাখতে হবে।’

‘তার চাইতে বেঁচে দিলেই তো হয়?’

‘যদি বেঁচে দিই,’ বললাম আমি, ‘আর যদি ওরা টের পেয়ে যায়, তাহলে বুঝে যাবে ভেতরে কী আছে তা ওরা ছাড়াও আরও কেউ জানে। অবশ্য, যদি ওদের জানা থাকে যে, ব্যাগের মধ্যে আসলে কী আছে।’

‘কে খুঁজছে জিনিসটা?’ বলল র্যাট। ‘পুলিশ কী চাইছিল?’

দ্রুত সব কথা খুলে বললাম ওকে। শুনতে শুনতে বড় বড় হয়ে উঠল র্যাটের চোখজোড়া। ‘দশ হাজার, রাফায়েল!’ বলে উঠল ও। ‘তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? ব্যাগটা ফেরত দিয়ে টাকাগুলো নিয়ে নাও।’

‘হ্যাঁ,’ বিদ্রূপের হাসি হাসল গার্দো। ‘বললেই হলো? এত সহজে দিয়ে দেবে ভেবেছ? ওদের কথা বিশ্বাস হলো তোমার? তাছাড়া, ওরা যদি দেয়ও, দশ হাজার পেসো সামলে রাখতে পারবে?’

আমার আর গার্দোর উপর ঘুরে বেড়াতে লাগল র্যাটের চোখজোড়া।

‘দেখো,’ বললাম আমি। ‘এটা আমাদের লুকিয়ে রাখতেই হবে। কাল

আবার পুলিশরা আসবে-বলেছে, জিনিসটা খুঁজে বের করতে যারা কাজ করবে তাদের সবাইকে বেতন দেয়া হবে। কয়েক দিনের কাজ জুটে গেছে আমাদের, হয়তো। আগামি সপ্তাহে ওদের ফেরত দিয়ে দেবো।’

‘তাহলে সবাই খুশি থাকবে,’ বলল র্যাট। ‘বুদ্ধিটা ভালো। কিন্তু একটা ব্যাপার কি তোমাদের জানতে ইচ্ছে করছে না, ওরা কেন এত হন্যে হয়ে উঠেছে ব্যাগটার জন্য? কত টাকা ছিল এর মধ্যে? সরু আঙুলগুলো দিয়ে ওয়ালেটটা খুলে আইডি কার্ডটা বের করে আনল ও।

‘এগারো শ,’ বললাম আমি।

দাঁত বের করে হাসল র্যাট। ‘আমার ঘরটা ব্যবহার করার জন্য ভাড়া হিসেবে কিছু দেবে না?’

‘পঞ্চাশ দিচ্ছি,’ বললাম ওকে। হাসিটা আরও চওড়া হলো ওর।

‘তুমি কিন্তু কথা দিচ্ছ, ঠিক আছে?’

‘হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি।’

ম্যাপটা তুলে নিল র্যাট। ‘পুলিশ কী চাইছে আমাদের খুঁজে বের করা উচিত,’ বলল ও। ‘কী আছে এখানে-মাটিতে পুতে রাখা গুপ্তধন?’

‘ওখানে কিছুই নেই,’ বললাম আমি। ‘ওটা স্রেফ এই শহরের একটা ম্যাপ।’

আইডি কার্ডের ছবিটা এবার ভালো করে দেখল র্যাট। ‘এই লোকটা কে?’

‘হোসে অ্যাঞ্জেলিকো,’ বললাম আমি।

র্যাট যে পড়তে পারে না এটা আমি জানি। কাগজটা উলটে পালটে দেখতে লাগল ও, মুখটা দেখছে ভালো করে।

‘হোসে অ্যাঞ্জেলিকো,’ ধীরে ধীরে বলল র্যাট। ‘পুলিশ কি তাহলে একেই খুঁজছে? তোমাদের কি মনে হয় লোকটা ফেরাসি আসামি? দেখে তো ভালো লোকই মনে হচ্ছে। এটা কি তার মেয়ের ছবি?’

বাচ্চা মেয়েটার ছবির দিকে তাকিয়ে আছে ও, দুটো ছবি পাশাপাশি ধরা।

‘হতে পারে,’ বললাম আমি। ‘জানা নেই আমার।’

‘মেয়েটাকে স্কুলে পাঠানোর মতো টাকা-পয়সা আছে লোকটার,’ বলল র্যাট। ‘এটা স্কুল ড্রেস।’

‘এমন কি হতে পারে না, লোকটাকে খুন করা হয়েছে?’ বলল গার্দো।

‘হয়তো মৃতদেহটা খুঁজছে ওরা, সেই সাথে খুনিদেরও। ঘটনা খারাপ দিকে মোড় নিলে অবাক হবো না।’

‘তাহলে ব্যাগটা হারাল কিভাবে?’ প্রশ্ন করলাম আমি। ‘একটা ব্যাগ আবর্জনার মধ্যে কিভাবে চলে আসে?’

‘দুর্ঘটনাবশত নয়, এটা নিশ্চিত,’ বলল র‍্যাট। আবার ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে ও। ‘লোকটার পরিচয় খুঁজে বের করতে হবে আমাদের, বুঝলে? কে জানে, হয়তো পুলিশের চাইতেও বেশি টাকা পাওয়া যাবে তার কাছ থেকে।’

‘আর এই চাবিটা?’ প্রশ্ন করল গার্দো। ‘নিশ্চয়ই তার বাড়ির চাবি। হয়তো চাবি হারিয়ে ফেলেছে লোকটা, বাড়িতে ঢুকতে পারছে না। কোথায় থাকে সেটা বের করতে হবে-’

‘না, না, ওটা মোটেই কোনো বাড়ির চাবি নয়,’ বড় বড় চোখ করে বলল র‍্যাট। অন্ধকারে এতক্ষণ চাবিটা খেয়াল করে দেখেনি ও। এবার সেটা তুলে নিয়ে মোমবাতির আলোতে ভালো করে দেখল। তারপর আবার তাকাল আমার দিকে। ‘তাহলে এই ব্যাপার! তোমরা নিশ্চয়ই জানো না এটা কিসের চাবি?’

‘সিন্দুকের চাবিও হতে পারে,’ বললাম আমি। ‘অথবা অন্য কোনো তালার। এই এক শূন্য এক কথাটার মানে কি?’

‘তার মানে তোমরা জানো না!’ ধীরে ধীরে বলল র‍্যাট। মজা করছে আমাদের সাথে। ‘আমি জানি। এক শ ছাড়ো, বলছি।’

‘কি?’

এর আগে কখনও এত চওড়া হাসি দেখিনি ওর মুখে। ঝাঁক দাঁতগুলো সব বেরিয়ে এসেছে মুখ থেকে। ‘এসব চাবি অনেক দেখেছি আমি, বুঝলে-এটা কিসের চাবি তা নিশ্চিত জানি আমি। পঞ্চাশ দেবে বললে না একটু আগে? ওটা এক শ করো, না-হলে এর বেশি আর এগোতে হচ্ছে না তোমাদের।’

‘তুমি সত্যিই জানো এটা কি?’

মাথা ঝাঁকাল র‍্যাট।

কিছু টাকা বের করে কার্ডবোর্ডের উপর রেখে গুনলাম আমি। দেয়ালের ওপাশ থেকে ছোট ছোট পায়ের হটোপুটির আওয়াজ আসছে। কিছু একটা আমাদের কেন্দ্র করে দৌড়াচ্ছে যেন। পুরো জায়গাটা জীবন্ত। গার্দো আর

আমি বসে রইলাম র্যাটের দিকে তাকিয়ে, অপেক্ষা করছি তার মহার্ঘ তথ্যটা শোনার জন্য।

‘সেন্ট্রাল স্টেশন,’ নিচু গলায় বলল র্যাট। ‘ওখানে প্রায় এক বছর ছিলাম আমি, যখন প্রথম এলাম এখানে। তাই নিশ্চিত করেই বলতে পারি, ওটা কোনো লকারের চাবি, কেউ লাগেজ রেখে গেছে স্টেশনে। প্ল্যাটফর্ম চারের ঠিক বাইরেই, ডান দিকের শেষ ব্লকে রয়েছে লকার রুমটা। এক শূন্য এক নাম্বারের লকারটা বেশ ছোটই হবে, উপরের দিকে—সবচেয়ে সস্তা লকার ওখানকার। এই লোকটা কিছু একটা রেখেছে ওখানে।’

আবার হাসল ও। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম আমরা। শিষ দিয়ে উঠল গার্দো। অনুভব করলাম, দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে আমার হৃৎপিণ্ডের গতি।

‘যেতে চাও ওখানে?’ প্রশ্ন করল র্যাট। ‘গেলে এখনই যেতে হবে।’

গার্দো বলছি। রাফায়েল যতটুকু বলেছে তার পর থেকে বলব আমি।

গল্পটা ভাগ ভাগ করে বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা, কারণ কিছু কিছু জিনিস রাফায়েল ভুলে যায়। এই যেমন, সেই দিন রাতেই স্টেশনে যেতে চেয়েছিল ও, তারপর পরের দিনও—ঠিক ছোট বাচ্চাদের মতো। ওখানে কি থাকতে পারে এই ভেবে এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে কম করে হলেও দশবার ওকে না বলতে হয়েছে আমার। কারণ, আমি ঠিকই বুঝতে পারছিলাম এই মুহূর্তে আমাদের বেহালায় থাকা সবচেয়ে জরুরি, কারণ কাল থেকেই শুরু হবে পুলিশদের তল্লাশী। সেই পুলিশটা আমাদের চিনে রেখেছে।

শেষ পর্যন্ত ওর চুলগুলো মুঠিতে চেপে ধরে বললাম, ‘সবাই যখন টাকা রোজগারের ধান্দায় ময়লা ঘাঁটিছে, তখন যদি গতকালের ‘কিছু একটা’ পেয়ে যাওয়া ছেলেটা উধাও হয়ে যায়, তাহলে কেমন দেখাবে?’

রাফায়েল আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু, ঠিক। কিন্তু একেবারেই বাচ্চাদের মতো ও—হাসছে, খেলছে, মনে করছে সব কিছুই একটা মজার অংশ। তাই ওকে বললাম, অন্য সবার মতো আমাদেরও কাজ করতে হবে আগামীকাল, জিনিসটা খোঁজার ভান করতে হবে। তাহলে হয়তো আমাদের উপর থেকে সন্দেহের চোখ সরে যাবে ওদের। তাই অপেক্ষা করলাম আমরা।

পরদিন সকালে পুরো বেহালা প্রস্তুত হয়ে গেল ভোর থাকতে থাকতেই, যেমনটা বলেছিলাম আমি। রাফায়েল বলল, আমরা যা কিছু পাই তা বিক্রি করেই পেট চালাতে হয়। তাই এক দিনের কাজের জন্য বেতন পাওয়াটা আমাদের জন্য স্বপ্নের মতো। খুব বেশি মানুষ কাজে যোগ দিতে এসেছে আজ—সম্ভবত মুখে মুখেই ছড়িয়ে গেছে খবরটা। সূর্য যখন উঠল, তখন প্রায় সবাই ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। পুলিশ, মহিলা, এমনকি পিচ্চি পিচ্চি বাচ্চাগুলোও—বাদ যায়নি কেউ। এক ণ পেছোয় কোভে কেউ বেরে এমনকি

হুক ছাড়াই খালি হাতে ময়লা ঘাঁটছে। সত্যি কথা বলতে, এত বেশি মানুষ জমা হয়েছে যে বিপদের আশঙ্কাও বেড়ে গেছে অনেকখানি। এমনকি পুরনো ময়লাগুলো সরিয়ে রাখার জায়গাও নেই।

হুকে বাঁধিয়ে ময়লা টেনে আনছিলাম আমি, আর তা করতে গিয়ে মাঝে মাঝে অন্যদের গায়ে হুকের আঁচড় লাগার অবস্থাও যে হচ্ছিল না তা নয়। তাই এক ঘন্টা পর ছোটদের সবাইকে সরে যেতে বলা হলো, রইল শুধু বড়রা। আবারও আবর্জনা এলোমেলো করতে লাগল তারা-ঠিক যেখানটায় আমরা গতকাল ছিলাম। ম্যানেজাররাও চলে এসেছে, কথা বলছে পুলিশের সাথে, আর চিৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছে কাজ করতে থাকা লোকগুলোকে। সব কিছু বারবার করে উল্টেপাল্টে দেখা হচ্ছে। কিন্তু কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না।

পুরো সময়টা জুড়ে আরও অনেক গাড়ি-পুলিশের গাড়ি, আরও একটা পুলিশের গাড়ি, তারপর একটা পুলিশ ট্রাক, মোটরবাইক, আর বড় বড় সরকারী চেহারার গাড়ি ঘোরাঘুরি করতে লাগল চারপাশে। সেই সাথে স্যুট পরা, আর পুলিশের পোশাক পরা অনেক লোককেও দেখা গেল, সুন্দর জুতোগুলো ভিজিয়ে ময়লা করছে তারা। এখনও সকাল সাতটাও বাজেনি, এরই মধ্যে গাড়ি আর মানুষের ভিড়ে হাঁটার উপায়ও নেই। মনে হচ্ছে যেন উৎসব চলছে।

বেল্টগুলো সব বন্ধ করে দিয়েছে ওরা।

পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে লাগল।

খুব তাড়াতাড়িই দেখা গেল যে ট্রাকগুলো ময়লার বোঝা নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে গেট দিয়ে, বাইরে ফেলে আসবে। মাত্র এক ঘন্টার মধ্যেই ছাব্বিশটা ট্রাক গুনলাম আমি। ড্রাইভারদের প্রথমে এসব দিকে কোনো আগ্রহ ছিল না। ছায়ায় বসে বসে সব দেখছিল তারা, আর ছোটদের মধ্যে কাউকে কাউকে পাঠাচ্ছিল চা আর সিগারেট আনতে। ছেলেদের কেউ কেউ ট্রাকগুলোর উপর উঠে ময়লা ঘাঁটতে শুরু করেছিল, কিন্তু আমি আর রাফায়েল নিচেই ছিলাম। কান খাড়া করে রেখেছিলাম আরও কিছু জানা যায় কিনা সেই আশায়। পুরো সময়টা জুড়ে আমি শুধু ভাবছিলাম যে শেষ পর্যন্ত কি হতে পারে। বুঝতে পারছিলাম, লোকজন খুব দ্রুতই ক্ষেপে উঠতে শুরু করবে, আর তাদের মধ্যে সবার প্রথমে থাকবে ওই পুলিশগুলো। আর পুলিশরা যখন রাগে, তখন তাদের আশেপাশে না থাকাই ভাল। অন্য দিকে,

রাফায়েল হঠাৎ করে লুকিয়ে পড়ে নিজের দিকে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করুক সেটাও চাইছিলাম না, তাই ওকে বাধ্য করছিলাম আমার কাছেই থাকতে।

এক লোকের হাতে একটা বাস্ক দেখা গেল, ভেতরে অনেকগুলো নোটের তাড়া। বাস্কটা আমাদের দেখাল সে, প্রতিশ্রুতি দিল যে সবাইকেই বেতন দেয়া হবে। আরেকজনের কথা শুনতে পেলাম আমি, আর আন্দাজ করতে পারলাম কি হচ্ছে এখানে—বুদ্ধি খাটাচ্ছে ওরা। ব্যাগটা যে ম্যাককিনলি নামক একটা এলাকা থেকে হারিয়েছে এটা ওরা জানে। জায়গাটা বেশ ধনী, তাই ওসব এলাকা থেকে যে সব ট্রাকে ময়লা আসে সেগুলোকে খুঁজে বের করা কঠিন নয়। গতকাল এখানে এসেছিল ম্যাককিনলির ট্রাকগুলো, সে কারণেই ব্যাগটা আমরা খুঁজে পেয়েছি। আজ আরও ট্রাক আসছে ওই একই এলাকা থেকে। আর তাই, পুলিশরা ঠিক করেছে যে নতুন ট্রাকগুলো তাদের ময়লা নামাবে একটু দূরে, ফাঁকা একটা জায়গায়। যেখান থেকে খুব সহজেই সব বেছে ফেলতে পারব আমরা।

সত্যিই তাই। দুপুর হওয়ার আগেই তিনটে ট্রাক এসে হাজির হলো ম্যাককিনলি থেকে, ময়লা নামিয়ে দিল নির্দিষ্ট জায়গায়। আমরা সবাই দূর থেকে তাকিয়ে দেখলাম, কারণ তখনও আমাদের কাছে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি। রাফায়েলের দিকে ঘুরে তাকিয়ে এবার নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলাম, ‘সত্যিই করতে চাস কাজটা?’

ভয়ের ছায়া ফুটেছে রাফায়েলের মুখে। সম্ভবত ওর মাথায় অবশেষে ঢুকতে শুরু করেছে যে কত বড় একটা ব্যাপারের সাথে জড়িয়ে পড়েছে ও।

ফিসফিস করে জবাব দিল রাফায়েল, ‘অবশ্যই। কোনো সন্দেহ নেই আমার মনে, গার্দো।’ তাই ওর কাছাকাছি রইলাম আমি।

নিজেদের চেহারায় খুশি খুশি, উত্তেজিত ভাব খোঁটানোর চেষ্টা করছি আমরা, কারণ কেউ আমাদের দেখে কিছু সন্দেহ করুক তা মোটেই আমাদের কাম্য নয়। কিন্তু ভয় আমারও লগছে, তাই রাফায়েলকে সাথে নিয়ে ঢুকে পড়লাম ভিড়ের মধ্যে, বাচ্চাদের মতোই এদিক ওদিক ছোট্টাছুটি করতে লাগলাম। র্যাটকে চোখে পড়তে হাত নাড়লাম দুজনেই। উবু হয়ে বসে আছে র্যাট, একটা সিগারেট টানছে। আমার দিকে তাকাচ্ছে মাঝেমাঝে, যদিও ওর দিকে কেউ কখনও তাকায় না। তার কারণটা হলো, র্যাটের গায়ের রঙ ওই ময়লার মতোই ধূসর, আর পরনে একমাত্র যে

কাপড়গুলো থাকে সেগুলোর রঙও এত ময়লা যে ওকে কেউ দেখেও দেখে না।

কিছুক্ষণ পর পুলিশ আমাদের ছোটদেরও একসাথে করে কাজে লাগিয়ে দিল-কোথা থেকে যেন অতিরিক্ত হুক নিয়ে এসেছে তারা। নিচের দিকে থাকায় কাজটা খুব একটা কঠিন হলো না আমাদের জন্য। হুকে বাঁধিয়ে ময়লা টান দিয়ে নিয়ে এসে এদিক ওদিক ছুঁড়ে ফেলা, ব্যাস।

প্রায় শ খানেক হবো আমরা সংখ্যায়।

ম্যাককিনলিতে সবার বাড়িতে টয়লেট আছে, তাই এখানে আর যাই হোক-স্টুপ নেই। ম্যাককিনলির আবর্জনা হচ্ছে ভালো মানের আবর্জনা-খাবার, খবরের কাগজ, প্রচুর পরিমাণে প্লাস্টিক এবং কাচ। কিন্তু পুলিশ আমাদের কিছু নিতে দিচ্ছে না, কারণ কেবল একটা জিনিস খোঁজার জন্যই কাজে লাগানো হয়েছে আমাদের।

কেউ একজন হঠাৎ একটা হ্যান্ডব্যাগ খুঁজে পেল, হইচই পড়ে গেল সবার মধ্যে। চিংকার চেষ্টামেচিতে কান পাতা দায় হয়ে উঠল। নীল রঙের পুরনো হ্যান্ডব্যাগ, একটা হাতল লাগানো এক পাশে। সেটা যখন ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হলো তখন সবাই খুব হতাশ হলো। নিম্পৃহ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে আমাদের কাজ দেখছে পুলিশরা, যদিও বোঝা যাচ্ছে গম্ভীর চেহারার আড়ালে ধীরে ধীরে কমে আসছে তাদের ধৈর্য।

বিকেলের কিছু পরে হয়তো কাজ শেষ হয়ে যাবে আমাদের, আন্দাজ করলাম আমি। এর আগে কখনও কোনো ময়লার স্তুপকে এত যত্নের সাথে বাছাই করা হয়েছে বলে মনে হয় না। আবর্জনার পাহাড়ের উপর যে ঝড়ো ছিল তাদের কাজও শেষ, তাই সবাইকে নিচে নেমে আসতে হুকুম দেয়া হলো। এরপরেও কাজ করে গেলাম আমরা, পুরো সন্ধ্যাই জুড়েই চলল আমাদের কাজ।

দেখতে পেলাম, গতকাল যে ভাষণ দিয়েছিল সেই মুষ্টিযোদ্ধা চেহারার পুলিশটা ফিরে এসেছে আবার। কালো, বড় পাড়িগুলোতে করে আসা স্যুট পরা দুই লোক এবং সাইট ম্যানেজারের সাথে কথা বলছে সে। বেশ তর্ক চলছে তাদের মধ্যে, প্রায়ই ফোন করছে কাদের যেন। ম্যানেজারদের চেহারা দেখেই বোঝা গেল তারা বিরক্ত-সম্ভবত ময়লাভর্তি ট্রাকগুলোর সংখ্যা কেবল বাড়ছেই বলে। তাছাড়া ড্রাইভাররাও বিরক্ত হয়ে উঠেছে, সারা দিন ধরে চা খেয়ে যাচ্ছে তারা, বাড়ি ফিরতে পারবে কখন জানে না।

সমস্যাটা কোথায় সেটা সহজেই বোঝা যাচ্ছে। এই নতুন ট্রাকগুলোর ময়লা যদি নামিয়ে দেয়া হয়, তাহলে সেই মহামূল্যবান ব্যাগটা আরও কয়েক পরত ময়লার স্তরের নিচে চাপা পড়ে যাবে। আর পুলিশ সেটা ঘটতে দিতে চায় না। কিন্তু শহরের সকল ময়লা তো এখানেই ফেলা হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষের আবর্জনা যখন এখানে এসে পৌঁছাচ্ছে, তখন কতক্ষণ সেগুলোকে আটকে রাখা যাবে? এক সময় কি পুরো শহর ঝামেলায় পড়ে যাবে না তাহলে?

তবে ওদের সম্ভবত যে ব্যাপারটা সবচেয়ে বেশি পীড়া দিচ্ছে তা হলো, কেউ নিশ্চিত নয়, ব্যাগটা ঠিক এখানেই এসে পড়েছে কিনা। হাজার হোক, অন্যান্য সব জায়গার মতো ম্যাককিনলিতেও টোকাইরা ডাস্টবিন থেকেই ময়লা ঘাঁটতে শুরু করে। কখনও কখনও রাস্তাতে দেখা যায় ওদের, ফুটপাথে বসে নিজেদের কুড়িয়ে পাওয়া মালগুলো গুছিয়ে রাখছে। তাছাড়া, আগেই বলেছি, ময়লাগুলো এখানে এনে ফেলার আগেই ওরা গাড়ির মধ্যেও উঠে বসে। তাই, ব্যাগটা যে এই ময়লার পাহাড়ে এসে পড়েছে তা নিশ্চিত হওয়ার কোনো উপায় নেই। ভাবতেই অদ্ভুত লাগল, পৃথিবীতে মাত্র তিনটে ছেলে জানে যে ওটা এই মুহূর্তে এখন কোথায় আছে।

সবাই বসে ছিলাম এদিক ওদিক।

শেষ পর্যন্ত বেতন দেয়া হলো। সবার পকেটে চলে এলো এক শ পেসোর নোট। অন্ধকার নেমে আসছে, আকাশটা লাল রঙ ধারণ করেছে। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিল পুলিশরা, চলে গেল। হাসি ফুটল আমার আর রাফায়েলের মুখে। এবার কান ফাটানো শব্দে চালু হলো স্ট্রিটগুলো, ট্রাকগুলো আবার চলতে শুরু করল। আরও লাইট জ্বালিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে লাগল তারা, সেই ভোরের আগে থামবে না।

আজ আমাদের মহল্লায় অন্যান্য দিনের তুলনায় একটু বেশিই রান্নার আগুন জ্বালানো হয়েছে। সেই সাথে কয়েক কেস বিয়ারও আছে। গানবাজনা চলছে, সবাই খুব আনন্দে আছে। তবে সবচেয়ে বেশি আনন্দ রাফায়েলের মনে। নিশ্চয়ই ভাবছে, সব ঝামেলা শেষ, আর ওর মাথার খুব বুদ্ধি।

কিন্তু রাফায়েলের বাড়ির ভেতরে, খাবার শেষ হওয়ার পর আমার পাশে বসে ওর আন্টি জিজ্ঞেস করল, ‘আমরা কি এখন নিরাপদ?’

আমি জানি, প্রশ্নটার উত্তর হচ্ছে না, আর এটাও জানি, এই অবস্থার

জন্য রাফায়েলের আন্টি নিজেই দায়ি। সেই সময় মুখ খুলে একেবারেই বোকার মতো একটা কাজ করে ফেলেছে সে। ব্যাপারটা বলতে খারাপ লাগছে আমার, কিন্তু এটা ঠিক, সে মুখ না খুললে সব কিছু অনেক বেশি সহজ হতো। ‘আমরা কি এখন নিরাপদ?’ আবার প্রশ্ন করল আন্টি।

‘সম্পূর্ণ নিরাপদ, ভয় পেও না,’ বললাম আমি। কথাটা মিথ্যা।

‘আমার সাথে কথা বলেছে ওরা,’ আমাকে বলল আন্টি, জানতে চাইছে আমি কেন ওই কথাটা বললাম। এক পুলিশ আমার কাছে আবার জানতে চাইছিল। জানি যে আমার মুখ খোলা উচিত হয়নি, কিন্তু বলে ফেলেছি। এখন তাদের দুজনের ব্যাপারেই চিন্তা করছে ওরা। তাদের নাম লিখে নিয়ে গেছে।’

‘হ্যাঁ, কিন্তু আমরা তো ওদের বলেছিই,’ নিজের বিখ্যাত হাসিটা দিয়ে চুলগুলো কপাল থেকে সরাল রাফায়েল। ‘একটা জুতো পেয়েছি আমরা, আর কিছু নয়। ওরা কিছু জানে না।’

চুপ করে রইল আন্টি, কিন্তু শুধু এক মুহূর্তের জন্য।

‘গত রাতে তাদের বাইরে যেতে দেখেছি আমি,’ খুব নিচু গলায় বলল সে তারপর। এত নিচু যে কাছাকাছি সরে আসতে বাধ্য হলাম আমরা। ‘কোথায় গিয়েছিলি জানতে চাই না, কেন গিয়েছিলি তাও জানতে চাই না। আমি শুধু জানতে চাই, আমরা নিরাপদ কিনা। বাড়িতে কিছু রাখিসনি তো, রেখেছিস?’

‘না,’ একসাথে বললাম দুজন।

‘ঠিক তো? ওরা কিন্তু বাড়ির সব কিছু এলোমেলো করে ফেলবে—’

‘কথা দিচ্ছি তোমাকে,’ হালকা, খুশি খুশি গলায় বলল রাফায়েল। কিন্তু আমি শুধু ভাবছিলাম, মিথ্যা কথাগুলোর পরিমাণ শুধু বাড়ছেই। কপালে কি আছে কে জানে। ব্যাগটা অবশ্য নিরাপদ আছে, ব্যাগের কাছে—ইচ্ছে করছে ওটার কি অবস্থা গিয়ে দেখে আসতে।

তবে রাফায়েলের আন্টি ওকে ছাড়ছে না। ‘এখানে তল্লাশী করার কথা বলেছে ওরা,’ বলল সে। ‘অন্তত লোকজন তাই বলাবলি করছে। আমাদের বাড়িতেই আসবে প্রথমে, নিশ্চিত করে বলতে পারি। বাড়িটা যদি আবার ভেঙে ফেলে ওরা—’

তার হাত ধরল রাফায়েল। ‘এখানে কিছুই নেই,’ বলল ও।

‘দশ হাজার কিন্তু অনেক টাকা!’ আগের চাইতে উঁচু গলাতে বলল

আন্টি। ‘একবার ভেবে দেখেছিস, ওই টাকা পেলে কত কিছু করতে পারবি?’

বাঁধা দিলাম আমি। ‘তোমার কি ধারণা, ওরা তোমাকে দেবে টাকাটা? সত্যিই তাই মনে হয় তোমার?’

‘কেন দেবে না!’ প্রতিবাদ করল আন্টি।

আন্তে করে তার হাতটা নাড়ল রাফায়েল। ‘মা,’ বলল ও। ‘মা, আমাদের কেউ যদি টাকাটা পায়ও, তবুও কি খুব বেশিক্ষণ ওটা রাখতে পারব আমরা?’

হাত বাড়িয়ে আমার বাহু ধরল আন্টি। বলল, ‘তোমার মাথায় তো বুদ্ধি আছে, গার্দো। এই ছেলেটার তুলনায় তুই অনেক বুদ্ধিমান, গায়ে জোরও আছে, দৌড়ে পালিয়ে যেতে পারিস যে কোনো জায়গায়। মুখ খোলা উচিত হয়নি আমার, সে জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আমার তো বয়স হয়েছে, এই বয়সে আর অন্য কোথাও যাওয়ার ক্ষমতা নেই। তাছাড়া ছোট ছেলেমেয়ে দুটোকে...’

বড় বড় ফোটায় অশ্রু গড়াতে শুরু করল তার চোখ থেকে। ভয় পেয়েছে মহিলা, আমিও ভয় পেলাম তাই। রাফায়েল অবশ্য সবচেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছে, বুঝতে পারলাম আমি, যদিও কখনই সেটা নিজের মুখে স্বীকার করবে না। ‘পুলিশের ঝামেলায় পড়তে চাই না আমি,’ বলল আন্টি। ‘সবাই জানে ওরা কি করে।’

তার চোখে চোখ রাখতে পারলাম না আমি।

মহিলা যে তখন মুখ খুলে বসেছে এ জন্য তার উপর দারুণ রাগ হচ্ছে আমার—এর চাইতে বড় বোকামি আর কিছুই হতে পারে না। সেই সাথে কেন যেন মনে হচ্ছে, ঘটনা খারাপ দিকে মোড় নেবে। আন্টি যেমন বলেছে, তেমন বুদ্ধিমান হতে চাই আমি, আর এ-ও জানি, এখন আমাকেই নেতৃত্ব দিতে হবে। রাফায়েলের সামনে কারও থাকা দরকার। ওকে সামলে রাখতে হবে আমাকে।

দ্রুত পরিকল্পনা আটছিলাম আমি, তাই মুখে কিছু বললাম না।

রেলওয়ে স্টেশনে যেতে হবে আমাদের—অন্তত এটাই ভাবলাম তখন। লকারটায় কি আছে দেখতে হবে, আর কাজটা করতে হবে দ্রুত। তারপর, হয়তো কয়েক দিনের মধ্যেই ফিরিয়ে দিতে পারব চাবিসহ ওয়ালেটটা, তখন মিটে যাবে সব ঝামেলা।

আর কাজটা যদি খুব বেশি সন্দেহজনক হয়-তাহলে র্যাটকে বলব ব্যাগটা ফেরত দিয়ে আসতে। কেউ ওকে সন্দেহ করবে না, কারণ ও একা একা কাজ করে, কারও সাথে কথা বলে না। তাই মনে হলো, র্যাটকেই তাহলে নায়ক বানানো যাক। কয়েক দিন পর পুলিশদের কান্ডিত জিনিসটা ফেরত দিয়ে আসবে ও।

কিন্তু সেটাও যদি খুব বেশি বিপজ্জনক হয়ে যায়-তাহলে তো ব্যাগ আর চাবিটা ময়লার মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিলেই পারি। কেউ না কেউ পেয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তারপর, অবশ্য যদি কোনো দিন খুঁজে পায় তাহলেই।

বাড়িতে কিছুই নেই, কথাটা ঠিক। কেউ কিছু প্রমাণ করতে পারবে না, কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই আমাদের। আর এখনও চাইলে টাকা আদায় করতে পারব আমরা-নিজেকে এই কথাগুলোই বলছিলাম। রাফায়েলও একই কথা ভাবছিল। সারা রাত ব্যাপারগুলো নিয়ে আলাপ করলাম আমরা। নিজেদের খুব বেশি বুদ্ধিমান মনে হচ্ছিল, ঘুণাঙ্করেও আন্দাজ করতে পারিনি কিসের মধ্যে পড়তে যাচ্ছি। পুলিশ যদি একবার জানতে পারে যে তাদের প্রয়োজনীয় বস্তুটা অন্য কারও কাছে রয়েছে, তাহলে সেটা আদায় না করা পর্যন্ত তারা হাল ছাড়ে না-এই ব্যাপারটা মোটেই আসেনি আমাদের মাথায়।

আবারও রাফায়েল বলছি।

পরদিন গার্দো আমাদের স্টেশনে যেতে দিল। আমি ওকে বলেছিলাম, যেতে না দিলে আমি আর র্যাটই যাব ওকে রেখে।

তখন ও বলল, আমাদের উপর যদি নজর রাখা হয়? কিন্তু আমাদের উপর কেউ নজর রাখবে, আর আমরা সেটা বুঝতে পারব না-এমনটা হতে পারে বলে আমার মনে হলো না। তার উপর বললাম, আমরা এত দ্রুত চলব যে ওরা বুঝতেই পারবে না।

গার্দো তখন বলল, ওরা যদি আমাদের খোঁজে এখানে আসে আবার? আমি জবাব দিলাম, যদি না আসে? বললাম, তাহলে বরং আর কিছুই না করে পুরো ব্যাপারটা ভুলে গেলেই ভাল। এটাই কি চায় গার্দো? তখন বেশ ক্ষেপে উঠল ও, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার মেনে নিল আমার কাছে।

তাই, পর দিন ভোরেই আমরা চলে গেলাম রেললাইনের দিকে। ট্রেনগুলো বেহালার দক্ষিণ দিক দিয়ে চলাচল করে। সেন্ট্রাল স্টেশনে যেতে হলে আমার বাড়ি থেকে দশ মিনিটের দূরত্বেই ট্রেন পাওয়া যায়।

রেললাইনের গায়ে গায়ে ঘেষে বাড়ি বানিয়েছে লোকজন, কারণ মাটি এখানটায় সমান আর পরিষ্কার। প্রায়ই বাড়িগুলো ভেঙে ফেলা হয়, লোকজন তাড়িয়ে দেয়া হয়। কিন্তু কিছু দিন পর তারা আবার ফিরে আসে, আবার শুরু হয় একই খেলা। ব্যাপারটা যতটা মনে হয় অত বিপজ্জনক নয়, কারণ ট্রেনগুলো আসে দিনে স্রেফ চারবার, আর চলে খুব আস্তে আস্তে। লম্বা, ভারি ট্রেন এক একটা, এক মাইল দূর থেকেই শোনা যায় তাদের আসার শব্দ। এখন পর্যন্ত শুধু একজনের ট্রেনে কাটা পড়ার খবর শুনেছি আমি, এক মহিলা। আর সে কাজটা করেছিল ইচ্ছে করে ট্রেন আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল, তারপর মাথা পেতে দিয়েছিল লাইনের উপর।

গার্দো, আমি আর র্যাট অপেক্ষা করছিলাম ছয়টার ট্রেনের জন্য। প্রায় সঠিক সময়েই আসল ট্রেনটা। সর্বশেষ বগিটিকে লক্ষ্য করে দৌড়াতে লাগলাম আমরা। যাত্রীবাহী ট্রেন, নয় ঘন্টার দূরত্বে ডায়মন্ড হারবার নামে একটা

শহর হলো এর শেষ গন্তব্য। ডক থেকে যাত্রা শুরু করলেও খুব বেশি মানুষ ওখান থেকে ওঠে না। তারপর যায় সেন্ট্রাল স্টেশনে, সেখানে গাদাগাদি করে যাত্রি বোঝাই হয়ে যায়। ট্রেনের জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম আমরা। ভেতরে এক বৃদ্ধ দম্পতি ছাড়া আর কেউ নেই, তাই বেঞ্চের উপর হাত পা ছড়িয়ে বসলাম আরাম করে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে হাত নাড়তে লাগলাম, যেন ছুটি কাটাতে যাচ্ছি।

‘ওরা যদি আমাদের উপর নজর রেখে থাকে?’ আবার বলে উঠল গার্দো। ওর মাথায় একবার কিছু একটা ঢুকে গেলে বের করা মুশকিল।

‘কিভাবে নজর রাখবে?’ প্রশ্ন করল র‍্যাট।

‘সন্দেহজনক কাজ করতে পারে এমন কাউকেই খুঁজছে ওরা। আমরা জীবনে ট্রেনে উঠেছি কয়বার, রাফায়েল?’

‘তা জানি না, তবে খুব বেশি নয়—’

‘ওরা তো পুলিশ, তাই না? আমরা কি করছি দেখার জন্য চোখ রাখবে ওরা। যদি কোনোভাবে জেনে যায় যে একটা লকারের চাবি ছিল ওই ব্যাগের মধ্যে—কিন্তু নাম্বারটা তারা জানে না, তখন?’

‘শোন,’ বললাম ওকে। ‘পাগলের মতো কথা বলছিস তুই। ওরা যদি জানতই যে ব্যাগের মধ্যে একটা লকারের চাবি আছে, তাহলে স্টেশনের সবগুলো লকার খুলে দেখত ওরা। ব্যাগে কি আছে তা ওদের জানার কোনো প্রশ্নই আসে না।’

‘হয়তো এখন ওরা স্টেশনেই আছে, সবগুলো লকার খুলে দেখছে আর আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।’

‘তাই যদি হয় তাহলে আমরা স্রেফ কেটে পড়ব। তিনটে ছেলে আমরা, ঘুরতে বেরিয়েছি—আর কিছুই নয়।’

র‍্যাট কিছুই বলল না, শুধু আমার আর গার্দোর দিকে তাকাতে লাগল। তারপর আমার সাথে চোখাচোখি হতেই হেসে ফেলল। আমরাও যোগ দিলাম সেই হাসিতে।

আমাদের চুপ থাকতে বলল গার্দো। ‘এখন পুরস্কার বিশ হাজার,’ বলল ও। ‘এই টাকাই দিতে চেয়েছে ওরা—দ্বিগুণ করে দিয়েছে, নিজের কানে শুনেছি আমি।’

‘এত টাকা ওরা কখনই দেবে না।’

‘আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হলো, ওরা যাই খুঁজুক না কেন, সেটার

গুরুত্ব ধীরে ধীরে বাড়ছে। এই হোসে অ্যাঞ্জেলিকো যদি কাউকে খুন করে থাকে-ধর কোনো গুরুত্বপূর্ণ লোককে খুন করেছে সে, হয়তো কোনো রাজনীতিবিদ, অথবা ধনী কেউ-আর সেই খুনের কিনারা করার সূত্রটাই যদি আমাদের কাছে থেকে থাকে এখন? তাহলে কি করব আমরা? শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে খুনিকে ধরার পথে পুলিশকে বাধা দিয়েছি-’

আমি বললাম, ‘গার্দো, লকারে কি আছে সেটা দেখতে অসুবিধে কিসের?’ তারপর ওর মুখের উপর একটা হাসি ছুঁড়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম বেঞ্চের উপর। ‘তারপর দেখা যাবে কি করা যায়, ঠিক আছে?’ এত চিন্তা বাদ দিয়ে একটু বিশ্রাম নিতে বললাম ওকে।

‘লকারটা আমি খুলব,’ বলে উঠল র্যাট।

দুজনেই তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। গার্দো জানতে চাইল আসলে কি বলতে চাইছে র্যাট।

‘সেটাই সবচেয়ে ভালো হবে,’ বলল ও। ‘ঠিক আছে? স্টেশনে যে ছোকরাগুলো থাকে ওদের সাথে আমার পরিচয় আছে। বলব, একজনের হয়ে একটা কাজ করে দিচ্ছি। ওদের কিছু পয়সা দিতে হবে অবশ্য। আর তাছাড়া, কেউ যদি নজর রেখেই থাকে...আমি জানি যে লকার রুমটা কোথায়, ওই লকারটা কোথায়। দ্রুত গিয়ে ভেতরে যাই থাকুক না কেন নিয়ে চলে আসব, তারপর তোমাদের সাথে দেখা করব রেললাইনের ধারে। কেউ আমাকে দেখে ফেললে দৌড় দেবো। আমরা তিনজন একসাথে দৌড়ালে কাউকে না কাউকে ওরা ধরে ফেলবেই। কিন্তু আমি একা থাকলে খুব সহজেই ওদের কাটিয়ে দিতে পারব। ঠিক আছে?’

‘স্টেশনের ছোকরাগুলোকে কত দিতে হবে?’ জানতে চাইলাম আমি। ‘কত চাইতে পারে ওরা?’

‘তা জানি না। তবে বিশ পেসোতে কাজ সারার চেষ্টা করব। কিন্তু বলা যায় না, এক শ পেসোর মতো দিয়ে রাখো আমাকে।’

টাকাটা ওকে দিলাম আমি। ভয় পেয়েছে ও, কাঁপছে একটু একটু। গার্দো মাথা নাড়ছে, গভীর চিন্তায় মগ্ন। বলল, ‘দারুণ বুদ্ধি খাটিয়েছ, র্যাট। কি বোঝাতে চেয়েছিলে, এখন বুঝতে পারছি আমি। কিন্তু একসাথে থাকাই মনে হয় ভালো হবে আমাদের। সব কাজ ভাগ করে নেব আমরা।’ তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আমার কাছ থেকে দূরে যাবি না কখনও!’

কয়েক মিনিট পর স্টেশনে ঢোকার জন্য ধীর হয়ে এল ট্রেনের গতি। দরজার পাশে এসে দাঁড়িলাম আমরা। প্ল্যাটফর্ম কাছে চলে আসছে, তাই তার আগেই লাফ দিয়ে পড়লাম লাইনের পাশে ঘাসের উপর, গড়াতে শুরু করলাম। গার্দো প্রায় আমার উপরে এসে পড়ল, কিন্তু র‍্যাট খাড়া রইল দুই পায়ের উপর। এর আগে কখনও দেখিনি, ও কতটা ক্ষিপ্ত হতে পারে। এত চিকন যে মনে হয় কেবল কাগজ আর কাঠি দিয়ে তৈরি ওর শরীরটা, যেন এখনই ঘুড়ি হয়ে উড়ে যাবে বাতাসে। এদিক ওদিক না তাকিয়েই ছুটেতে শুরু করল র‍্যাট, আমরাও পিছু নিলাম ওর। প্ল্যাটফর্মে উঠে আসতেই কয়েকটা ছোকরা সরু চোখে চাইল আমাদের দিকে—যেন বলতে চাইছে এটা ওদের এলাকা। আসলেই তাই।

একটু দূর থেকে আমাদের অনুসরণ করতে লাগল ওরা।

আগে আগেই লাফ দিয়েছিলাম কারণ আমরা চাই না যে ট্রেন থেকে নামার সময় আমাদের দেখে ফেলুক কেউ। গার্ড, এমনকি কুলিরাও যদি দেখে ফেলে, তাহলে মার খাওয়া থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। স্টেশনে যে ছোকরারা থাকে ওদের হিসেব আলাদা। যতক্ষণ না ওরা কেউ চুরি করছে বা কাউকে বিরক্ত করছে, ততক্ষণ ওদের নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। স্টেশন পরিষ্কার রাখে ওরা, ট্রেনের এ মাথা থেকে ও মাথা চলে যায় দুই মিনিটের মধ্যেই। যদি কেউ ভিক্ষে করে বা টুকিটাকি বিক্রি করে, তাহলে সেগুলো আড়ালে করার মতো বুদ্ধি আছে ওদের মাথায়। সে জন্যই কেউ কিছু বলে না ওদের।

এখন স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ধরে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা, তিনটে খালি পায়ের নোংরা ছেলে। কেউ যেন দেখেও দেখছে না আমাদের। আমি জানি, সবচেয়ে বিপজ্জনক কাজটা হচ্ছে লকারের কাছে যাওয়া, কারণ ওখানে আমাদের মতো ছেলেদের কেউ আশা করে না। তিনটে টোকাই একটা লকারের ডালা খুলছে? পুলিশ লাগবে না, যে কেউই খেয়াল করবে ব্যাপারটা। সঙ্গে সঙ্গে ধরে নেবে যে চুরি করছে আমরা, আর চুরি করে ধরা পড়লে কেউ দয়ামায়া দেখায় না।

প্ল্যাটফর্ম থেকে নামতেই আরও কিছু স্টেশনের ছোকরার সাথে দেখা হয়ে গেল। এরা গায়ে গতরে আরও বড়সড়। আমাদের প্রায় খেদিয়ে একপাশে নিয়ে গেল তারা। গার্দো শক্ত হয়ে উঠেছে, টের পাচ্ছি আমি, নিজের হুকটা ধরে রেখেছে কাপড়ের উপর দিয়ে। ওটা সব সময় নিজের

সঙ্গে রাখে ও। র্যাট এগিয়ে গিয়ে কথা বলল ওদের সাথে, কারণ এক সময় এখানে থাকত ও, কয়েকজনকে চেনে। দেখলাম, বিশ পেসোর একটা নোট এগিয়ে দিল, তারপর পঞ্চাশ পেসো, তারপর আরও একটা বিশ পেসো। হাত মেলাল সবাই, তারপর ছেড়ে দিল আমাদের। র্যাট সম্ভবত ওদের বলেছে আমাদের পিছু না নিতে, কারণ প্রধান স্টেশন স্কয়ারে যাওয়ার সময় আমাদের পেছনে দেখা গেল না কাউকে।

‘পাঁচ মিনিট সময় দিয়েছে আমাদের,’ বলল র্যাট।

স্টেশনটা বিশাল, আর সকালবেলা এখানে মানুষের ভিড়ে গিজগিজ করে চারপাশ। সময়টা আমাদের জন্য ভালো হয়েছে, কিন্তু ভয় তাতে কমছে না। চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে কুলি, ভ্রমণে বের হওয়া পরিবার ইত্যাদি; জিনিসপত্র ডেলিভারি দিতে আসা ট্রাকগুলো হর্ন বাজাচ্ছে। লাইডস্পিকারে কথা বলছে কেউ, শিষের শব্দও শোনা যাচ্ছে। সবাই দারুণ ব্যস্ত হয়ে ছোট্টাছুটি করছে চারপাশে, আর শব্দগুলো এত জোরালো যে চিৎকার করে কথা বলতে হচ্ছে আমাদের। দ্রুত পায়ে এগোচ্ছে র্যাট। আবারও ভয় লাগতে শুরু করেছে আমার। স্টেশনের ছোকরাগুলোর চেহারা আমার পছন্দ হয়নি ঠিক, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমাদের চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য কড়া চেহারার গার্ড-আর হাঁ করে আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে তারা। নিজেকে বলছি বারবার ‘আইন ভাঙছি না আমরা’-কিন্তু তারপরেও শান্ত করতে পারছি না মনকে। আর আইন ভেঙে যদি কোনো ছোকরা ধরা পড়ে তাহলে তার কপালে কি থাকে তা সবাই জানে। ট্রেনে চড়ে হালকা মার খাওয়ার কথা বলছি না। এই শহরে জেলখানাও আছে, আর সেখানে বড়দের চাইতে ছোটদেরই বরং বেশি ঢোকানো হয়। অনেকে নাকি জেলখানা পর্যন্তও যেতে পারে না, তার আগেই উধাও হয়ে যায়-যদিও জানি না এসবের কতটা সত্যি আর কতটা বানোয়াট-গল্প বলে ভয় দেখাতে কেউ কম যায় না কখনও। একবার পালিয়ে যাওয়া ছেলেদের গল্প শুনেছিলাম-কিন্তু পেয়েছিল আমার। পুলিশরা নাকি এমন কোনো ছোকরাকে পেলে প্রথমে তার পা ভাঙে, তারপর ফেলে রাখে রেললাইনের উপর। এই সবই নিশ্চয়ই গল্প, সত্যি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তারপরেও মাথার ভেতর থেকে চিন্তাগুলো সরিয়ে রাখতে পারছিলাম না। র্যাটকে হারিয়েই ফেলতে যাচ্ছিলাম কয়েকবার, কিন্তু গার্দো রয়েছে আমার পাশে পাশেই। মনে হচ্ছে, এখনই আমাদের ধরে ফেলবে কেউ।

এগিয়েই যাচ্ছে র‍্যাট। এখন আর কাঁপতে দেখা যাচ্ছে না ওকে, দ্রুত পায়ে হাঁটছে—মনে হচ্ছে মহা আনন্দে আছে। আমাদের চাইতে একটু সামনে রয়েছে ও। হাতে কিছু একটা রয়েছে—সেই চাবিটা। আন্দাজ করলাম, কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা। একটা ব্রিজের নিচ দিয়ে গিয়ে হলঘরের মতো একটা জায়গায় ঢুকলাম। নিচু ছাদ, সারি সারি টিউব লাইট ঝোলানো তা থেকে। হেঁটেই যাচ্ছি আমরা, যেন গম্ভব্য সম্পর্কে কোনো রকম সন্দেহ নেই আমাদের মনে। অবশেষে দেখা পাওয়া গেল সেগুলোর—দুই সারিতে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য ধূসর রঙের ধাতব লকার। অসংখ্য দরজার সারি, তার উপর নাম্বার লেখা।

হাঁটা থামলাম না আমরা।

কয়েকটা দরজা বেশ বড়, অনায়াসে স্যুটকেস ঢুকিয়ে দেয়া যাবে। আবার কোনো কোনোটা হ্যান্ডব্যাগের চাইতে বড় কিছু নিতে পারবে না। কোনো পুলিশ নেই, গার্ড নেই, স্টেশনের ছোকরারা নেই—আর র‍্যাট সরাসরি এগিয়ে যাচ্ছে সামনে। আমাদের জন্য এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল ও, তারপর কাছাকাছি যেতেই বলল, ‘তোমরা এগোতে থাকো, ঠিক আছে? থামবে না।’

দুই মহিলা একটা লকারের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম আমরা। নিজেদের কাজে খুব বেশি ব্যস্ত মহিলা দুজন, আমাদের খেয়ালই করল না। শেষ প্রান্তে এক দীর্ঘদেহী লোক দাঁড়িয়ে আছে, একটা লকারের দরজা আটকাচ্ছে। আমাদের দিকে পেছন ফিরে আছে সে। নাম্বারগুলো দেখতে পাচ্ছি আমি : ১১৩, ১০৯, ১০৮...কোনোটাতেই জোর করে খোলার কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না, আর এখনও কোনো পুলিশের দেখা নেই। তারপর, হঠাৎ করেই থমকে দাঁড়াল র‍্যাট, চাবি ঢুকিয়ে দিল একটা তালার মধ্যে। সরাসরি ওর পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম আমরা, দরজা খোলার ধাতব শব্দ এসে লাগল কানে। কেউ চিৎকার করে উঠল না। কেউ দেখেইনি ওকে। দশ পা এগোতেই একটা দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ পেলাম। আমাদের পাশে চলে এল র‍্যাট, বগলের নিচে কিছু একটা চেপে ধরে রেখেছে।

‘দৌড় দিও না,’ বলল ও। ‘ধীরেসুস্থে হাঁটতে থাকো, ঠিক আছে?’

ওর কথামতই কাজ করলাম আমরা, কিন্তু পাগলের মতো লাফাচ্ছে আমার বুকোর ভেতরটা। গার্দো দেখলাম বুদ্ধিমানের মতো একটা ড্রিংকস

মেশিনের সামনে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়াল, দেখল স্লটের ভেতর পয়সা আছে কিনা। এমন ভাব কর যেন কিছুই হয়নি-বারবার নিজেকে বলছি আমি। তিনটে ছোকরাকে দেখা গেল সামনে। জিনিসটা শার্টের নিচে ঢুকিয়ে ফেলেছে র‍্যাট। লোকজনের ভিড়ের মধ্য দিয়ে চার নাম্বার প্ল্যাটফর্মে চলে গেলাম আমরা, একদম শেষ মাথায়। তারপরই শুরু করলাম স্বস্তির দৌড়। রেললাইনে নেমে এলাম, প্রাণপনে দৌড়াচ্ছি এখনও। পাঁচ মিনিট পর ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। একপাশে পড়ে আছে কিছু কংক্রিটের স্লিপার, সেগুলোর উপর বসলাম এবার। হাঁপিয়ে গেছি তিনজনই।

দাঁত বের করে হাসছে র‍্যাট, আর আমিও। দুই হাতে প্যাকেটটা বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিল ও, যেন উপহার দিচ্ছে। বাদামি রঙের একটা খাম, তার উপরে টেপ দিয়ে আটকানো। খুলতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লেগে গেল আমার।

ভেতরে রয়েছে একটা চিঠি, এক কোণে একটা ডাকটিকিটও লাগানো আছে। ডাকে ফেলার জন্য প্রস্তুত।

খামের উপর মোটা নিবের কলমে লেখা হয়েছে : খুঁজে পেলে এই ঠিকানায় পৌঁছে দিন-গ্যাব্রিয়েল ওলোন্দ্রিজ, কয়েদি নাম্বার-৭৪৬২২৯, সেল ব্লক ৩৪কে, সাউথ উইং, কোলভা জেলখানা।

আবারও শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসতে শুরু করল আমার। কিন্তু গার্ডের দিকে তাকিয়ে হাসলাম তবুও। কড়া চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল ও।

চিঠিটা খুলে জোরে জোরে পড়তে শুরু করলাম। এক পাতার চিঠি, তার সাথে ছোট্ট একটা স্লিপ আটকানো। স্লিপে শুধু কয়েক সারি সংখ্যা লেখা, অর্থ বুঝতে পারলাম না কিছুই। আবার চিঠিটার কোনো অর্থও আমাদের বোধগম্য হলো না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারলাম, আমরা অনেক গভীর কিছুর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি।

অধ্যায় ১

আমার নাম ফাদার হুলিয়ার্ড। এই সব ঘটনাগুলো আমিই একসাথে করছি—সব নাম বদলে দেয়া হয়েছে অবশ্য, বুঝতেই পারছেন কেন। এর গুরুত্ব বুঝতে পারবেন শেষে গিয়ে, কিন্তু এটা এমন একটা গল্প যেটা আমাকে বলতেই হতো। এখন থেকে যে ঘটনাগুলো ঘটবে সেগুলোর বর্ণনা আমিই সবচেয়ে ভালো দিতে পারব। আর পারবে আমার এক প্রাক্তন কর্মকর্তা।

সাত বছর ধরে বেহালায় এই মিশন স্কুলটা চালাচ্ছি আমি। কাজটা ছিল এক বছরের জন্য; আমার দায়িত্ব ছিল কিছু অর্থনৈতিক ঝামেলা কাটিয়ে তুলে স্কুলটাকে আবার গতিশীল করে তোলা। আমার শেষ দায়িত্ব হওয়ার কথা ছিল এটা—তেষষ্টি বছর বয়স হয়েছে আমার। কিন্তু এই জায়গাটার প্রেমে পড়ে গেলাম গুরুতেই, তারপর থেকে এখানেই রয়েছি। দুর্ভাগ্যক্রমে, এই বছর অবসরে যেতে হবে আমাকে—তার পেছনে একটা কারণ হিসেবে এই গল্পটাও দায়ি। স্কুলের নতুন প্রধানকে ইতোমধ্যেই নিয়োগ দেয়া হয়ে গেছে। আমার শেষ দায়িত্বটা হবে তার হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে সব কিছু হস্তান্তর করে দেয়া।

এই দেশেই থাকার ইচ্ছা আছে আমার, যদিও জানি না পারব কিনা।

এখানে বলে রাখা ভালো, আমাদের স্কুলের নতুন নতুন কর্মকর্তা এখন বেশ দরকার, কারণ ধীরে ধীরে বড় হওয়ার বদলে আরও ছোট হয়ে আসছি আমরা। ছেলেমেয়েদের স্কুলে নিয়ে আসা বেশ কঠিন কাজ; ওদের খাবার ঘুষ দিই আমরা। আমাদের আয় কমে যাচ্ছে, তাই খাবারের সরবরাহ কখনই নিয়মিত থাকে না। তাছাড়া জায়গাটা প্রচণ্ড গরমও বটে, বিশেষ করে শুকনো মৌসুমে ভেতরে মোটেই টেকা যায় না। স্কুলটা তৈরি হয়েছে বড় বড় মেটাল বক্স দিয়ে, যে আয়রন কন্টেইনারগুলো দেখা যায় জাহাজে আর ট্রাকের পেছনে। দশটা দান করা হয়েছিল এই মিশন স্কুল চালু করার জন্য। কন্টেইনারগুলোকে একসাথে আটকানো হয়েছে, তারপর জানালা

আর দরজা তৈরি করা হয়েছে সবগুলোর গায়ে। ব্যাস, হয়ে গেল একটা মেটাল স্কুল। আরও ছয়টা ক্রেট নিয়ে এসে রাখা হয়েছে দোতলায়। দুটো দিয়ে বানানো হয়েছে প্রার্থনার জায়গা। তিনটে একসাথে করে একটা বেবি'স রুমও বানানো হয়েছে, এক কোণে অল্প একটু খেলার জায়গা। আর একটা কন্টেইনারের অর্ধেক বিশ্রামের জায়গা, আর বাকি অর্ধেক আমার অফিস।

রাফায়েল আর গার্দোর শুধু চেহারা চিনতাম আমি, কারণ ক্লাসে খুব কমই দেখা যেত ওদের। দশ বছর বয়সের পর সাধারণত সব ছেলেমেয়েই স্কুলে আসা বন্ধ করে দেয়। তাদের পরিবার চায় তারা ময়লার পাহাড়ে কাজ করুক, আর শিক্ষা যে তাদের কাজে লাগবে এটার সপক্ষে যুক্তিও খুব বেশি খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই ওদের হারিয়ে ফেলি আমরা। ছোট জুন-যে ছেলেটাকে সবাই র্যাট বলে ডাকে-ওকে অবশ্য ভালো করেই চিনতাম। প্রায়ই আমার অফিসে আসত ছেলেটা, বিশেষ করে অন্যান্য ছেলেমেয়েরা যখন থাকত না। বাইরে থেকে জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকত ও, বাঁদরের মতো। প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র ওকে দিতাম আমি, আর যদি কখনও চাইত-তাহলে গোসল করার ব্যবস্থাও করে দিতাম। খাবারও দিতে হতো, কারণ দেখেই বোঝা যায় যে না খেয়ে থাকতে হয় ওকে। আমাদের নিয়ম হচ্ছে, খাবার দেয়া হবে শুধু দুপুরের খাবারের সময়, ক্লাসের পরে আধ ঘন্টার জন্য। কিন্তু জুন এবং ওর মতো আরও কয়েকজনের জন্য নিয়মটা ভাঙতে হয়েছে আমাকে। কারণ, আমি সব সময়ই বলে আসছি, নিয়ম হলো ভাঙার জিনিস। আমি নিজেই নিয়ম তৈরি করি, তারপর নিজেই ভাঙি সেগুলো। সিস্টার অলিভিয়াও নিয়ম ভেঙেছিল, সে সম্পর্কে সময় হলেই জানতে পারবেন আপনারা।

চেয়ারের উপর পা রেখো না, নিজের জন্য প্রয়োজনীয় খাবারের বেশি নিও না, পরিবারের জন্য অতিরিক্ত খাবার নিও না, লাইনে দাঁড়াও, নিচু গলায় প্রার্থনা করো, ভেতরে থাকার সময় গায়ে শার্ট রাখো, চ্যাপেলে ঢোকান আগে পা ধুয়ে নাও-এমন আরও অনেক নিয়ম। নিজের কাছে হাসি পেত আমার, কিন্তু নিয়ম হচ্ছে এমন জিনিস যা কখনও কখনও বোকামি মনে হলেও জীবনে এগুলোর প্রয়োজন আছে। তবে আমি একটা নিয়ম বেশ পছন্দ করি, কারণ সেটা বেশ অদ্ভুত : চ্যাপেলে ওঠার সিঁড়িতে কেউ কোনো কথা বলবে না।'

চ্যাপেলের সিঁড়িতে কথা বলা যাবে না কেন? বলছি সেটা। এই ঘটনার সাথে কোথাও কোনো সম্পর্ক আছে ব্যাপারটার।

চ্যাপেল এবং চ্যাপেলের সিঁড়িটা উৎসর্গ করা হয়েছে এই স্কুল যেই ব্যক্তির নামে, তাকে। তার নাম প্যাসকাল আগিলা-দেশের মোটামুটি অপরিচিত স্বাধীনতা যোদ্ধাদের একজন। আগিলা পরিবার প্রতি বছরই বেশ বড় অংকের অনুদান পাঠায় স্কুলে। দোতলার জন্য ছয়টা কন্টেইনারও ওরাই কিনে দিয়েছে। আমাদের শুধু বলেছে আমরা যেন প্যাসকালের স্মৃতিকে সম্মান জানাই-যেটা আমার কাছে এক আনন্দজনক দায়িত্ব। লোকটা ছিল এমন একজন মানুষ যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, আর গুলি খেয়ে মরেছে এই কাজের জন্য। তাই দিনের মধ্যে কয়েকবার আমরা তাকে সম্মান জানাই, সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় কথা না বলে। আমি লক্ষ্য করেছি, ছেলেমেয়েদের কখনও ব্যাপারটা মনে করিয়ে দিতে হয় না। মাঝে মাঝে হয়তো নতুন কোনো ছেলে বা মেয়ে কথা বলে ওঠে, কিন্তু সাথে সাথে সবাই মিলে ‘শশশশশ...’ আওয়াজে তাকে চুপ করিয়ে দেয়। ওদের কাছে প্যাসকালের কথা বলি আমি, তার একটা ছবিও ঝোলানো আছে চ্যাপেলের বেদীর উপর। নতুন কিছু তৈরি করার প্রতি আগ্রহী ছিল সে, জীবনকে উন্নত করতে চাইত। প্রায় এক ডজন ভাষায় কথা বলতে পারত, যদিও তার জন্ম ছিল দরিদ্র পরিবারে। উকিল হয়েছিল পেশায়, কিন্তু থাকত শহরের দরিদ্র অংশে। সবচেয়ে কঠিন কেসগুলো নিত, আর জিতেও আসত। বস্তিবাসীদের ঘরগুলো যখন গুড়িয়ে দেয়া হতো, তখন সরকারকে চাপ দিয়ে তাদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করত প্যাসকাল আগিলা। যখন একটা ভবন নির্মাণ প্রজেক্টে প্রায় এক হাজার লোক ভাড়া করা হলো, অথচ তাদের কাঁউকে বুট, গ্লাভস বা হ্যাট দেয়া হলো না, তখন প্যাসকাল আগিলা আমলা করেছিল সেই কোম্পানির নামে। ফলে আইন করে ব্যাপারটা বাধ্যতামূলক করা হয়, আর ভবন নির্মাণের কাজ আগের চাইতে অনেক সহজ হয়ে ওঠে। কলেরার আক্রমণ দেখা দিলে স্থানীয় হাসপাতাল-যেটা ছিল শুধু বড়লোক রোগীদের চিকিৎসা নেয়ার জায়গা-তাদের চাপ দিয়ে দরিদ্রদের জন্য আলাদা ইউনিট খুলতে বাধ্য করে আগিলা। তার শেষ কাজটা, যেটা করতে গিয়ে মরতে হয়েছিল তাকে-সেটা ছিল তিন সিনেটরের মুখোশ খুলে দেয়া, যারা জনগণের ট্যাক্সের টাকা বিদেশের ব্যাংকে নিজেদের নামে জমা করছিল। ফলশ্রুতিতে তিনজনই পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়, আর বিচার চলতে থাকে।

সাক্ষি দেয়ার জন্য ট্যান্সিতে করে যাওয়ার পথে গুলি করে খুন করা হয় প্যাসকাল আগিলাকে। ছাব্বিশটা বুলেট ঢুকেছিল তার শরীরে, প্রতিটা বুলেটই পুলিশের ব্যবহৃত অস্ত্রের গুলি। কিন্তু তার খুনিদের কখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

কখনো কখনো সিঁড়িতে বসে থাকি আমি, ভাবি সেই সাহসী লোকটার কথা। এই ছোট ছোট ব্যাপারগুলো-সিঁড়িতে নিস্তদ্ধতার মতো ব্যাপার-এর মধ্যেই মৃতরা বেঁচে থাকে আমাদের মধ্যে। এই দেশে, মৃতরা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আমি কিভাবে রাফায়েলের গল্পের অংশ হলাম, সেটা নিশ্চয়ই জানতে চাইছেন আপনারা। জানতে চাইছেন, কি করেছিলাম আমি। এখানে আমার অংশ অবশ্য খুব সামান্য। সিস্টার অলিভিয়া, আমাদের খণ্ডকালীন হাউস-মাদার বরং আরও বেশি জড়িয়ে পড়েছিল, হয়তো বোকামির পরিমাণও তার ভাগেই বেশি। কিন্তু আমি জড়িয়ে পড়েছিলাম স্কুলের কম্পিউটারটার কারণে, যেটা দান করেছিল আরএসবিসি ব্যাংক। ছোট ছোট কিছু সাফল্য আছে আমাদের! কম্পিউটারটা বেশ পুরনো, তবে তাই বলে আমাদের ছোট করে দেখবেন না দয়া করে। ওরা যদি আমাদের দান না করত, তাহলে হয়তো ময়লার ভাগাড়েই জায়গা হতো ওটার। কিন্তু কি আসে যায়? ভালো মন নিয়েই নিশ্চয়ই জিনিসটা আমাদের দিয়েছে ওরা, আর আমাদের অনেক কাজেও আসে। ইন্টারনেটে টাকা যায় ওটা দিয়ে, ছেলেমেয়েরা মাঝে মাঝে আমার অনুমতিসাপেক্ষে গেমসও খেলে।

বৃহস্পতিবার বিকেলবেলা জুন এলো আমার সাথে দেখা করতে, সাথে আরও দুটো ছেলে।

‘স্যার পো,’ ডাক দিল জুন। ‘স্যার পো?’

সরু, বাঁশির মতো গলা ওর। একবার শুনতেই চিনে ফেললাম।

ঘুরে তাকিয়ে হাসলাম আমি। আমার অফিসের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জুন। ম্যাচের কাঠির মতো সরু সরু হাত পা, ছাইয়ের মতো রঙ গায়ের। কিন্তু মুখে উজ্জ্বল হাসি, যা দেখলে আপনার মুখেও হাসি ফুটে উঠতে বাধ্য। ওকে দেখলেই আমার মন ভালো হয়ে যায়। ‘আমরা একটা জিনিস খুঁজছি, পো,’ বলল ও। কথা প্রসঙ্গে মনে রাখি, ‘পো’ কথাটা সাধারণত বয়স্কদের সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। ‘আমরা কি কম্পিউটারটা ব্যবহার করতে পারি, পো?’

বললাম, দেরি করে ফেলেছে ও। কিন্তু তারপর ওর পেছনে ওর দুই বন্ধুকে চোখে পড়ল আমার-শুকনো, হাড় জিরজিরে চেহারার দুটো ছেলে। একজন লাজুক ধাঁচের, আরেকজনের চেহারা সতর্কতা-একবার দেখলেই বোঝা যায় নেতা আসলে কোন জন। দ্বিতীয় ছেলেটার মাথা কামানো, নিম্পলক দৃষ্টি। লম্বা লম্বা হাত পা, আর খাবারের অভাব সত্ত্বেও একজন অ্যাথলেটের মতো দাঁড়ানোর ভঙ্গি। অন্যজনের লম্বা চুলগুলো কপাল ঢেকে দিয়েছে, মুখে উজ্জ্বল হাসি।

‘পো, স্যার পো, এই হলো গার্দো,’ কামানো মাথাওয়ালা ছেলেটার দিকে ইঙ্গিত করল জুন। ‘আর ও হলো রাফায়েল। আপনি চেনেন ওদের?’

বললাম, ওদের সাথে আমার পরিচয় নেই, তবে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হয়েছি। তারপর হাত মেলালাম সবার সাথে।

‘ওরা একটা কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে,’ বলল জুন। ‘খবরের কাগজে পেয়েছে আর কি। কিছু তথ্য বের করতে হবে ওদের, স্যার। আমাকে বলেছে, ওরা তো স্কুলে আসে না, তাই আপনি হয়তো ওদের সাহায্য করবেন না। সেজন্যে আমাকে নিয়ে এসেছে সাথে করে। কম্পিউটার ব্যবহার করার জন্য টাকা দিতেও রাজি আছে ওরা, বুঝলেন? আমি বলেছি যে আপনি রাজি হতেও পারেন, পো।’

ভেতরে আসতে বললাম ওদের। আমার ডেস্কের সামনে দাঁড়াল তিনজন। হাফপ্যান্ট আর টিশার্ট পরে আছে-হাঁটুর নিচ থেকে পুরো পা কালো হয়ে আছে ময়লায়। গায়ের দুর্গন্ধে ভরে উঠেছে ঘরটা। রাফায়েল নামের ছেলেটা আমার দিকে তাকাল, চোখের উপর থেকে সরিয়ে দিল চুল। লজ্জা পাচ্ছে, বোঝা যায়। দুই হাতে একটা বিশ পেসোর নোট ধরে রেখেছে সে। গার্দো রয়েছে তার পেছনে, সরাসরি তাকিয়ে আছে আমার দিকে। মনে হচ্ছে যেন আমি ওর লড়াইয়ের প্রতিপক্ষ।

‘আজ কিন্তু কানেকশন বেশ ধীর,’ বললাম ওদেরকে।

কম্পিউটারের সামনে এবার দ্বিতীয় একটা চেয়ার রাখলাম, তারপর হাত নেড়ে সরিয়ে দিলাম টাকা ধরা হাতটা। চেয়ারগুলোতে বসে পড়ল ওরা। সরাসরি কাজে নেমে পড়ল রাফায়েল। আজকালকার ছেলেপুলেরা কিভাবে যেন কম্পিউটার চালাতে শিখে যায়, কারও সাহায্য ছাড়াই। ব্যাপারটা যখনই দেখি, তখনই অবাক হই। যে ছেলে জীবনে কখনও ক্লাসরুমে পা রাখেনি, সে-ও আমার চাইতে দ্রুত টিপছে কিবোর্ডের

বোতামগুলো। নিশ্চয়ই গেমের দোকানগুলোতে শিখেছে। দশ পেসোর বদলে ওখানে পনেরো মিনিটের জন্য গোলাগুলি আর দৌড়াদৌড়ির সুযোগ পাওয়া যায়।

দেখলাম, সরাসরি সার্চ ইঞ্জিনে চলে গেল ছেলেটা। টাক মাথার ছেলেটা একটা কাগজ বের করে ভাঁজ খুলল। একটা নাম টাইপ করল রাফায়েল। রেজাল্ট দেখাতে বেশ সময় নিতে লাগল কম্পিউটারটা।

বললাম, ‘আজ কিছু খাওয়া হয়েছে, জুন?’

হেসে আমার দিকে তাকাল জুন, একটা হাত উঁচু করল। গর্বিত গলায় বলল, ‘কিছু খাইনি!’

রান্নাঘরে গিয়ে কয়েকটা স্যান্ডউইচ বানালাম আমি, তারপর তিনটে গ্লাসে ঢাললাম লেমোনেড। ফিরে এসে দেখলাম, নিচু কিন্তু উত্তেজিত গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছে ছেলেগুলো, স্ক্রিনের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে বারবার। একটা স্থানীয় নিউজসাইটে ঢুকেছে ওরা, পড়ছে সতর্ক চোখে।

‘প্রশ্নটা কি?’ জানতে চাইলাম আমি। হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। তাই আবার বললাম, ‘তোমাদের কুইজের কথা বলছি। কি প্রশ্নের উত্তর খুজছ তোমরা?’

রাফায়েল বলল, ‘ইতিহাসের প্রশ্ন, স্যার।’ তারপর আবার নিজের ভাষায় কথা বলতে শুরু করল ও। লজ্জার কথা, কিন্তু সাত বছর এই দেশে থাকার পরেও ভাষাটা ভালো করে শিখে উঠতে পারিনি আমি। দ্বিতীয় ছেলেটা, অর্থাৎ গার্দো মাথা ঝাঁকচ্ছিল। যে ব্যাপারেই ওরা আলোচনা করে থাকুক না কেন, মনে হচ্ছিল ব্যাপারটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

এর মধ্যে জুন একটা স্যান্ডউইচ তুলে নিল। ওর হাতটা এত ময়লা যে প্রায় চমকে উঠলাম আমি। নখ কামড়ে কামড়ে কিছু আর রাখেনি, আঙুলগুলো কঙ্কালের মতো সরু সরু। বারবার বলে, ক্লাসে আসবে, কথা দেয় আমাকে—কিন্তু আসে খুবই কম। স্কুল ওর কেন ভালো লাগে না, কে জানে! আমাদের মধ্যে এটা একটা কৌতূহলের মতোই হয়ে গেছে এখন। আমি সব সময় বলি, ‘তো-কাল স্কুলে আসছ তো?’ ও আমাকে বলে, আসবে কিন্তু আমি জানি, আসবে না। প্রথমবার যখন এখানে গোসল করল, সেই দৃশ্যের কথা কখনও ভুলব না আমি। একটা তোয়ালে কোমরে জড়িয়ে শীত আর উত্তেজনায় কাঁপছিল হি-হি করে, নাচতে লেগেছিল প্রায়। সজোরে ছুটে আসা পানির ঝাপটায় নিজের শরীর পরিষ্কার হয়ে যেতে

দেখে বোধহয় খুব মজা পাচ্ছিল। ওকে আমাদের স্কুলের একটা ইউনিফর্মও দিয়েছি আমি, কিন্তু কখনও পরতে দেখিনি।

সিস্টার অলিভিয়াও ভালবেসে ফেলেছে ওকে। এমনকি ওকে দত্তক নিতে চাওয়ার কথাও বলেছিল আমাকে। ইংল্যান্ড থেকে আসা বাইশ বছরের একটা মেয়ে, সে কিনা ওকে দত্তক নিতে চায়! আমি বলেছিলাম এসব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে। এখানে দত্তক নেয়ার নিয়মকানুন অনেক জটিল, আর সময়সাপেক্ষ। গত ছয় বছরে কেবল একজন বিদেশিকে দেখেছি সফলভাবে কাউকে দত্তক নিতে। কোনো সরকারই তার সন্তানদের হাতছাড়া করতে চায় না, এটা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু হাজার হাজার ছেলেমেয়ে, যাদের যত্ন নেয়ার কেউ নেই—তাদের দিকে তাকালেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। বিশাল আবর্জনার পাহাড়ের উপর ঘুরে বেড়ানো ছেলেমেয়েগুলোকে দেখলে যে কারও মনে হওয়া স্বাভাবিক, এ ধরনের স্কুলগুলোতে গিয়ে কারও কোনো লাভ হবে না। বস্তিগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর সময় শিশুদের চোখে পড়ে আমার, আমার কোলে তুলে দেয়া হয় ওদের। ওদের হাসিমুখ দেখতে দেখতে আমার মনে কেবল একটা কথাই ভাসতে থাকে—এই ছোট্ট শিশুটা হামাগুড়ি দিতে শেখার সাথে সাথেই ওকে পাঠিয়ে দেয়া হবে ওই ময়লার পাহাড়ে।

খাবারের ট্রে নিয়ে আমি ফিরে আসার একটু পরেই ছেলেগুলোর কাজ শেষ হয়ে গেল। স্যাণ্ডউইচ আর লেমোনেড খেতে লাগল ওরা। বেশ ভদ্র সবাই, এখানকার প্রায় সবাই ভদ্র। তবে একটু পরেই চলে যেতে চাইল ওরা।

আমি বললাম, ‘তাহলে কাল কি স্কুলে পাচ্ছি তোমাদের?’

জুন হাসল। ‘অবশ্যই!’

রাফায়েল বলল, ‘আমি আসতে চাই, পো। কিন্তু আমার অনেক আজ,’ বলে কপাল থেকে চুল সরিয়ে সেই উজ্জ্বল হাসিটা উপহার দিল আমার।

ওকে মনে করিয়ে দিলাম যে সকালের ক্লাস করার পরেও কাজ করার জন্য যথেষ্ট সময় থাকবে ওর হাতে। স্কুলটা এ জন্যই তৈরি করা হয়েছে—ছেলেমেয়েরা যেন কাজের ফাঁকে ফাঁকেই শিক্ষা লাভ করতে পারে। পাঁচ দিন ক্লাস করলে ওদের দুই কেজি চাল আর কিছু অন্যান্য খাবার দেয়া হয়, যেটা নির্ভর করে অনুদান কেমন এসেছে তার উপরে। এটা হলো ওদের সুবিধা। আমার দিকে তাকিয়ে রইল রাফায়েল। আমার মনে হলো,

ও নিশ্চয়ই সেই স্বাভাবিক চিন্তাটাই করছে : এই পড়ালেখা করে আমার কি লাভ হবে?

‘আমি আসব, পো,’ বলল ও।

তারপর জুন উঠে দাঁড়িয়ে খাবারের প্লেট আর গ্লাসগুলো রান্নাঘরে নিয়ে গেল। বলল ধুয়ে রাখবে, আর তাই করল। তারপর বেরিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল শক্ত করে। ওর হাতে পঞ্চাশ পেসোর একটা নোট দিলাম আমি।

অন্য ছেলেদুটো বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল ওর জন্য। একই সাথে দৌড়াতে শুরু করল তিনজন-আর কখনও দেখা হয়নি ওদের সাথে আমার। কয়েক সপ্তাহ পরে গিয়েই কেবল জানতে পারলাম, ওরা মিথ্যে বলেছিল আমার কাছে। কুইজ প্রতিযোগিতার কথাটা ছিল আগাগোড়া বানোয়াট। ওরা আসলে মি. হোসে অ্যাঞ্জেলিকো নামের ওই লোকটা সম্পর্কে সব কিছু জানার চেষ্টা করছিল। সেই সাথে গ্যাব্রিয়েল ওলোন্দ্রিজ নামের একটা লোক সম্পর্কেও তথ্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে, যে ওই সময়ে এই শহরের সবচেয়ে বড় জেলখানায় তার সাজার তেইশতম বছরটা কাটাচ্ছিল।

র্যাটও একটা ফন্দি আঁটছিল তখন, যেটা যথাসময়ে জানা যাবে। খুব সুন্দরভাবে আমাকে বোকা বানিয়েছে ওরা, সেই সাথে নিয়ে গেছে যা কিছু প্রয়োজন ছিল।

আবারও রাফায়েল বলছি। ঘটনা এবার প্যাঁচ খেতে শুরু করেছে।

সেই রাতেই পুলিশ এল, যেমনটা বলেছিল গার্দো। আমাদের বাড়িতে তল্লাশী করল, তারপর আমাকে ধরে নিয়ে গেল।

চার ভ্যান ভর্তি করে এসেছিল ওরা। আমাদের মহল্লার সবাইকে বলা হলো ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসতে। পুলিশদের সবার হাতে ছিল ফ্ল্যাশলাইট আর ব্যাটন, সবাইকে খেদিয়ে এক জায়গায় জড়ো করল। অন্যান্য মহল্লার লোকজনও বাদ গেল না। কাউকে অবশ্য বলা হলো না কিছু। আমাদের মহল্লার নেতা টমাসকে কিছু কাগজ দেখাল ওরা, তবে তার মতামত শোনার জন্য অপেক্ষা করল না। এক ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে সব কাজ শেষ করে ফেলল। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, চিৎকার করে পরস্পরের সাথে কথা বলছে ওরা, জিনিসপত্র এদিক ওদিক ছুঁড়ে ফেলছে। ছোট ছোট শিশুদের কেউ কেউ কাঁদছিল, কিন্তু বড়দের বেশিরভাগই শান্ত হয়ে দেখছিল কি করে ওরা।

আর কিছু তো করার ছিল না আমাদের।

তারপর আবার ভ্যানে উঠে বসল পুলিশগুলো, পায়নি কিছুই।

আমি বুঝতে পারিনি যে আমাকে ধরে নিয়ে যাবে ওরা, কারণ কেউ আমাকে তেমন কিছু বলেনি। সেই তরুণ পুলিশটাকে দেখতে পেলাম হঠাৎ করে, আমার দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে ইশারা করল। বুঝলাম, আমার ব্যাপারেই কথা বলছে। কিন্তু তারপরেও যখন দুই পুলিশ এগিয়ে এসে আমার দুই হাত চেপে ধরল, বেশ অবাক হলাম আমি।

পরের ঘটনাগুলো লেখা বেশ কঠিন কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু আমাকেই লিখতে হবে, আর কেউ পারবে না।

কি করব বুঝতে পারছিলাম না। কোনো শব্দ করলাম না, নড়াচড়া করলাম না—এমনকি নিঃশ্বাস নিতেও ভয় পাচ্ছিলাম, বুঝতে পারছিলাম না কার কাছে সাহায্য চাব। গার্দো অবশ্য আমার পাশেই ছিল, দ্রুত কথা বলে যাচ্ছিল—‘কী করছেন আপনারা? ও কিছু করেনি!’ একই কথা বলছিল

বারবার। আমার আন্টি চিৎকার করতে শুরু করল, তারপর পড়ে গেল রাস্তার উপর। সাথে সাথে বেশ বড়সড় গুণ্ণগোল শুরু হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম, আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে দেখছে লোকে। লোকজন চেচামেচি করছে, পুলিশকে বোঝানোর চেষ্টা করছে, আমার আর পুলিশের গাড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাধা দিতে চাইছে। একটা ভ্যান থেমে গেল, বেরিয়ে এল কয়েকজন পুলিশ। কিন্তু এর বেশি কিছু দেখার সুযোগ পেলাম না, তার আগেই একটা গাড়ির খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে উঠিয়ে দেয়া হলো আমাকে। গার্দো জড়িয়ে ধরল আমাকে, কিন্তু কেউ একজন ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল। সবার গলা ছাপিয়ে ওর চিৎকারের শব্দ শুনতে পেলাম। ওর চাচাদের একজন ধরে রেখেছে ওকে। গাড়িতে ওঠার সময় শেষ একটা চেষ্টা করলাম পালিয়ে যাওয়ার, কিন্তু পারলাম না। দুটো বিশালদেহী পুলিশ আমাকে ধরে রেখেছে, আমার কথা কেউ শুনতে চাইছে না। গাড়ির পেছনের সিটে বসিয়ে দেয়া হলো আমাকে, দরজা বন্ধ হয়ে গেল। গার্দোকে দেখতে পেলাম আবার। চিৎকার করছে আমার দিকে তাকিয়ে, আমার কাছে আসতে চাইছে। এক পুলিশ ওর ঘাড় চেপে ধরে ঠেলে ফেলে দিল। চলতে শুরু করল গাড়ি। কেঁদে ফেললাম আমি। জানালার বাইরে অসংখ্য মুখ, আমার দিকে তাকিয়ে আছে, চিৎকার করছে। কিন্তু পরিচিত কাউকে চোখে পড়ল না তার মধ্যে। গার্দোকেও দেখা যাচ্ছে না আর।

ভয়ে প্রায় অসুস্থ বোধ করতে লাগলাম আমি, কিছুতেই কান্না থামাতে পারছিলাম না।

রাস্তাটা খুব খারাপ, আর ড্রাইভার চালাচ্ছেও বেশ জোরে-তাই ঝাঁকি খেতে খেতে এগিয়ে চলেছি আমরা। এখনও রাস্তার পাশে লোকজন দেখা যাচ্ছে, এমনকি ছাদের উপর উঠে দমাদম কিল মারছে কে যেন। প্রধান গেট দিয়ে বেরিয়ে সড়কে উঠে এলাম আমরা। সাইরেন চালু করে দিল গাড়িগুলো, দ্রুত এগিয়ে চলল এবার। লাল বাতিগুলো দেখেও থামার দরকার হলো না, ট্রাফিক পুলিশ হাত নেড়ে আমাদের চলে যেতে বলল। দোকানপাট, মানুষভর্তি রাস্তা আর আলোকিত পরিবেশের মধ্য দিয়ে যেতে আমার খারাপ লাগছিল না কোনো এক অদ্ভুত কারণে। কিন্তু তারপরেই মোড় নিয়ে আরও ছোট রাস্তায় নেমে এল গাড়িগুলো, কোনো জনমানুষ নেই কোথাও। কিছুক্ষণ পরে আর আলোও দেখা গেল না কোথাও।

এর আগে কখনও এত বেশি একাকী বোধ করিনি আমি, কিছুতেই

কান্না থামাতে পারছিলাম না তাই। বললাম, 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?'

একজন বলল, 'তোর কি মনে হয়?'

আমি বললাম, 'আমি কিছু করিনি, স্যার।'

লোকটা জবাব দিল, 'আমরা জানি সেটা, ছোকরা। চুপ করে বসে থাক।'

'আমি কিছু করিনি, স্যার,' আবার বললাম আমি। ফোঁপাচ্ছি আর একই কথা বলে যাচ্ছি বারবার।

লোকটা যেমন বলল, তেমন চুপ করে থাকার চেষ্টা করেও পারছিলাম না। সামনে আর পেছনে দুলছিলাম শুধু। শুধু মনে হচ্ছিল, আমার চাইতে একা আর কেউ নেই এখন, যে কোনো সময় যে কোনো কিছু ঘটে যেতে পারে। একটু আগেই সব কিছু স্বাভাবিক ছিল-আন্টি, গার্দো, আমার কাজিনরা, আঙনের চারপাশে জড়ো হওয়া মানুষজন-এরা সবাই আমার সাথেই ছিল। অথচ এখন মনে হচ্ছে একটা গর্তের মধ্য দিয়ে শুধু পড়েই যাচ্ছি, কোনো শেষ নেই এই পতনের। এক সেকেন্ডের মধ্যে বদলে গেছে সব কিছু। আমার বন্ধুরা নেই এখন আমার সাথে, কেউ জানে না আমি কোথায় আছি। শুধু মনে হচ্ছে, এই পতন কখন থামবে? মনে হচ্ছে, ওরা কি করবে আমাকে নিয়ে?

খামটা রয়েছে র‍্যাটের কাছে। আইডি কার্ডটাও ওর কাছেই রয়েছে। তবে আমি ওগুলোর সন্ধান দেবো না, কারণ এখন আগের চাইতে বেশি জানি আমরা। হোসে অ্যাঞ্জেলিকোর ব্যাপারে জানি আমরা। বুঝতে পারছি যে একটা লড়াই আসন্ন।

রাস্তা আর বিল্ডিংগুলো সব ধূসর সিমেন্টের রঙ। ডানে, বামে, সামনে, পেছনে অনেকবার মোড় নেয়ার পর অবশেষে ভারি চেহারার একটা গেটের সামনে, পার্কিং লটে এসে থামল গাড়িগুলো। কুকুরসহ এক পুলিশ এসে গেট খুলে দিল। ভেতরে ঢুকল গাড়িগুলো। ঢালু রাস্তা বেয়ে নিম্নে এল আন্ডারগ্রাউন্ডে। আরও বেশি ভয় পেতে শুরু করলাম আমি, কাঁদতে শুরু করলাম আবার। আন্টিকেও ডাকতে লাগলাম বারবার। আরেকটা সত্যি কথা বলে রাখি এই পর্যায়ে-প্যান্টও ভিজিয়ে ফেললাম আমি।

উজ্জ্বল আলোর নিচে এসে থামল গাড়ি। আমাকে বের করে আনা হলো। নিজে থেকে প্রায় চলতেই পারছিলাম না, এক পুলিশ এসে আমাকে প্রায় টেনে নিয়ে চলল-আমি বাধা দিচ্ছি বলে নয়, এত বেশি ভয়

পেয়েছিলাম যে আমার পাগুলো কাজই করতে চাইছে না। মৃদু স্বরে কথা বলতে বলতে আমাকে প্রায় বয়েই নিয়ে চলল সে। কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম আমরা, বেশ কয়েকটা ধাতব দরজা পার হলাম। একটা করিডোরে এসে পৌঁছলাম তারপর। দুই পাশে সেল রয়েছে বেশ কয়েকটা, সবগুলোর উপর নাম্বার লেখা। এক পুলিশ এসে একটা সেলের দরজা খুলে দিতে আমাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া হলো। দরজা বন্ধ হয়ে গেল আবার। মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলাম, কি করব বুঝতে পারছি না। এত অসুস্থ লাগছে, মনে হচ্ছে যে কোনো সময় মেঝেতে পড়ে গিয়ে মরে যাব। কয়েক সেকেন্ড পরেই অবশ্য আবার খুলে গেল দরজা, প্রচণ্ড শব্দের সাথে। এক পুলিশ ভেতরে ঢুকে আমাকে বসতে বলল।

মেঝের উপর বসলাম আমি। অসুস্থ লাগছে এখনও। বেশি কিছু খাওয়া হয়নি, তারপরেও পেটে যা ছিল সব বেরিয়ে গেল। কাঁদতে শুরু করলাম আবার। এর আগে কখনও নিজের কণ্ঠ থেকে এমন কাতর কান্নার শব্দ শুনতে হয়নি আমাকে।

বেঞ্চের উপর বসল পুলিশটা। এবার আর দরজা বন্ধ করল না। মনে হয় বুঝতে পেরেছে, খুব বেশি ভয় পেয়েছি আমি, আমাকে একা রাখা ঠিক হবে না। একটা ছোট তোয়ালে দিল আমাকে। গায়ে লেগে থাকা বমি পরিষ্কার করার চেষ্টা করলাম সেটা দিয়ে, কিন্তু খুব একটা সফল হলাম না।

সময় কেটে যাচ্ছে।

সেলের মধ্যে ওই কংক্রিটের বেঞ্চটা ছাড়া আর তেমন কিছুই নেই। আমার সাথে কয়েকবার কথা বলার চেষ্টা করল পুলিশের লোকটা, আমুলি কিছু প্রশ্ন করল। কিন্তু আমি আবিষ্কার করলাম, কোনো কথা বের হচ্ছে না আমার মুখ থেকে, যতই চেষ্টা করি না কেন। কিছুক্ষণ পরে হালকা ধূসর রঙের স্যুট পরা এক লোক ভেতরে ঢুকল। আমার নাম জ্ঞানতে চাইল সে। উত্তর দিলাম কোনো রকমে, কিন্তু নিজের কণ্ঠস্বর নিজেই চিনতে পারছিলাম না তখন।

‘হয়,’ বলল লোকটা। ‘হয় নাম্বার ব্যবহার করব আমরা।’

চলে গেল সে। দুই পুলিশ ঢুকে আমাকে তুলে দাঁড় করাল। তারপর প্রায় বয়ে নিয়ে গেল বাইরে, করিডোরে। এবার অবশ্য সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামার বদলে উপরে উঠলাম। বেশ অনেকটা পথ উপরে ওঠার পর কিছু অফিস দেখা গেল, পুলিশরা কাজ করছে ভেতরে বসে। কেউ তাকাল না আমার দিকে। কয়েকটা মোড় ঘুরলাম আমরা। সমুদ্রসৈকতের ছবিসহ

একটা সাইনবোর্ড দেখলাম, মনে আছে। একসারি নামের তালিকা। একটা ঘড়ি দেখলাম, দুটো বিশ বাজে তাতে। তারপর একটা কামরায় ঢুকলাম, দরজায় চক দিয়ে লেখা রয়েছে ছয় সংখ্যাটা। ভেতরে একটা ধাতব টেবিলের ওপাশে বসে আছে সেই স্যুট পরা লোকটা, আমাদের আগেই চলে এসেছে এখানে। তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে সেই পুলিশ অফিসারটা, যে বেহালায় গিয়েছিল প্রথম-ভাঙা নাকের, বদরাগী চেহারার সেই অফিসার। তার পেছনে একটা জানালা। লোকটার পাশে আরেকজন দাঁড়িয়ে আছে, খাটো হাতার শার্ট পরনে। মাথায় টাক, রাগী চেহারা ভিজে আছে ঘামে, ক্লান্তির চিহ্ন স্পষ্ট।

একটা চেয়ারে বসানো হলো আমাকে।

‘রাফায়েল,’ ক্লান্ত চেহারার লোকটা বলল। ‘রাফায়েল ফার্নান্দেজ? তোমাকে কোথায় নিয়ে আসা হয়েছে, জানো?’

মাথা নাড়লাম আমি।

‘তুমি এখন আছো এরমিতা পুলিশ স্টেশনে। কেন আনা হয়েছে তোমাকে, জানো?’

আবারও মাথা নাড়লাম, কথা বলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছু বের হলো না মুখ দিয়ে।

‘যে ব্যাগটা খুজে পেয়েছ তোমরা, ওটা চাই আমাদের,’ বলল পুলিশটা।

নীরবতা নেমে এল। আমার গলা প্রচণ্ড রকমের শুকিয়ে গেছে, বুঝতে পারছি না কথা বলতে গেলে আদৌ স্বর বের হবে কিনা। কিন্তু চেষ্টা করা বন্ধ করলাম না। শেষ পর্যন্ত কোনোমতে বলতে পারলাম, ‘আমি কোনো ব্যাগ পাইনি, স্যার।’ এবারও নিজের কণ্ঠস্বর নিজেই চিনতে পারলাম না।

‘ব্যাগটা যতক্ষণ না দেবে, ততক্ষণ তোমাকে ছাড়ব না আমরা, রাফায়েল।’

‘আমি কোনো ব্যাগ পাইনি, স্যার,’ বললাম আবার। নিজেকে ছোট্ট, ভয়ানক, অসহায় এক শিশু হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করছি প্রাণপনে। ‘সত্যি কথা বলছি, স্যার। কসম।’

আমার সামনে এক কাপ পানি এনে রাখা হলো। সেটা তুলতে গিয়ে উলটে ফেললাম, তারপর কাঁদতে শুরু করলাম আবার। বললাম, টয়লেটে যাব। একজন এসে পানিটুকু মুছে ফেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করল ক্লান্ত চেহারার লোকটা।

‘তোমাকে যেটা করতে হবে,’ বলল সে, ‘তা হলো-আমাদের তোমার বাড়িতে নিয়ে যাবে। ব্যাগটা দেবে। আমরা তোমাকে টাকা দেবো, যেমন বলেছি আগেই। তুমিও খুশি, আমরাও খুশি।’

সাহস সঞ্চয় করে তার দিকে তাকালাম আমি।

‘খোদার কসম করে বলছি, স্যার। আমার মায়ের কসম; আমি কোনো ব্যাগ পাইনি। কিছু টাকা পেয়েছিলাম শুধু। এগারো শ পেসো পেয়েছিলাম, আর কিছু না-’

‘টাকা পেয়েছিলে।’

‘হ্যাঁ, স্যার।’

‘তার মানে, তখন মিথ্যে বলেছিলে তুমি। কিছু একটা সত্যিই পেয়েছিলে।’

‘হ্যাঁ, স্যার। পেয়েছিলাম।’

‘কোথায় পেয়েছিলে? কখন?’

‘চার নাম্বার বেলেটের কাছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে।’ আমি মিথ্যে বলছি, কারণ চাই না যে ওরা জেনে যাক আমি কোথায় ছিলাম তখন। কিন্তু সমস্যাটা হলো, আমার মিথ্যেগুলো আমাকেই বিপদে ফেলে দিতে পারে। ধূসর স্যুট পরা লোকটা সব লিখে নিচ্ছে।

‘কে ছিল তোমার সাথে? কে কে দেখেছে তখন?’

‘কেউ না, স্যার। আমি শুধু-’

‘মিথ্যে কথা,’ বলল পুলিশের লোকটা। কখন, কোন দিক থেকে সে এগিয়ে এসেছে বুঝতে পারিনি আমি-শুধু অনুভব করলাম, একটা প্রচণ্ড আঘাতের সাথে সাথে মাটিতে পড়ে গেছি। চেয়ারটা উলটে পড়ে গেল আরেক পাশে, গাল কেটে গেল আমার। হাতটা শরীরের সিঁচে বেকায়দা ভঙ্গিতে চাপা পড়েছে। দেখলাম, লোকটা আমার সামনে এসে দাঁড়াল। মনে হলো এখনই লাথি মারতে শুরু করবে। চিৎকার করে উঠলাম আমি-‘না! না! না!’ বারবার চিৎকার করতে লাগলাম, সেই সাথে চেষ্টা করতে লাগলাম টেবিলের নিচে ঢুকে পড়ার। কিন্তু লাথি মারল না লোকটা। তার বদলে নিচু হয়ে আমাকে তুলে সোজা করে দাঁড় করাল, তারপর স্যুট পরা লোকটা এবং সে মিলে আমার চুল আর হাত চেপে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিল আবার। আমার চুলগুলো ধরেই রাখল একটা হাত।

‘গার্দোর সাথে ছিলাম,’ চিৎকার করে বলে উঠলাম এবার। মুখের মধ্যে রক্তের স্বাদ টের পাচ্ছি। ‘শুধু আমার বন্ধু গার্দো ছিল সাথে, কিন্তু ওকে

টাকা দিইনি আমি। ও দেখেনি টাকাগুলো। আমি দুঃখিত, আমি দুঃখিত! গার্দো ছিল আমার সাথে, কিছু টাকা পেয়েছিলাম আমি। কিন্তু দিইনি ওকে...' কাঁদতে শুরু করলাম আমি। 'কোনো ব্যাগ খুঁজে পাইনি আমি!'

'আর জুতোটা?' আমার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশটা জিজ্ঞেস করল। আমার চুল ধরে রেখেছে সে। 'জুতোর ব্যাপারে কি বলবে?'

'জুতো-টুতো কিছু পাইনি, মিথ্যে বলছিলাম তখন!' চিৎকার করে উঠলাম আমি। মুখ মুছতে চাইলাম, কিন্তু রক্ত আর ময়লা ছাড়া কিছু লাগল না হাতে। আবারও থাপ্পড় মারা হলো আমাকে, চোখের সামনে তারা জ্বলে উঠতে দেখলাম অনেকগুলো। 'টাকা পেয়েছিলাম শুধু!' বললাম চিৎকার করে। 'আমি চাইনি...' দম আটকে আসছে আমার, হাঁপাচ্ছি, আর ফোঁপাচ্ছি। পুলিশটা আমার উপর ঝুঁকে এল। টেবিলের উপর একটা বিশাল হাত রেখে আরেক হাতে আমার চুল মুচড়ে ধরল সে।

'টাকাটা কিসের মধ্যে ছিল?' বলল স্যুট পরা লোকটা। 'চুল ছেড়ে দাও ওর।'

'কাগজে মোড়ানো ছিল,' বললাম আমি। 'আমার মনে হয়েছিল কোনো বিল হবে।'

'এগারো শ পেসো, বিল দিয়ে মোড়ানো?'

'আমার ধারণা ওটা ইলেকট্রিক বিল ছিল, স্যার। কমলা রঙের কাগজ, ইলেকট্রিক বিলই হবে।' খুব দ্রুত চিন্তা করতে হচ্ছে আমাকে, সেই সাথে জীবন বাঁচানোর জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি।

'পড়তে পারিস তুই?' স্যুট পরা লোকটার সম্বোধন বদলে গেছে। 'এই হারামজাদা পড়তে পারে?'

'হ্যাঁ, পারি স্যার!'

'তাই নাকি? আচ্ছা!' আমার সামনে এসে দাঁড়াল লোকটা, আমার মুখটা উঁচু করে ধরল। তার গা থেকে সিগারেট আর ঘামের গন্ধ পাচ্ছি আমি। 'তোর মতো আবর্জনার পোকাকে পড়তে শেখাল কে? নাম কি তোর?'

'রাফায়েল, স্যার-'

'কে পড়তে শিখিয়েছে তোকে?'

'গার্দো, আর আমার আন্টি।'

'বিলটা কিসের ছিল? ঠিকানা কোথাকার?'

'জানি না, স্যার, দেখিনি।'

‘কত টাকা ছিল?’

‘এগারো শ।’

‘ঠিক এগারো শ? কয়টা নোট?’

‘একটা পাঁচ শ, ছয়টা এক শ।’

‘টাকাগুলো কোথায়?’

‘আন্টিকে দিয়ে দিয়েছি। একটা রেখেছি আমার কাছে।’

‘ব্যাগটার কি হলো?’

‘কোনো ব্যাগ পাইনি, স্যার।’

‘খুন করে ফেলব তোকে, মিথ্যুক কোথাকার!’ গায়ের জোরে আমাকে ধাক্কা দিল সে। পড়ে যাচ্ছিলাম আবার, কিন্তু পেছনে দাঁড়ানো পুলিশটা ধরে ফেলল আমাকে। স্যুট পরা লোকটা আমার গলা টিপে ধরল। দেয়ালের সাথে চেপে ধরেছে আমাকে। নিজের উপর থেকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম এবার, মনে হলো পুরো শরীর অসাড় হয়ে গেছে। প্রচণ্ড ভয়ে বারবার শুধু চিৎকার করতে থাকলাম, ‘আমি কোনো ব্যাগ পাইনি, স্যার!’

‘ওকে নিয়ে যাও এখন থেকে—দূর করো!’

ঘাড় ধরে জানালার দিকে নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে। স্যুট পরা লোকটা খুলে দিল জানালা। এক পায়ের গোড়ালি আর এক হাত ধরে আমাকে উঁচু করল পুলিশটা। দেখলাম, শূন্যে ভেসে খোলা জানালাটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমি। উষ্ণ বাতাস টের পেয়েছিলাম, মনে পড়ছে এখন। মনে পড়ছে, জানালা দিয়ে বাইরে বের করে দেয়া হলো আমাকে, আর আচমকা আমার হাতটা ছেড়ে দিল পুলিশের লোকটা। এখন শুধু এক গোড়ালি ধরে আমাকে ঝুলিয়ে রেখেছে বাইরে। নোংরা দেয়ালটা দেখতে পাচ্ছিলাম, অনেক নিচে একটা পাথুরে মেঝেও চোখে পড়ছিল আমার। ময়লার স্তূপ ছড়িয়ে আছে সেখানে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগলাম আমি। মুখ তুলতে দেখলাম, ওরা সবাই জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

‘ব্যাগটা কোথায়?’ একজন চিৎকার করে উঠল। ‘তুই পেয়েছিস ওটা?’

না বলে চিৎকার করা ছাড়া আর কিছুই করার রইল না আমার। গার্দো আর র‍্যাট আমাকে পরে জিজ্ঞেস করেছিল, কখনও হাল ছেড়ে দেয়ার খুব কাছাকাছি চলে এসেছিলাম কিনা। সত্যি কথাটা হলো, না। অদ্ভুত লাগতে পারে শুনতে, কিন্তু আমার মনের একটা অংশ যেন নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, সত্যিই কোনো ব্যাগ পাইনি আমি। আরেকটা অংশ বারবার মিনতি করছিল

হাল না ছাড়ার জন্য। হয়তো হোসে অ্যাঞ্জেলিকোর কথা ভেবেই, কারণ এখন তার সম্পর্কে অনেক কিছু জানি আমরা। গোড়ালিতে শক্ত হয়ে চেপে বসে থাকা হাতটা যে কোনো মুহূর্তে আলগা হয়ে ছেড়ে দিতে পারে আমাকে, মাটিতে পড়ে থেতলে যাব তখন। মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। লোকটা আমাকে ঝাকাচ্ছে, সব কিছু যেন ঘুরছে আমার চারপাশে। রক্ত, ঘাম, আমার বমি আর দেয়ালটা-সব যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে-কিন্তু তবুও না ছাড়া আর কোনো কথা বের হলো না আমার মুখ থেকে। হয় ওরা আমার কথা বিশ্বাস করবে, নাহয় এখানেই সব শেষ হয়ে যাবে।

হঠাৎ করেই টেনে তোলা হলো আমাকে।

জানালায় কিনারায় লেগে ছড়ে গেল আমার বুকের কাছটা, কিন্তু কিছু টেরই পেলাম না বলতে গেলে। সোজা করে দাঁড় করানো হলো আমাকে, থাপ্পড় মারা হলো। তারপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সবাই।

হাঁটু ভেঙে পড়ে গেলাম আমি। বাধা দিল না কেউ।

কোনো একজনের পা চেপে ধরলাম আমি, ধরেই রইলাম-মাথা চেপে ধরলাম সেখানে। হাঁটু গেঁড়ে বসে বললাম, ‘আমার মরা মায়ের কসম, কোনো ব্যাগ পাইনি আমি। সত্যি কথা বলছি আমি, স্যার, দয়া করে মারবেন না আমাকে। আপনাদের সাহায্য করতে পারব না আমি, সত্যি কথা বলছি।’

এই শক্তি কোথা থেকে পেলাম আমি? হোসে অ্যাঞ্জেলিকোর কারণে।

‘আমি দুঃখিত,’ বললাম আবার। জীবনের জন্য লড়াই করতে হচ্ছে আমাকে, এটা আমি খুব ভালো করেই জানি। ‘আমি যে টাকা পেয়েছি সেটা আপনাদের বলা উচিত ছিল। কিন্তু তাহলে আমার বন্ধুকেও ভাগ দিতে হতো। তা চাইনি বলেই আপনাদের মিথ্যে বলেছিলাম আমাকে মারবেন না, প্লিজ।’

‘কোন বেস্তের নিচে ছিলি তুই?’ বলল পুলিশটা।

‘চার নাম্বার, স্যার। সত্যি বলছি।’

‘টাকাটা যে বিল দিয়ে মোড়ানো ছিল সেটা কোথায়?’

‘কাগজ রাখার বস্তায় ভরে ফেলেছিলাম। টাকাটা রেখেছিলাম আমার পকেটে।’

‘রাফায়েল, আমার কথা শোন।’

সুট পরা লোকটা কথা বলছে এবার। আমার পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসল

সে। অবশ্য তখন প্রচণ্ড ব্যথায় দপদপ করছে আমার মাথা, তাই সঠিক মনে করতে পারছি না আসলে কি হয়েছিল।

‘তোর পরিবারের জন্য সকল আয়ের উৎস হচ্ছিল তুই, তাই না?’

মাথা ঝাঁকালাম আমি, কিন্তু সোজা হতে পারলাম না। ‘হ্যাঁ, স্যার।’

‘যদি তোর কিছু হয়ে যায়, তোর পরিবার অনেক সমস্যায় পড়ে যাবে। তোর আন্টি কি করবে তখন?’

‘জানি না, স্যার।’

‘দুটো ছোট ছোট কাজিন আছে তোর-ওদের কি হবে? আমার কথা বুঝতে পারছিস?’

‘হ্যাঁ, স্যার-আমি জানি না। আমি কোনো ব্যাগ পাইনি স্যার, দয়া করে বিশ্বাস করুন আমার কথা।’

‘তোকে ওই জানালা দিয়ে ফেলে দিতে পারি আমরা। অথবা পেছনের দরজা দিয়ে নিয়ে গিয়েও কাজটা সারতে পারি। এখনই মেরে ফেলতে পারি তোকে-একটা বিশেষ জায়গা আছে আমাদের, জানিস? তোর মতো শয়তানদের জন্য। ওখানে কেউ তোর চিৎকার শুনতে আসবে না। যদি দরকার হয়, তাহলে তোর শরীরের প্রত্যেকটা হাড়ি গুঁড়ো করে দেবো আমরা।’ আমার হাতটা ধরে উঁচু করল সে। ‘প্রথমে ভাঙব এই হাড়টা। বুঝতে পারছিস আমার কথা?’

মাথা ঝাঁকালাম আমি, কাপছি থরথর করে। হাতটা মুচড়ে উপরে ঠেলে ধরা হয়েছে, আর আমি বসে আছি হাঁটু গেঁড়ে-অপেক্ষা করছি হাড় ভাঙার শব্দটা শোনার জন্য। তীব্র ব্যথায় মনে হচ্ছে অজ্ঞান হয়ে যাব। হ্যাঁ হয়ে আছে মুখ, কিন্তু কোনো শব্দ করতে পারছি না।

‘তোকে ময়লার ভাগাড়ে ফেলে আসতে পারি আমরা কেউ দেখতেও আসবে না। কেউ খুঁজবে না তোকে, বুঝতে পারছিস? কষ্টাবন্দি হয়ে পড়ে থাকবি।’

মাথা ঝাঁকালাম আবার। কথা বলতে পারছি না।

‘তাই শেষবারের মতো একবার জিজ্ঞেস করছি...’ বলে আমাকে হ্যাঁচকা টানে তুলে ধরে জানালার দিকে নিয়ে গেল সে। টের পেলাম, কেউ একজন আমার গোড়ালি চেপে ধরেছে। এখন শুধু একটা জোরালো টান দিলেই উলটে পড়ে যাব আমি। নিচে অপেক্ষমান মাটির দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। ‘যে ব্যাগটা পেয়েছিস সেটা কোথায়?’

মুখ তুলে তাকানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু হাতটা এখনও মুচড়ে আছে,

ফলে বাঁকা হয়ে গেছে আমার পিঠ। কথা বলতে চাইলাম, কিন্তু পারলাম না। প্রাণপন চেষ্টায় উচ্চারণ করলাম, ‘আমার মরা মায়ের কসম, স্যার...’

চোঁচিয়ে উঠল লোকটা, ‘জোরে বল! শুনতে পাচ্ছি না!’

আরও সামনে ঠেলে দেয়া হলো আমাকে। সাহায্যের জন্য চিৎকার করে উঠলাম, ‘সত্যি বলছি! সত্যি বলছি! আমি কোনো ব্যাগ পাইনি। যদি পেতাম, যদি কিছু জানতাম তাহলে এতক্ষণে বলে দিতাম আপনাদের। দিয়ে দিতাম ওটা। সত্যি বলছি...দয়া করে কথা শুনুন আমার...’ নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে আমার, তবুও দারুণ কষ্টে বললাম, ‘আপনাদের নিয়ে যেতাম আমার বাড়িতে, দিয়ে দিতাম ব্যাগটা। কিন্তু কিভাবে দেবো, স্যার? আমি তো পাইনি ওটা!’

কাঁদতে শুরু করলাম আমি, কারণ বুঝতে পারছি যে এটাই আমার শেষ সুযোগ। টের পেলাম, ঢিল হয়ে এল গোড়ালির উপর চেপে থাকা হাতগুলো। তারপর-কিছুক্ষণ নীরবতা শেষে-আমাকে টেনে আনা হলো ঘরের ভেতর। মেঝের উপর পড়ে গেলাম সাথে সাথে।

মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম, নিচু গলায় কথা বলছে লোকগুলো। কাঁপছি আমি থরথর করে, নড়তে পারছি না মোটেও। আরও কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর একজন আমার দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াতে বলল।

‘প্যান্টে পায়খানা করে ফেলেছিস, তাই না?’ বলল সে।

মাথা ঝাঁকালাম আমি। কোনোমতে দেয়াল খামচে ধরে সোজা করলাম নিজেকে।

মাথা নাড়ল লোকটা। ‘আবজ্ঞানা আর পায়খানার গন্ধ বের হচ্ছে তোর গা থেকে,’ বলে মুখ ঘুরিয়ে নিল সে। ‘সময় নষ্ট করছি আমরা,’ বলল সে। ‘তুই একটা আবজ্ঞানা আর পায়খানার দলা ছাড়া আর কিছুই মস, ছোকরা। তুই কি, বল তো?’

‘মাফ করবেন, স্যার। আমি আবজ্ঞানা, স্যার,’ ফিসফিস করে বললাম আমি।

‘এগারো শ পেসোর জন্য এভাবে আমাদের সময় নষ্ট করালি তুই। কত বড় শয়তান!’

কোনোমতে তার চোখে চোখ রাখলাম আমি। মনে হলো, এখনই একটা থাপ্পড় মেরে বসবে।

‘তোর বেঁচে থাকার কোনো কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না।’ অন্য লোকগুলোর দিকে তাকাল সে। ‘এইসব আবজ্ঞানাগুলো বংশবৃদ্ধি করে

কেন, বলতে পারো? অ্যাই, হাতগুলো পেছনে নিয়ে আয়।’

তাই করলাম আমি, মার খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি।

আরও বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল লোকটা। বুঝতে পারছি যে লম্বা সময় ধরে ঘুমায়নি সে-ভয় এবং ক্লান্তি চেপে ধরেছে তাকে। মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলাম আমি, কারণ বুঝতে পারছি, লোকটা আমাকে মনে মনে ওজন করছে, বুঝতে চাইছে যে আমাকে দিয়ে কোনো কাজ হবে কিনা। আমি কি সত্যিই আবর্জনা, নাকি মূল্যবান কিছু? এখানে রেখে আরও পেটানো হবে আমাকে, নাকি ছেড়ে দেয়াই উচিত হবে? ওরা যদি গার্দোকেও ধরে আনে? যদি আমার আন্টিকেও নিয়ে আসে? যদি আমাদের তিনজনের মুখ থেকে তিনটে আলাদা আলাদা গল্প শুনতে পায়?

দম বন্ধ করে রইলাম আমি।

শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিল লোকটা। আমার পেছনে দাঁড়ানো পুলিশের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘বাইরে ফেলে দিয়ে এসো একে। সময় নষ্ট করছি আমরা।’

একটা হাত আমার ঘাড় চেপে ধরল। দরজা দিয়ে বের করে নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামানো হলো। সেখান থেকে আরেক গার্ড আমাকে একটা প্যাসেজ এবং আরও কিছু সিঁড়ি পার করিয়ে দিল। কয়েক মিনিট পর রাস্তায় নেমে এলাম আমি। আবিষ্কার করলাম, মাতালের মতো টলমল পায়ে দৌড়াচ্ছি, আমার পা যেন আমার কথা শুনতে চাইছে না। কিন্তু তবু তো দৌড়াচ্ছি! দীর্ঘ, ফাঁকা রাস্তা ধরে দৌড়ে চললাম আমি। শেষ পর্যন্ত মুক্ত হয়েছি আমি। বেচারী হোসে অ্যাঞ্জেলিকোর ভাগ্য বরণ করতে হয়নি আমাকে-বেঁচে আছি এখনও।

শক্তি ফিরে পেতে লাগল আমার পাগুলো। তখন বুঝতে পারলাম, প্রয়োজন হলে সারা জীবন এভাবে দৌড়াতে পারব।

বৃষ্টি শুরু হলো। শীত শীত লাগছে।

দৌড়েই চলেছি আমি। কোথায় আছি, কোথায় যাচ্ছি—কিছুই জানি না, জানতেও চাই না—শুধু মনে হচ্ছে এভাবেই অনন্তকাল দৌড়ে যেতে পারব। রাস্তা ধরে দৌড়ে চলেছি, শুধু সামনের আলোগুলো লক্ষ্য করে। কোনো টাকা নেই আমার কাছে, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। পৃথিবীটা মনে হচ্ছে বিশাল বড়, আর বৃষ্টির পানি কি অদ্ভুত রকমের ঠাণ্ডা। পরে মনে পড়েছিল, আমি ভাবছিলাম, এই গরমের মৌসুমে বৃষ্টি হচ্ছে কেন? এত ঠাণ্ডা কেন পানি? আকাশটা কত উঁচুতে। সময় যেন ধীর হয়ে গিয়েছিল আমার কাছে, কিন্তু তিন ঘণ্টার বেশি তো হওয়ার কথা নয়। দৌড়াতে দৌড়াতে ক্রমেই উপলব্ধি করতে পারছিলাম যে পুলিশগুলো কত অসহায় হয়ে পড়েছে। আমি ছাড়া আর কোনো সূত্রই ছিল না ওদের হাতে। আরও একবার পরিস্কার হলো, যে জিনিসগুলো আমরা খুঁজে পেয়েছি সেগুলো কত গুরুত্বপূর্ণ। নিজের সৌভাগ্যের কথা ভাবলাম একবার, বুঝতে পারলাম মরণের খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম।

ওই হাতটা তখন খুলে যেতে পারত, নিচে ফেলে দিতে পারত আমাকে। ছুঁড়ে ফেলতে পারত। এই মুহূর্তে একটা পাখুরে রাস্তার উপর ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে পারতাম আমি।

চোখ বন্ধ করে ফেললাম আমি, দু-হাত দু-দিকে ছড়িয়ে দিয়ে দৌড়ে চললাম যত দ্রুত পারি।

আমার আন্টি বলেছিল, ‘রাফায়েল কি যেন পেয়েছে’ এবং এই কথাটাই ছিল ওদের কাছে একমাত্র সূত্র। শুধু ওই শব্দগুলোর কারণেই আমাদের মহান্নার প্রতিটা বাড়ি তল্লাশী করেছে ওরা, আমাকে ধরে এনেছে। তবে এখন আমি মুক্ত।

শেষ পর্যন্ত এক সময় দৌড়ের গতি কমিয়ে আনলাম। হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার শেষ মাথায় আসতে একটা পরিচিত জিনিস চোখে পড়ল অবশেষে।

নাম জানি না, তবে ওটা দেখে বুঝতে পারলাম শহরের অফিস আদালতের অংশে চলে এসেছি। জিনিসটা হচ্ছে এক সৈন্যের মূর্তি, বেশ উঁচুতে অবস্থিত। এক হাতে খোলা তলোয়ার, যেন যুদ্ধে যাচ্ছে। এর আগেও মূর্তিটার পাশ দিয়ে গেছি আমি। চিৎকারের ভঙ্গিতে হাঁ হয়ে আছে মূর্তির মুখ, যেন উৎসাহ দিচ্ছে সহযোদ্ধাদের। সরাসরি মূর্তির সামনে চলে গেলাম আমি, বললাম, ‘ওরা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। হার মানিনি আমি।’

এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না, মুক্তি পেয়েছি আমি। কিন্তু মূর্তিটা কোনো কথা বলল না, নিঃশব্দ চিৎকারে হাঁ হয়েই রইল তার মুখটা।

বৃষ্টির ঝাপটা আরও বাড়ল হঠাৎ, সেই সাথে এক ঝলক বাতাস-যেমনটা টের পেয়েছিলাম আবর্জনার পাহাড়ে। টাইফুনের বাতাস, যদিও এখন টাইফুনের সময় নয়। সৈন্যের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম, আমি কি তাহলে আবর্জনা? তারপরেই হেসে ফেললাম, কারণ একটা কথা মনে পড়ে গেছে। সেই আবর্জনার দলাটাই অতগুলো চলাক চতুর পুলিশকে বোকা বানিয়ে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। ছোট্ট একটা ময়লাকুড়ানো ছেলে, থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে শুধু বলে যাচ্ছিল ‘ব্যাগটা নেই আমার কাছে,’ অথচ পুরো সময়টা জুড়েই তার জানা ছিল ওটার অবস্থান, আর ভেতরে কি আছে। ট্রেনে চড়ে স্টেশনে গিয়ে লকারটাও খুলেছি আমরা। চিঠিটা রয়েছে আমাদের কাছে-অবশ্য এটা ঠিক যে চিঠির লেখাগুলোর অর্থ এখনও বের করতে পারিনি আমরা। কিন্তু মানতেই হবে, ময়লাকুড়ানো ছেলেগুলো ওই পুলিশদের চাইতে এক ধাপ এগিয়ে আছে। আর ওদের কাছে একটা অক্ষরও প্রকাশ করিনি আমি।

আবার হাঁটতে শুরু করলাম।

বেহালায় পৌছাতে দুই কি তিন ঘন্টা সময় লাগল, আর হাঁটতে ভালই লাগল আমার। রাস্তা চেনা আছে ভালভাবেই। এক বুড়ো, আর দুটো বাচ্চাকে দেখলাম রাস্তায় ঠেলাগাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাতের বেলা ময়লা ঘাঁটতে বের হয় এরা। লোকটার কাছে একটা সিগারেট চাইলাম। অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকাল সে। ভুলেই গিয়েছিলাম, রক্ত লেগে আছে আমার চেহারায়ে।

একটা ছোট্ট সিগারেট দিল সে আমাকে, দুজনে মিলে ভাগ করে টানলাম সেটা। ছেলেমেয়ে দুটো অবাক চোখে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। আমার গায়ে বেশ দুর্গন্ধ, তবে তা নিয়ে কারও কোনো মাথাব্যথা আছে বলে

মনে হলো না। মেয়েটার বয়স হবে পাঁচের মতো, আর অন্যটা-ছেলেও হতে পারে, মেয়েও হতে পারে-সাত বছরের মতো। দ্বিতীয়জন ঠেলাগাড়ির উপর থেকে একটা পানির বোতল এনে দিল আমাকে। কিছুটা পানি দিয়ে নাক মুখ ধুয়ে নিলাম আমি। তারপর ওদের কাছে বিদায় নিয়ে দৌড়াতে শুরু করলাম আবার।

আরও একটা ব্যাপার বলে রাখি এই ফাঁকে।

ওই কম্পিউটার থেকে আমরা হোসের সম্পর্কে তথ্যগুলো জানতে পেরেছিলাম-যার ব্যাগটা হারিয়ে গেছে। হোসে অ্যাঞ্জেলিকো আর জীবিত নেই। ঈশ্বর তার আত্মাকে শান্তি দিন। খবরেও এসেছিল তার নামটা। গার্দো বলেছিল, 'লোকটা যদি খুনি হয়?' কিন্তু পরে জানা গেল যে লোকটাকে আসলে খুন করা হয়েছে।

কোথায় মারা গেছে সে, আন্দাজ করুন তো?

একটা পুলিশ স্টেশনে। খবরের কাগজে লিখেছে, পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় মারা গেছে সে। আমাকে যে স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেখানেই? প্রশ্ন জাগল আমার মনে। একই কামরায়?

তাকেও কি ফেলে দেয়া হয়েছিল জানালা দিয়ে? ইচ্ছে করে, নাকি ভুলবশত?

একটা ছোট পার্কের পাশ দিয়ে যেতে যেতে মোড় নিয়ে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। ঘাসের উপর বসে রইলাম কিছুক্ষণের জন্য। হালকা, ঠাণ্ডা বৃষ্টি পড়ছে এখনও। সম্ভবত তখনও ধাক্কা পুরোপুরি সামলে উঠতে পারিনি, তাই ওভাবেই বসে রইলাম, বসে বসে ভাবলাম বেচারী হোসে অ্যাঞ্জেলিকোর কথা।

বড়, অনেক বড় একটা অপরাধের সন্দেহে তাকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ-সব কাগজে এসেছিল খবরটা। কম্পিউটার থেকে আমরা গিয়েছিলাম খবরের কাগজগুলো পড়তে। ময়লার মধ্যে একটা বড় অংশ জুড়েই থাকে পুরনো খবরের কাগজ। সঠিক কাগজগুলো খুঁজে বের করতে বেশি সময় লাগেনি। তিনটে বুড়ো মানুষের মতো দ্বিগুণে ঘিরে বসেছিলাম আমরা, র‍্যাটকে আমি পড়ে শোনাচ্ছিলাম খবরগুলো। শুনতে শুনতে মাথা ঝাঁকানো ও। চুরির দায়ে হোসে অ্যাঞ্জেলিকোকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ।

ষাট লক্ষ ডলার।

আমরা কিছুক্ষণ কল্পনা করার চেষ্টা করেছিলাম, এমনকি এক হাজার ডলার দেখতে কেমন হতে পারে। অংকটাকে পেসোতে রূপান্তরিত করতে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই মাথাব্যথায় আক্রান্ত হয়েছিল গার্দো। হেসে ফেলেছিলাম আমরা, ভাবছিলাম যে এতগুলো ডলার পকেটে নিয়ে হাঁটতে কেমন লাগতে পারে। কিন্তু তারপরেই থেমে গিয়েছিল আমাদের হাসি।

হোসে অ্যাঞ্জেলিকো মারা গিয়েছিল একটা পুলিশ স্টেশনে। সে জন্যেই মিথ্যে কথাটা বারবার বলছিলাম আমি, এমনকি যখন আমাকে জানালা দিয়ে বাইরে ঝুলিয়ে ধরা হলো তখনও-হোসে অ্যাঞ্জেলিকো আর তার গম্ভীর চেহারার ছোট্ট মেয়েটার কথা চিন্তা করে। হোসে অ্যাঞ্জেলিকো হয়তো এখনও আমার সাথেই আছে, কারণ আমি জানি যে মৃত মানুষরা ফিরে আসে।

তার বিরুদ্ধে একজন সরকারী লোকের কাছ থেকে চুরি করার অভিযোগ আনা হয়েছিল। লোকটা আর কেউ নয়, ভাইস প্রেসিডেন্ট। তার কাছ থেকে ষাট লক্ষ ডলার চুরি করেছিল সে। হয়তো এখনও কোথাও রয়েছে টাকাটা। নিশ্চয়ই পুলিশ তাকে ধরে ফেলার আগেই ব্যাগটা আবর্জনার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। পুলিশ নিশ্চয়ই পরে তার কাছ থেকে কথাটা জেনে নেয়, আর হানা দেয় আমাদের ওখানে।

একটা খবরের কাগজে হোসে অ্যাঞ্জেলিকো সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য জানা গেল। সে ছিল একজন এতিম, আর তাকে দত্তক নিয়েছিল দান্তে জেরোম ওলোন্দ্রিজ নামের একজন লোক, যার বাবার নাম গ্যাব্রিয়েল ওলোন্দ্রিজ। এই নামটাই চিঠিতে পেয়েছি আমরা-গ্যাব্রিয়েল ওলোন্দ্রিজ, এখন যে রয়েছে কোলভা জেলখানায়। হোসে অ্যাঞ্জেলিকো নাকি ভাইস প্রেসিডেন্টের হাউসবয়, বা গৃহপরিচারক হিসেবে কাজ করেছে প্রায় আঠারো বছর। জানা গেছে, হোসে অ্যাঞ্জেলিকোর পরিবারে শুধু আট বছরের একটা মেয়ে বাদে আর কেউ নেই। সে জন্যই সে গ্যাব্রিয়েল ওলোন্দ্রিজের কাছে চিঠি লিখেছিল।

বৃষ্টির মাঝে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বসে রইলাম আমি, কারণ এখন আমার জানা হয়ে গেছে যে কোলভা জেলখানায় যেতে হবে আমাদের, সঠিক লোকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে চিঠিটা।

আমার নাম গ্রেস, আর আমার কাছ থেকে শুধু একটা কথাই জানতে পারবেন আপনারা।

ফাদার হলিয়ার্ড আমাকে বলেছিলেন হোসে অ্যাঞ্জেলিকো কেমন মানুষ ছিল সেটা বলার জন্য, কারণ আমি তার সাথেই কাজ করতাম। ভাইস প্রেসিডেন্ট সিনেটর জাপান্টা'র বাড়ির একজন পরিচারিকা আমি, যার কাছ থেকে টাকাটা চুরি হয়েছে। আমি বলব যে হোসে ছিল একজন দয়ালু, ভদ্র, বিশ্বাসী এবং সৎ মানুষ। কথা বলত খুব আস্তে আস্তে। সিগারেট খেত না। সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে শুধু একটু ব্র্যান্ডি পান করত, তবে বেশি নয় কখনই। ওর সাথে আমার পরিচয় হওয়ার আগেই ওর স্ত্রী মারা যায়। মেয়ের স্কুলের খরচ যোগানোর জন্য চাকরি করত হোসে। ওর মেয়ের নাম পিয়া দান্তে, কিন্তু বাবার সাথে থাকত না সে। হোসে ছিল একজন গৃহপরিচারক, অর্থাৎ সিনেটরের বাড়িতেই থাকতে হতো ওকে। আর ওর মেয়ের স্কুলটা ছিল এখান থেকে অনেক দূরে। স্কুলের কাছে একটা পরিবারের সাথে মেয়ের থাকার ব্যবস্থা করেছিল হোসে। সপ্তাহে একবার দেখা হতো দুজনের। হোসের একটা ছেলেও ছিল, কিন্তু খুব অল্প বয়সে মারা যায় সে।

আর কি বলার আছে আমি জানি না।

খবরটা যখন গুনলাম তখন খুব মন খারাপ হয়েছিল আমার। অন্য সবার মতো আমিও বলেছিলাম যে এটা অসম্ভব। হোসে অ্যাঞ্জেলিকো একজন অত্যন্ত বিশ্বাসী মানুষ, আর ওকে কখনই খুব একটা সাহসী বলে মনে হয়নি। পুলিশ ওকে নিয়ে যাওয়ার পরেই মৃত্যু তাড়াতাড়ি পারি ওর মেয়েকে আনতে গিয়েছিলাম আমি, কিন্তু সেখানে গিয়ে গুনলাম যে মেয়েটা ওখানে নেই। ওদের কাছে জানতে চাইলাম কোথায় গেছে, কখন

গেছে-সোজা কথায় ওকে খুঁজে বের করার সব রকম চেষ্টাই করলাম। কিন্তু যে পরিবারের কাছে ছিল মেয়েটা, তাদের কাছ থেকে খুব বেশি সাহায্য পাওয়া গেল না। ছোট্ট মেয়েটার কি হয়েছে আমি জানি না। রাস্তায় হাজারে হাজারে এমন ছেলেমেয়ে ঘুরে বেড়ায়, সবাই জানে।

হোসে অ্যাঞ্জেলিকো যাই করুক না কেন, সে একজন ভালো মানুষ ছিল। আর তাকে কখনও ভুলব না আমি।

অধ্যায় ১

আমার নাম অলিভিয়া ওয়েস্টন, আমি বেহালার মিশন স্কুলে একজন খণ্ডকালীন হাউস-মাদার। এই গল্পে আমারও একটা ভূমিকা আছে। ফাদার হলিয়ার্ড এবং ছেলেরা আমাকে অনুরোধ করেছে সব কিছু গুছিয়ে লিখে দেয়ার জন্য, তাই আমি সেটাই করছি।

আমার বয়স বাইশ। ইউনিভার্সিটি শেষ করে পৃথিবী দেখার জন্য কিছুটা সময় কাজে লাগাচ্ছি। এই শহরে এসেছিলাম অল্প কিছু দিন থাকার জন্য। ভেবেছিলাম জেটল্যাগ কেটে গেলেই আবার বন্ধুদের সাথে চলে যাব সাঁতার আর সার্কিঙের জন্য।

কিন্তু বেহালার ময়লার পাহাড় দেখার পর আমার সিদ্ধান্ত বদলে যায়।

সাঁতার আর সার্কিং করতে যাইনি তা নয়—ছুটি কাটিয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু এক সপ্তাহ পরই সেই আনন্দ ফিকে হতে শুরু করল। কেমন যেন অস্থির লাগত নিজেকে, অর্থহীন মনে হতো সব কিছু। বেহালা আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল, কিছুতেই সরাতে পারছিলাম না মন থেকে। সেখানে গিয়েছিলাম আমার বাবা মায়ের দেয়া কিছু টাকা পৌছে দিতে। তাদের এক বন্ধু কাজ করত ওখানে। আমার বাবা ফরেন অফিসে কাজ করে, সে পেনের ভাড়া (সাথে কিছু অতিরিক্ত টাকা) দিয়ে দিয়েছিল। ভেবেছিল, এই ভ্রমণ থেকে শিক্ষামূলক কিছু পাব আমি। পৌছানোর কয়েক দিন পরেই ফাদার হলিয়ার্ড আমাকে প্রস্তাব দিলেন বাচ্চাগুলোকে পড়ানোর। তারপর আবার জড়িয়ে গেলাম একটা স্বাস্থ্যকর পানিবিষয়ক প্রজেক্টে। বাচ্চাগুলো প্রায়ই বিভিন্নভাবে আহত হয়, এক সময় আবিষ্কার করলাম ওদের জন্য ফার্স্ট এইড নিয়ে কাজ করছি। তারপরেই পেয়ে গেলাম ‘খণ্ডকালীন হাউস-মাদার’ পদের কাজটা—স্বাভাবিক অর্থ হলো, আমার সময়মতো দিনের বেলার শিফটগুলোতে আমি সাহায্য করব ওদের।

প্রেমে পড়ে গেলাম আমি।

প্রেমে পড়ে গেলাম আমার দিকে তাকিয়ে থাকা চোখগুলোর, ওদের হাসির। আমার মনে হয় সেবামূলক কাজগুলো হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে

লোভনীয় কাজগুলোর একটা, আর আগে কখনও এসব কাজ করা হয়নি আমার। জীবনে প্রথমবার আমার চারপাশে এমন সব মানুষকে আবিষ্কার করলাম, যারা সাক্ষি দেয়, আমি কোনো একটা পরিবর্তন আনতে পেরেছি। বেহালার শিশুরা সুন্দর, সারা দিন তাদের ময়লার ভাগাড়ে কাজ করতে দেখলে যে কারও মন ভেঙে যেতে বাধ্য। যদি কখনও এই দেশে আসেন তাহলে অন্য সব ট্যুরিস্টদের মতোই ঘুরে বেড়াবেন, অসুবিধে নেই। কিন্তু বেহালাতেও আসবেন একবার, দেখে যাবেন পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে জমে থাকা আবর্জনার স্তূপ, আর তার উপর ঘুরে বেড়ানো ছেলেমেয়েদের। আপনার জীবন বদলে যাবে তারপর থেকে।

জুনকে চিনতাম আমি-যে ছেলেটাকে সবাই র‍্যাট বলে ডাকে। জুন অবশ্য আমাকে অলিভিয়া বলে ডাকে না, ওর কাছে আমি বরাবরই ‘সিস্টার’ ছিলাম, তারপর হলাম ‘মাদার’। আমার মনটা খুব বেশি নরম-এমনকি ইংল্যান্ডে ফেলে আসা একটা কুড়িয়ে পাওয়া বেড়ালছানার জন্যেও কেঁদেছি অনেকবার। দুই দিনের মধ্যে আমাকে ভালোবাসার বাঁধনে জড়িয়ে ফেলেছিল ছোট জুন। ওকে প্রায়ই টুকটাক খাবার এবং টাকাপয়সা দিতাম আমি। এমন একটা ছেলে কিভাবে বাঁচবে তা না হলে?

স্কুলে একটা বিশ্রামের জায়গা আছে, ওরা খুব বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়লে ওখানে গিয়ে বিশ্রাম নিতে পারে। একটা ছোট ফ্রিজও আছে ওখানে, হাউস-মাদাররা ওটাকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করে। জুন প্রায়ই আসত আমার কাছে, সব কিছু গুছিয়ে রাখতে সাহায্য করত। আমারও ওকে নানা জিনিস দেয়ার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। তাই যখন একদিন দুই বন্ধুকে নিয়ে এল ও, তখন বেশ অবাক হয়েছিলাম আমি। যদিও তখনও বুঝতে পারিনি কিসের মধ্যে জড়াতে যাচ্ছি।

ওরা এসে বলল আমার সাথে একটু কথা বলতে চায়। আমি ভেবেছিলাম হয়তো গতরাতের ঘটনা নিয়েই কথা বলবে। ফাদার জুলিয়াড তখন বিশ্রাম নিচ্ছেন, তাই তাকে জাগাতে চাইনি। সারা রাত ধরেই প্রায় জেগে ছিলেন তিনি, বোঝার চেষ্টা করছিলেন রাফায়েলকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশের কাছ থেকে বলতে গেলে কোনো সাহায্যই পাওয়া যায়নি-অত্যন্ত দুশ্চিন্তার ভেতরে ছিলেন তিনি। তারপর অবশ্য নিজে থেকেই বেহালায় ফিরে এসেছিল ছেলেটা, সুখোদয়ের সময় হয়ে গিয়েছিল তখন। আমি ছিলাম না সে সময়, তবে শুনেছি সবই-আর দেখেছিলাম, কি

নিষ্ঠুরভাবে মারধোর করা হয়েছে ওকে। ওর আন্টি জড়িয়ে ধরে রেখেছিল ওকে, ছাড়তে চাইছিল না কিছুতেই। আশপাশের সবাই এসে জড়ো হয়েছিল ওকে দেখতে। ফাদার হ্লিয়ার্ড বলেছেন, এখানকার মানুষ নাকি এমনই। কেউ একজন আঘাত পেলে সবাই সেই কষ্টটা অনুভব করে।

আমার দিকে তাকিয়ে লাজুক ভঙ্গিতে হাসল ছেলেটা, কপাল থেকে চুল সরিয়ে দিল। চেহারার ক্ষতগুলো বীভৎসভাবে স্পষ্ট হয়ে আছে। কিছুতেই বুঝতে পারলাম না, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ কিভাবে একটা বাচ্চা ছেলের গায়ে এভাবে হাত তুলতে পারে। আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বন্ধুর পেছনে সরে গেল ছেলেটা। গার্দো-টাক মাথার ছেলেটা ওর কাঁধে হাত রেখে আমার দিকে তাকাল।

জুন বলল, ‘আমরা এখন জানি না কি করব, মাদার। বড় একটা সমস্যায় পড়ে গেছি। গার্দোকে তো চেনেন আপনি, তাই না?’

বসল গার্দো, মাথা নিচু করে আছে। দেখে বুঝতে পারছিলাম যে ভালো পোশাক পরে আসার সাধ্যমত চেষ্টা করেছে সে। হাত পা পরিস্কার, গায়ের টিশার্টটাতেও ময়লা নেই। হাসার চেষ্টা করল, কিন্তু চিন্তিত ভাবটা দূর হলো না চেহারা থেকে। প্রথমে আমার মনে হলো হয়তো টাকা চাইতে এসেছে। মনে মনে প্রত্যাখ্যান করার প্রস্তুতি নিতে লাগলাম। ফাদার হ্লিয়ার্ডের একটা নিয়ম হলো, উপহার হিসেবে কখনও টাকা দেয়া যাবে না। দশ বা বিশ পেসো খুচরো হলে সেটা আলাদা ব্যাপার, ওটা সবাই দেয়। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল আরও বড় অংকের টাকা চেয়ে বসবে গার্দো। তাই একটু অবাক হলাম, লজ্জাও পেলাম, যখন সে বলল-‘আমার দাদু জেলখানায় রয়েছেন, ম্যাম। আমি তার সাথে দেখা করতে চাই।’

বললাম, ‘আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কোন জেলখানায় আছেন তিনি?’

নামটা আমাকে বলল গার্দো। তবে এই শহরের জেলখানাগুলো সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা নেই আমার, তাই তেমন কোন লাভ হলো না। প্রশ্নটা কেন করলাম ভেবে লজ্জা পেলাম নিজের কাছে।

‘জেলে গেছেন কেন তিনি?’ জানতে চাইলাম আমি।

চোখ সরিয়ে নিল গার্দো। আহত ছেলেটা-রাফায়েল-ওর কাঁধে হাত রেখে নিজেদের ভাষায় কিছু একটা বলল। বুঝতে পারলাম, নিজের অজান্তেই একটা স্পর্শকাতর জায়গায় হাত দিয়ে ফেলেছি। কিন্তু এখন আর পিছিয়ে আসার উপায় নেই। তাছাড়া, প্রশ্নটা যৌক্তিকও বটে।

‘ওরা বলে, দাদু নাকি কাকে ধরে পিটিয়েছিল,’ মৃদু স্বরে বলল জুন। ‘কিন্তু কথাটা সত্যি নয়। দুর্নীতির কারণেই জেলে গেছে গার্দোর দাদু। কয়েকটা লোক তার বাড়িটা দখল করতে চেয়েছিল।’

দেখলাম, কাঁদতে শুরু করেছে গার্দো। চোখ মুছল ও, তারপর বলল, ‘দাদুকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে চেয়েছিল ওরা! পুলিশকে টাকা দিয়ে অভিযোগ লিখিয়েছে, তারপর পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে দাদুকে। এখন তার বাড়িটা ওদের হাতে চলে গেছে।’

আবার চোখ মুছল ও। রাফায়েল শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রাখল ওকে, কিছু একটা বলল আবারও। সম্ভবত সান্ত্বনা দিল।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘গার্দোর সাথে তার দেখা হওয়া খুব দরকার, সিস্টার।’ ঠোট ফুলে আছে ছেলেটার, কথাগুলো জড়ানো শোনাল। ‘আপনি কি আমাদের জেলখানায় পৌছাতে সাহায্য করতে পারবেন?’

এক ঢোক পানি খেলাম আমি। গ্লাসটা আবার ভরে দিল জুন।

এখন বুঝতে পারছি, আমার প্রাথমিক সন্দেহটাই ঠিক ছিল। টাকা লাগবে ওদের, বাসভাড়া অথবা ঘুমের জন্য। তাই আরও একবার অবাক হলাম, যখন গার্দো বলল, ‘আপনি আমাদের সাথে গেলে সবচেয়ে ভালো হয়, সিস্টার। প্লিজ?’

‘আমি?’

তিনজনই একসাথে মাথা ঝাঁকাল।

‘তোমার দাদুর সাথে দেখা করতে যাওয়ার সময় আমাকে সাথে থাকতে বলছ?’ প্রশ্ন করলাম আমি।

মাথা ঝাঁকাল গার্দো।

‘কিভাবে?’ বললাম আমি, পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে গেছি। ‘আমাকে কেন যেতে হবে?’

‘দাদুর কাছে কিছু তথ্য পৌছে দিতে হবে আমাদের,’ বলল গার্দো। ‘পুলিশ তার সম্পর্কে প্রশ্ন করছিল—এ জন্যেই আমার বন্ধুকে ধরে মেরেছে ওরা। এর পরের বার হয়তো আমাকে ধরে নিয়ে যাবে।’

‘আমি বুঝতে পারছি না।’

‘পরিস্থিতিটা আসলে বেশ জটিল, মাদার,’ বলল জুন। এর আগে কখনও এত গম্ভীর সুরে কথা বলতে দেখিনি ওকে। ‘বুড়ো লোকটার জানা

দরকার যে এখানে কি হচ্ছে। আমাদেরও কিছু তথ্য দরকার তার কাছ থেকে, যাতে তাকে সাহায্য করতে পারি। না হলে বাড়িটা একেবারেই হারাতে হবে তাকে।’

‘কিন্তু, তোমাদের পরিবারের কেউ...তোমার মা?’

মাথা নাড়ল গার্দো। ‘আমার মা নেই।’

‘তোমার দাদুর ছেলেমেয়েরা?’ প্রশ্ন করলাম আমি। ‘তাছাড়া, কয়েদিদের সাথে দেখা করার তো নির্দিষ্ট সময় থাকে...তোমরা একা গেলেও তো অসুবিধে হওয়ার কথা নয়? আমি আসলে বুঝতে পারছি না তোমাদের কিভাবে সাহায্য করতে পারব, এটাই হলো সমস্যা।’

গার্দো বলল, ‘আপনি বুঝতে পারছেন না।’

‘আসলেই বুঝতে পারছি না আমি।’

‘এখানকার কারাগারগুলোতে,’ বলল জুন। ‘মাসে কেবল একদিন দেখা করার সুযোগ পাওয়া যায় কয়েদিদের সাথে। মাদার, ওরা ওদের বাড়িটা হারিয়ে ফেলবে-ওটা ছাড়া ওদের আর কিছুই নেই। বাড়ি হারালে পথে বসতে হবে। আর আপনি...আপনি তো একজন সমাজকর্মী...’

গার্দো বলল, ‘আপনি আপনার পাসপোর্টটা নিয়ে যাবেন, আপনার নাম সই করবেন। ওরা আপনাকে ভেতরে যেতে দিতে আপত্তি করবে না।’

চুপ করে রইলাম আমি। শেষ পর্যন্ত বোঝা গেল সমস্যাটা কোথায়।

ছেলেটা কিছু একটা বলল, কিন্তু শুনতে পেলাম না আমি। দুই হাতে মাথা ঢেকে বসে রইল গার্দো। জুন ওর হাতটা আমার হাতে রেখে বলল, ‘আপনার কাছে সাহায্য চাইছি, কারণ কাজটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর আপনি ছাড়া কেউ পারবে না আমাদের সাহায্য করতে।’

‘আপনিই একমাত্র বিদেশি যাকে আমরা চিনি,’ বলল রাফায়েল। ‘আর এখানকার কারাগারগুলো...ওরা সব নিজেদের ইচ্ছায় ধরে।’

‘ওদের বলবেন যে আপনি একজন সমাজকর্মী,’ বলল জুন। ‘বলবেন, শুধু আধঘন্টার জন্য দেখা করতে চান আপনি। আপনাকে হয়তো অপেক্ষা করিয়ে রাখবে ওরা, বা প্রথমে না বলবে। কিন্তু যদি আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন তাহলে শেষ পর্যন্ত একটা সুযোগ পাওয়া যেতেও পারে, তাই না?’

আমার দিকে তাকাল গার্দো। দেখলাম, অশ্রু টলমল করছে ওর চোখে।

জুন বলল, ‘আপনার মতো দয়ালু আর ভালো মনের মাদার আর

কখনও আসেনি আমাদের এখানে। ও আপনার কাছে সাহায্য চাইছে শুধু একটা কারণে—কাজটা করতে না পারলে বাড়িটা হারাতে হতে পারে ওদের।’

‘ওরা মেরেছে আমাকে,’ বলল রাফায়েল। ‘ওদের ধারণা আমার কাছে কিছু দলিল আছে। কিন্তু ওসব কিছুই নেই আমার কাছে।’

‘যাবেন না, মাদার?’

তাই শেষ পর্যন্ত নিজেকে আবিষ্কার করলাম কোলভার পথে, একটা ট্যাক্সিতে।

অহংকার এবং বোকামি ছাড়া আর কোনো কারণ ছিল না আমার। আর ছিল আরেকটা কারণ—তিনটে কিশোর ছেলে একের পর এক মিথ্যে বলে এক মুহূর্তে আমার মন ভেঙে দিয়েছিল, পর মুহূর্তে আবার আশার আলো দেখাচ্ছিল। শুধু গার্দোকে আমার সাথে নিলাম আমি। প্রথমেই বড় একটা দোকানে থেমে ওর জন্য কিছু কাপড় কিনলাম। পরিস্কার হয়েই এসেছিল ও, আগেই বলেছি। কিন্তু ওর পরনের কাপড়গুলো ছিল বহু পুরনো, যে ময়লা কখনই ওঠানো সম্ভব নয়।

ওকে নিয়ে ছেলেদের কাপড় রাখার অংশে ঢোকান সময় সবাই আমার দিকে যে দৃষ্টিতে তাকাল, কখনও ভুলব না তার কথা। সেই সাথে আরেকটা জিনিসও মনে রাখব—কাপড় বাছাই করতে অনেক বেশি সময় নিল গার্দো। ট্যাক্সিটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছিলাম, ভেবেছিলাম পাঁচ আর শার্ট কিনতে হবে—পাঁচ মিনিটের ব্যাপার। কিন্তু তেমনটা বাস্তবে ঘটল না। গার্দোর মতো খুঁতখুঁতে, সতর্ক ক্রেতা আর দেখিনি আমি। জিনস কিনতে চাইল প্রথমে, সবচেয়ে দামিটা। যে কাপড়টা খুব সম্ভবত এই শহরেই প্রায় পানির দামে তৈরি হয়েছে তার জন্য পশ্চিমা বিশ্বের সমান দাম দিতে কিছুতেই সায় দিল না আমার মন, তাই ওকে বুঝিয়ে গুনিয়ে রাজি করলাম আরও সস্তা কিছু কেনার জন্য। এবার একটা ঢোলা বাল্কেটবল টিশার্ট কিনতে চাইল ও, কিন্তু আমরা যে ধরনের কাজে যাচ্ছি তার সাথে এমন কাপড় সম্পূর্ণ বেমানান। তাই ওকে ফর্মাল শার্টের র‍্যাকের দিকে নিয়ে গেলাম, আর প্রতিটা কাপড় দেখে নাক সিটকান গার্দো। ইতোমধ্যে আমার

অস্বস্তি লাগতে শুরু করেছে, তাই শেষ পর্যন্ত আবারও আলোচনায় বসলাম ওর সাথে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো যে টিশার্টই কেনা হবে। গার্দো বলল, কাপড়টা যেন ওর সাইজের চাইতে বেশ একটু বড় হয়। তারপর কিনলাম একটা ফর্মাল শার্ট, টিশার্টের উপর পরার জন্য।

সবগুলো কাপড় পরে দেখল গার্দো, তারপর আমরা এগিয়ে গেলাম দাম মেটানোর কাউন্টারের দিকে। কিন্তু যাওয়ার পথে আবার জুতো রাখার জায়গাটায় চোখ পড়ে গেল ওর, আর টেনারগুলো চোখে পড়তে থমকে দাঁড়াল। দাম দেখে আবারও কপালে উঠল আমার চোখ। কিন্তু স্বীকার করতে বাধ্য হলাম যে সুন্দর জামাকাপড় পরা একটা ছেলের পাগুলো যদি হয় খালি, আর নোংরা, তাহলে তা মোটেই ভালো দেখাবে না।

মোটামুটি দামের একজোড়া জুতো কেনা হলো ওর জন্য। পুরো দামটা আমার ক্রেডিট কার্ড থেকেই দিলাম। পুরস্কার হিসেবে যা পেলাম তা হলো-আমার সারা জীবনে কখনও এত খুশি হতে দেখিনি একটা ছেলেকে, আর স্বীকার করছি-এত সুদর্শনও লাগেনি কখনও কাউকে। চেঞ্জিং রুম থেকে বেরিয়ে এল সম্পূর্ণ আলাদা একজন-বেহালার ময়লার স্তুপে কাজ করে যারা, তাদের সাথে কোনো মিলই নেই। আগের চাইতে লম্বা লাগছিল ওকে, ফেটে পড়ছিল আত্মবিশ্বাসে। এমনকি হাঁটার ভঙ্গিও যেন বদলে গেছে ওর। ওর গালে একটা চুমো খেয়ে বসা থেকে কিছুতেই বিরত রাখতে পারলাম না নিজে, দেখে হাসিতে ফেটে পড়ল দোকানের কর্মচারিরা।

ট্যান্সিতে ফিরে এলাম আমরা। মিটার দেখে ঢোক গিললাম একটা, তারপর আবার চলতে শুরু করল গাড়ি।

ফাদার হুলিয়ার্ড বলছি।

এখানে বলে রাখা ভাল, অলিভিয়া যা করেছে তা যদি আমি আগে থেকে জানতাম, তাহলে অবশ্যই ওকে বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করতাম। গল্পটা যে মিথ্যে, তা ধরে ফেলতে পারতাম আমি। কিন্তু সমস্যাটা হলো, এই ধরনের ব্যাপারগুলো আগে থেকে আন্দাজ করা যায় না, আর বেহালায় ছয় বছর কাটানোর পর অন্তত একটা শিক্ষা পেয়েছি আমি—এখানকার ছেলেমেয়েদের কারও কারও মিথ্যে বলার ক্ষমতা ঈর্ষণীয়। হয়তো বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তাই ওদের এভাবে গড়ে তুলেছে। বলতে খুব খারাপ লাগছে আমার...কিন্তু, বিশ্বাস। নিজেকে কখনও এমন পরিস্থিতিতে পড়তে দেবেন না যেখানে আপনার বিশ্বাস নিয়ে কেউ খেলা করতে পারে।

তবে আমার দোষটা সবচেয়ে বেশি। অলিভিয়াকে যখন ওরা বোকা বানাচ্ছে, সেই একই মুহূর্তেও আমার জন্য আলাদা পরিকল্পনা এঁটে রেখেছিল ওরা।

রাফায়েল এবং গার্দো বুদ্ধিমান, সন্দেহ নেই। কিন্তু ছোট্ট জুন...র্যাট। ও যা করেছিল, তাতে বজ্রাহত হওয়ার অবস্থা হয়েছিল আমার।

পরিস্থিতি সত্যিই অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠতে যাচ্ছিল।

অলিভিয়া বলছি। হ্যাঁ, আমি জানি। বোকামি করেছি আমি।

ট্যাক্সিটা আমাকে শহরের এমন এক জায়গায় নিয়ে গেল যেটা আমার দেখা যে কোনো জায়গার চাইতে নোংরা, আর দরিদ্র। আপনার কাছে হয়তো কথাটা অদ্ভুত মনে হবে, কারণ কথাটা বলছে এমন একজন যে বেহালায় কাজ করে অভ্যস্ত। কিন্তু কথাটা সত্যি। বেহালা এক বিশাল, দানবীয়, নোংরা, এলোমেলো ময়লার ভাগাড়। মানুষ এখানে বাস করা দূরে থাক, কাজ করতে পারে বলেও বিশ্বাস করা যায় না। আবর্জনা, আর কুঁড়েঘর ছাড়া আর কিছু নেই। বীভৎস অবস্থা চারপাশে, বিশেষ করে ওই দুর্গন্ধের কথা আমার সারা জীবন মনে থাকবে।

বেহালায় গেলে আপনার চোখে পানিও চলে আসতে পারে, কারণ পুরো ব্যাপারটা যেন এক ভয়াবহ, অনন্তকাল ধরে চলমান শাস্তির অংশ। যদি আপনার কল্পনাশক্তি বলে কিছু থাকে তাহলে খুব সহজেই একটা শিশুর সমস্ত জীবন চোখের সামনে দেখতে পাবেন আপনি। একজন বৃদ্ধ মানুষ, কুঁড়েঘরের বাইরে একটা ভাঙাচোরা চেয়ারে বসে থাকা ছাড়া যার আর কোনো কাজ নেই—তাকে দেখে আপনার মাথায় চিন্তা আসবে, রাফায়েলের অবস্থাও চল্লিশ বছর পরে এমনই হবে। কী এমন বদলাবে এর মধ্যে? এই শিশুদের ভাগ্যে লেখা হয়ে গেছে, সারা দিন তাদের ময়লার ভাগাড়ে নিঃশ্বাস নিতে হবে, আর ঘাঁটতে হবে সমস্ত শহরের আবর্জনা। হুঁদুর আর শিশু, শিশু আর হুঁদুর—কখনও কখনও মনে হয় এদের জীবনধারায় খুব বেশি পার্থক্য নেই।

তবে কোলভা আবার এসব থেকে অন্য দিক দিয়ে আলাদা।

ভাঙাচোরা রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম আমরা। ফুটপাথগুলো ভেঙে পড়েছে, মনে হচ্ছে যেন কিছু দিন আগেই ভূমিকম্প হয়েছিল এখানে। নিচু এপার্টমেন্ট বিন্ডিংগুলো দাঁড়িয়ে আছে দুই পাশে, তাদের ঘিরে রেখেছে ওয়াশিং এবং ইলেকট্রিসিটি কেবল। সব জায়গায় মানুষ আর মানুষ,

বেশিরভাগই অলস বসে আছে—যেন কোনো কাজ নেই তাদের, কখনও ছিল না। ট্যাক্সির এয়ারকন্ডিশন কাজ করছিল না, ফলে ভেতরটা ক্রমেই গরম হয়ে উঠছিল। গরমের সময় এখন, তবে লোকজন বলাবলি করছে, সাগরে নাকি একটা টাইফুন তৈরি হচ্ছে। বাতাস তাই প্রচণ্ড গরম।

মোড় নিলাম আমরা, আর ডান পাশে একটা উঁচু কংক্রিটের দেয়াল চোখে পড়ল। গার্দো বলল, ‘জেলখানা,’ আঙুল তাক করে দেখিয়েও দিল। কিন্তু তার কোনো প্রয়োজন ছিল না। দেয়ালের উপর রয়েছে কাঁটাতারের কুণ্ডলি, কোনো কোনো জায়গায় ছুটে এসে ঝুলছে পাশ দিয়ে। প্রতি পঞ্চাশ কদম পরপর গার্ড টাওয়ার দেখা যাচ্ছে, ছাদ বলে কিছু নেই। আবারও ডানে মোড় নিয়ে পরবর্তী দেয়ালটা ধরে এগিয়ে চললাম আমরা। বাম পাশে দেখা যায় বাঁশ আর খড় দিয়ে তৈরি কুঁড়েঘরের সারি, আর আরও অনেক মানুষ—বেশিরভাগই শিশু। ছোট ছোট শিশুদের সবার আগে চোখে পড়ল আমার, পাথর আর লাঠি দিয়ে খেলছে। পরে জেনেছি, জেলখানার কয়েদিদের আত্মীয়স্বজনদের অনেকেই ওই ঘরগুলোতে থাকে। ভেতরে খাবার পাঠায় তারা, না হলে তাদের বন্দি স্বজনরা না খেয়ে মারা যাবে।

প্রবেশপথের সামনে এসে দাঁড়াল ট্যাক্সি। ভাড়া মিটিয়ে দিলাম আমি, তারপর এগিয়ে গেলাম গার্ডহাউসের দিকে। বড় কংক্রিটের একটা বক্স বলা যায় ওটাকে, এক পাশে একটা জানালা। ভেতরে কয়েকজন গার্ড বসে আছে। তার সামনেই লাল আর সাদা রঙের একটা ব্যারিয়ার, অর্থাৎ কোনো গাড়ি এর বেশি এগোতে পারবে না। মেশিনগানসহ একটা লোককেও দেখা গেল। পাসপোর্ট দেখালাম আমি, তারপর মনে মনে গুছিয়ে রাখা কথাগুলো বললাম ওদের।

একটা ফোন করল গার্ডরা। খেয়াল করলাম, আমার হাত ধরে রেখেছে গার্দো। আমি নিজেও বেশ ভয় পাচ্ছিলাম। মিনিট দুয়েক অপেক্ষার পরেই আরেকজন অফিসারকে এসে দাঁড়াতে দেখা গেল জানালায়। আমার কথাগুলো আবার শুনতে চাইল সে। গল্পটা দ্বিতীয়বার বললাম আমি। এবার তৃতীয় আরেকজন এসে হাজির হলো, আর আমার পাসপোর্টটা নিয়ে ভেতরে চলে গেল। একটা রেজিস্টারে সাক্ষর করতে বলা হলো আমাকে, তারপর দেয়া হলো একটা ভিজিটর ব্যাজ। গার্দোও পেল একটা। তারপর ব্যারিয়ারের পাশ ঘুরে একটা ফাঁকা জায়গায় নিয়ে আসা হলো আমাদের।

জেলখানায় ঢুকতে বেশ ভয় ভয় লাগাই স্বাভাবিক, কারণ কেবলই মনে

হয়, যদি কোথাও কোনো ভুল হয়ে যায়, ওরা যদি আমাকে আর বের হতে না দেয়? সেই সাথে সেই সীমারেখাটার কথাও ভাবছিলাম, যেটা স্বাধীনতা এবং বন্দিত্বকে আলাদা করে রাখে। কোন দরজা হবে সেটা?

একটা অফিসের পাশ দিয়ে বড় ওয়েটিং রুমের মতো একটা জায়গায় নিয়ে আসা হলো আমাদের। চারপাশে পাতা রয়েছে অনেকগুলো বেঞ্চ, সেখানে গিয়ে বসলাম আমরা। কয়েক সেকেন্ড পরেই অবশ্য আরেক গার্ড এসে আমাদের ওয়েটিং রুম থেকে বের করে নিয়ে গেল। লম্বা একটা করিডোর ধরে এগোতে শুরু করলাম আমরা। করিডোরের শেষ মাথায় লোহার বার দিয়ে তৈরি একটা দরজা। সেটা খুলে দেয়া হলো আমাদের জন্য, ভেতরে ঢুকলাম আমরা। ধাতব, আতঙ্কজনক শব্দ তুলে আমাদের পেছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। আরও ছোট একটা ওয়েটিং রুম রয়েছে এপাশে। সেখানে বসতে বলা হলো আমাদের। প্রায় এক ঘন্টা অপেক্ষা করতে হলো এখানে।

অধৈর্য হয়ে এই দেশে কোনো লাভ হয় না-এটা আমি খুব তাড়াতাড়িই শিখে গেছি। তার চাইতে ভালো বরং অপেক্ষা করা, মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখা, আর মাথা ঝাঁকানো। গার্দো প্রায় কোনো কথাই বলছে না। ওর ঠোঁট নড়ছে, দেখতে পাচ্ছি আমি, যেন প্রার্থনা করছে বিড়বিড় করে।

তারপর, হঠাৎ করেই আমাকে জিজ্ঞেস করল, ‘কারও “স্মরণে” কথাটা দিয়ে কি বোঝানো হয়?’

বললাম, ‘সাধারণত কেউ যখন মারা যায়, তখন তার উদ্দেশ্যে এই কথাটা বলা হয়। এর অর্থ হলো : তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে।’ জানতে চাইলাম, কেন জানতে চাইল এই কথা।

আমার দিকে তাকিয়ে হাসল ও। বলল, ‘ভিডিও গেম।’ তারপর আবার বিড়বিড় করতে শুরু করল। ওর প্রার্থনাটা সম্ভবত অনেক বড়।

এক সময় ধীরে ধীরে খুলে গেল দরজাটা। হাতাকাটা শার্ট পরা এক লোক এসে ঢুকল ভেতরে। মুখে উষ্ণ হাসি ফুটিয়ে রেখেছে সে, বলল তার নাম মি. অলিভা। আমি বললাম যে আমার নাম হচ্ছে অলিভিয়া। সাথে সাথে যেন অনেকটা সহজ হয়ে এল পরিবেশ। লোকটা আমাকে আশ্বস্ত করল যে, যদি সম্ভব হয়, তাহলে মি. অলিভা মিস অলিভিয়াকে যে কোনো উপায় সাহায্য করবে। আমার পাসপোর্টের একটা ফটোকপি রয়েছে তার হাতে। আমার উল্টো দিকে বসল সে।

মৃদু স্বরে কথা বলল লোকটা, বারবার ক্ষমা চাইল আমাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখার জন্য।

‘আমি এখানকার সোশাল ওয়েলফেয়ার অফিসার,’ বলল সে। ‘এই মুহূর্তে গভর্নর কিছু সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত আছেন, তা না হলে তিনি নিজেই আসতেন আপনার সাথে দেখা করতে—এ ধরনের অনুরোধগুলো আমরা সব সময়ই রাখার চেষ্টা করি। যে কয়েদির সাথে আপনারা দেখা করতে চাইছেন, তার সাথে এমন অনেকেই দেখা করতে আসে। আপনারা কয়েদির সিরিয়াল নাম্বারটা আমাদের দিয়েছেন, কিন্তু নাম্বারটা সঠিক নয়। আপনারা কি নিশ্চিত যে মি. ওলোন্দ্রিজের সাথেই দেখা করতে চান?’

‘আমার তো তাই ধারণা,’ জবাব দিলাম আমি।

‘হ্যাঁ, স্যার,’ বলল গার্দো। ‘গ্যাব্রিয়েল ওলোন্দ্রিজ।’

‘আগেই বলেছি, লোকটার সাথে অনেকেই দেখা করতে আসে। আর সে-ও তাদের সাথে দেখা করতে পারলে খুশি হয়। সে যে খুব অসুস্থ, এটা কি আপনারা জানেন?’

গার্দো মাথা ঝাঁকাল আমার দিকে তাকিয়ে। আমি বললাম, ‘হ্যাঁ।’

কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করল।

‘আমাদের এখানে আসার পেছনে এটাও একটা কারণ,’ বললাম আমি।

‘সেটা ঠিক আছে,’ বলল মি. অলিভা। ‘তবে কিছু আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হবে তার আগে। এসব ব্যাপারে যদি আগে থেকে জানা যায় তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হয়, বুঝতেই পারছেন। আপনারা কি আগামী সপ্তাহে আসতে পারবেন?’

মাথা নাড়লাম আমি। ‘দুঃখিত, সেটা সম্ভব নয়।’ বুঝতে পারছি যে আমার পাশে উসখুস করতে শুরু করেছে গার্দো। বুঝতে পারছে যে আমরা সফলতার খুব কাছাকাছি চলে এসেছি। ‘আসলে, আমি নিজেও ভীষণ লজ্জিত। এ আমার বন্ধু, গার্দো। গতকালই মাত্র সমস্যাগুলোর কথা আমাকে বলেছে ও, বলেছে দেখা করাটা নাকি ভীষণ জরুরি। আপনি যে আমাদের সাথে দেখা করেছেন এটাও অনেক বেশি আমাদের জন্য।’

মি. অলিভা হাসল। ‘আপনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল, আর শিক্ষিত—বুঝতে পারছি আমি। আপনি তো একজন সমাজকর্মী, তাই না? বেহালায় থাকেন?’

‘হ্যাঁ, তবে অবৈতনিক। কাজটা আমি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় করি।’

হাত বাড়িয়ে আমার সাথে হাত মেলান মি. অলিভা। ‘খন্যবাদ,’ হেসে বলল সে। ‘আপনাদের মতো মানুষরা যদি সাহায্য করতে এগিয়ে না আসতেন, তাহলে আমাদের অবস্থা আরও খারাপ থাকত। এই শহরে অনেক সমস্যা আছে। সমস্যা অবশ্য সব শহরেই থাকে—কিন্তু আমাদের সমস্যাগুলো অনেক বেশি। আপনি তাহলে এই ছেলেটার দেখাশোনা করছেন?’

আমি বললাম, ‘গতকাল খুব মন খারাপ ছিল ওর। সব কিছু আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু ও আমাকে বলছিল, আমি ওকে সাহায্য করতে পারব।’

‘ও কি ভালো ছেলে?’

‘হ্যাঁ।’

‘নিয়মিত স্কুলে যায়?’

‘যতটা গেলে আমি খুশি হতাম তার চাইতে কমই যায়,’ বললাম আমি। হেসে উঠল মি. অলিভা।

গার্দোর সাথে কয়েকটা কথা বলল সে, তার কাঁধ চাপড়ে দিল। ‘যে মানুষটার সাথে আপনারা দেখা করতে এসেছেন, সে যে এখন হাসপাতালে তা জানেন?’

‘তার সম্পর্কে খুব বেশি জানা নেই আমার,’ বললাম আমি, ‘শুধু গার্দোর কাছ থেকেই শুনেছি যা কিছু।’

‘শরীর বেশি ভালো নয় তার। হয়তো আপনার মন খারাপ হবে। তাছাড়া, অতিথিদের দেখা করার জায়গাটার অবস্থাও খুব বেশি দুর্বিধের না। আগে কখনও কোনো জেলখানায় গিয়েছেন?’

মাথা নাড়লাম।

হাসল মি. অলিভা। ‘আমাদের সরকার অনেক রকম সমস্যায় জর্জরিত। কারাগারের তহবিল প্রায়ই খালি থাকে—এক শ বছর আগে আপনার নিজের দেশেও হয়তো এমন অবস্থা ছিল। যা দেখছেন, তাতে নিশ্চয়ই মন খারাপ হয়েছে আমার। আচ্ছা, মি. ওলোন্ড্রিজের সাথে দেখা করার সময় শুধু যদি ছেলেটা থাকে, তাহলে কি সমস্যা হবে?’

‘আমার মনে হয়, ওর সাথে আমারও থাকা উচিত,’ জবাব দিলাম আমি।

কেন জানি না, কিন্তু আবার ভয় লাগতে শুরু করেছে আমার। কিন্তু এত দূর এসে, শুধু এই ওয়েটিং রুমে বসে থেকেই আবার ফিরে যাব? এই

বছরটা তো আমি পৃথিবী দেখতে বের হয়েছি। আমার মনে হচ্ছে, বেহালার দুনিয়াটা দেখার পর, আর একটা জেলখানার ভেতরে ঢোকার পর হয়তো অনেক বেশি কিছু শিখতে পারব আমি, যা ইউনিভার্সিটি আমাকে শেখাতে পারেনি।

মি. অলিভা বলল, ‘সমস্যাটা হলো ফি নিয়ে। এ ধরনের সাক্ষাতের ব্যবস্থাকে একটু “দ্রুত” করতে গেলে ফি দরকার হয়। ওরা আপনাকে ভেতরে ঢোকার সময় কিছু বলেনি?’

‘না,’ বললাম আমি।

‘লজ্জা পাচ্ছিল মনে হয়,’ জবাব দিল সে। ‘প্রশ্নটা আসলে নিরাপত্তার ক্লিয়ারেন্স পাওয়ার। দ্রুত পেতে হলে কাউকে পাঠাতে হবে অনুমোদন আনার জন্য। অবশ্য, আপনি যদি অপেক্ষা করেন তাহলে বিনা পয়সাতেই কাজ হয়ে যাবে।’ নিষ্পাপ মুখ করে বলল মি. অলিভা, ‘আপনাদের কি সত্যিই এখনই দেখা করতে হবে?’

মাথা ঝাঁকালাম আমি।

‘একটু সময় দিন আমাকে, চেক করতে হবে,’ বলল সে। ‘তবে যত দূর মনে আছে, পরিমাণটা হলো দশ হাজার। আর গভর্নর যেহেতু অত্যন্ত ব্যস্ত এখন, তাই রশিদ বোধহয় মিলবে না-’

‘রশিদের দরকার নেই,’ বললাম আমি। স্বীকার করছি, মেজাজ খারাপ হতে শুরু করেছে আমার। আজ অনেকগুলো টাকা বের হয়ে গেল পকেট থেকে। ‘তবে আমার কাছে এই মুহূর্তে এত টাকা আছে কিনা ঠিক বলতে পারছি না।’

অন্য দিকে তাকিয়ে রইল গার্দো।

‘ফর্ম আর চেকবই নিয়ে আসছি আমি,’ বলল মি. অলিভা। ‘আপনাকে সাহায্য করতে চাই আমি, কিন্তু...ফি আসলে আমি নির্ধারণ করি না, সরকার করে,’ বলে আবার হাসল সে। ‘আমাদের সরকার নিশ্চয়ই অনেক ধনী!’

দশ মিনিট পর আবার ফিরে এল সে। হাতে একটা ফর্ম নিয়েছে। ‘আপনার একটা ছবিও তুলতে হবে,’ বলল সে। ‘আর আমি ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম, ফি-এর পরিমাণ দশ হাজার।’

আমার কাছে সব মিলিয়ে ছিল আর এগারো হাজার। ওই দিন সকালেই ব্যাংকে গিয়ে অতিরিক্ত টাকা তুলেছিলাম কিছু স্বার্থে রাতের বেলা বেশ দামি একটা রেস্টুরেন্টে বন্ধুদের সাথে ডিনার যাওয়ার কথা ছিল। আধ ঘন্টার মধ্যেই আমার জন্য একটা সিকিউরিটি পাস তৈরি হয়ে গেল, আমার

ছবি এবং বেশ কিছু সাক্ষরসহ। আবার আমার সাথে হাত মেলান মি. অলিভা।

চলে যাওয়ার আগে জোরালো গলায় কাকে যেন ডাক দিল সে। সাথে সাথে চার গার্ড উদয় হলো দরজায়। একজন গার্দোকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলল। আমার দিকে তাকাল গার্দো। ‘চলুন।’

ওদের বুট জুতোর খটখট আওয়াজ এখনও মনে আছে আমার।

আরেকটা কামরায় নিয়ে আসা হলো আমাদের, বেশ কিছু লকার রয়েছে সেখানে। সাথে যা কিছু আছে সব বের করে ওই লকারে রাখতে বলা হলো, জুতো খুলে ঝাঁকিয়ে দেখাতে হলো যে ভেতরে কিছু নেই। সব কিছু ভেতরে রেখে লকারের দরজা বন্ধ করে দিল গার্ডরা। তারপর আরেকটা করিডোর ধরে এগিয়ে চললাম আবার। দূর থেকে চেষ্টামেটির আওয়াজ ভেসে আসছে—বুঝতে পারছি, সেই সীমারেখাটা আর বেশি দূরে নেই। লাফাতে শুরু করেছে আমার হৃৎপিণ্ড। সত্যিই তাই। কিছুক্ষণ পরেই একটা লম্বা হলঘরে এসে ঢুকলাম আমরা। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত লোহার গরাদ দিয়ে আলাদা করা হয়েছে। হইচইয়ের শব্দ এখানে আরও বেশি, যেন কোনো বাজারের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। হলঘরের মাঝখানে একটা দরজার দিকে এগিয়ে গেল গার্ডরা। দরজাটা খোলার সময় লোহার সাথে লোহার বাড়ি খাওয়ার আওয়াজটা যেন খুব বেশি বাড়ি মারল আমার কানে। দরজাগুলো অনবরত খুলছে, বন্ধ হচ্ছে। তালায় চাবি ঢোকানোর ককর্শ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। হঠাৎ করেই একটা অদ্ভুত জায়গায় যেন এসে পড়লাম আমরা—ডিকম্প্রেশন চেম্বারের মতো, যার এক প্রান্তের দরজা বন্ধ না করলে অপর প্রান্তের দরজাটা খোলা যায় না। হইচইয়ের মধ্যে মিশে আছে জান্তব হাসির শব্দ, ভয়ংকরভাবে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সেই সাথে গরমটাও বাড়ছে আরও, যেন কেউ নিঃশ্বাস ফেলছে আমাদের উপর। চিৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছে গার্ডরা, সবার ব্যস্ততা যেন বেড়ে গেছে হঠাৎ করেই। শেষ দরজাটা খুলে গেল এবার, ওপাশে যাওয়ার জন্য ইশারা করা হলো আমাদের।

‘স্বাগতম!’ দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা গার্ড বলে উঠল আমাদের উদ্দেশ্যে।

আমার দিকে তাকিয়ে হাসল সে। সত্যিকারের একটা হাসি, যেটা এই দোজখের জন্য একেবারেই বেমানান।

ভেবেছিলাম সেল দেখতে পারব সারি সারি। কিন্তু যা দেখলাম তাকে খাঁচা বললেই সঙ্গত হয়।

বাম এবং ডান-দুই পাশেই রয়েছে খাঁচাগুলো। সাধারণ পুরনো আমলের চিড়িয়াখানাগুলোতে বাঘ সিংহ রাখা হতো এসব খাঁচায়। একজন খাটো মানুষ কোনো রকমে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে, এতটুকু উঁচু-চার মিটারের মতো লম্বা, দুই মিটার চওড়া। উপরে তাকিয়ে দেখলাম, একটার উপর আরেকটা-এভাবে তিন সারি খাঁচা রয়েছে দুই পাশেই, উপরে ওঠার জন্য রয়েছে মইয়ের ব্যবস্থা। দীর্ঘ সারি চলে গেছে অনেক দূর, মাঝখানে আবার কিছু দূর পরপর সরু পথও আছে। ভেতরটা প্রচণ্ড গরম। গলির মধ্য দিয়ে এগোতে এগোতে বুঝতে পারলাম ওগুলো আসলে আরও অনেক খাঁচার কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা। অনেকটা গুদামের মতো, কিন্তু এখানে মালপত্রের বদলে রয়েছে মানুষ।

খাঁচাগুলোর মধ্য দিয়ে এগোতে এগোতে টের পেলাম, আমার দিকে তাকিয়ে আছে অনেকগুলো চোখ। ডানে, বামে, উপরে এবং নিচে-সর্বত্র রয়েছে তারা।

চারপাশের হট্টগোলে এখন কান পাতা দায়-সবাই যেন চিৎকার করে চলেছে। গার্দো ওর হাতটা আমার হাতে রাখল আবার। কিছুটা স্বস্তি পেলাম এবার।

‘হ্যালো, ম্যাম!’ বারবার চিৎকার করে ডাকছে সবাই আমাকে। উল্লসিত চিৎকার, বন্ধুত্বপূর্ণও বটে, সেই সাথে মিশে আছে হাসির শব্দ। গরাদেব ফাঁক দিয়ে বের হয়ে এসেছে হাতগুলো। কোনো কোনো মুখ গম্ভীর, কেউ আবার হাস্যোজ্জ্বল। ‘কিছু দিন, ম্যাম! ম্যাম! কেমন আছেন? কেমন আছেন?’

ডানপাশে তাকাতে হঠাৎ বরফের মতো জমে গেলাম আমি।

একটা ছেলেকে দেখতে পাচ্ছি গরাদেবের ওপাশে, কোনোমতেই আটের

বেশি হবে না বয়স। পরনে শুধু হাফপ্যান্ট। আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। কোলের উপর আরও ছোট একটা ছেলে, ঘুমাচ্ছে।

‘না,’ আমার মুখ দিয়ে শুধু এই একটা কথাই বের হলো। ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি, নড়তে পারছি না।

আস্তে করে আমাকে সামনের দিকে ঠেলা দিল গার্দো। কিন্তু আট বছর বয়সী ছেলেটা হঠাৎ উত্তেজিত গলায় ডাকতে শুরু করল আমাকে। উঠে দাঁড়িয়ে সামনে এগিয়ে এল সে, দুই হাতে গরাদ চেপে ধরে ডাকতে লাগল, ‘হ্যালো, ম্যাম! হ্যালো ম্যাম-বিশ পেসো, ম্যাম।’

নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা সম্পূর্ণ চক্রর দিলাম আমি। ঘরটার মাঝখানে রয়েছে এখন, এই অবস্থায় এমন চক্রর দিলে নিজের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা হারিয়ে ফেলা স্বাভাবিক, কারণ খাঁচাগুলো সব দেখতে একই রকম। বড় বড় অক্ষরে সংখ্যা লেখা রয়েছে অবশ্য, কিন্তু ওগুলোর কোনো অর্থ নেই আমার কাছে। দিক ভুলে গেলাম হঠাৎ করেই-চার পাশে শুধু মুখ আর হাত ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ, আর শিশু। তরুণ, যুবক, বৃদ্ধ, আর আবারও শিশুর মুখ-রোগা শরীর, ঘামে ভিজে চকচক করছে। প্রায় সবার পরনেই শুধু হাফপ্যান্ট ছাড়া কিছু নেই। পচে যাওয়া খাবার, ঘাম, আর প্রস্রাবের গন্ধে ভারি হয়ে আছে বাতাস।

যে গার্ড আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সে লক্ষ্য করেছে যে আমরা থেমে গেছি। এখন সে নিজেও থমকে দাঁড়িয়েছে, অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। চারপাশ থেকে প্রশ্ন ছুটে আসছে আমার দিকে। ‘কোথায় যাচ্ছেন? কোথায় যাচ্ছেন, সিস্টার?’

‘আপনার নাম কি?’

‘কোন দেশ?’

‘আমেরিকান? আমেরিকান? কেমন আছেন?’

‘আই লাভ ইউ! আই লাভ ইউ!’

আমাদের দিকে এগিয়ে এল গার্ড। আমাদের হাত ধরে রেখেছে গার্দো, সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। চুল্লীর মতো গরম হয়ে আছে ভেতরটা, দুর্গন্ধও যেন বেড়েছে আগের চাইতে। বুঝতে পারছি যে সামনে না এগোলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাব। সাথে একটা পানির বোতল আছে আমার, কপাল ভাল-লম্বা কয়েক টোক পানি খেলাম তা থেকে। চিৎকার করে পানি চাইতে শুরু করল লোকগুলো। তাল সামলাতে না পেরে

কয়েকবার পড়ে গেলাম গরাদের উপর। গার্দোও ছিল ওখানে, কিন্তু ধরে রাখতে পারল না আমাকে। আমার শরীরে, চুলের মধ্যে হাতগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে, অনুভব করতে পারলাম-ফিসফিস করে বলছে কে যেন-

‘সাহায্য করুন, ম্যাম...’

‘কেউ নেই এখানে, ম্যাম, কেউ আসবে না...’

বয়স্ক এক লোকের কোলে গুয়ে আছে একটা ছোট ছেলে, চুলগুলো রঙ করা। ছেঁড়া প্যান্ট পরা একটা বাচ্চা কুঁকড়ে পড়ে আছে ছেঁড়া খবরের কাগজের উপর। চুল্লির মধ্যে বাস করছে ওরা।

ওদের হাতগুলো থেকে আমাকে ছাড়িয়ে আনল গার্দো। চোখগুলো উদ্বিগ্ন, কিন্তু তাতে অসভ্যতার কোনো চিহ্ন নেই-এই অবস্থায় থাকার পরেও নিজেদের আচরণ সংযত রাখা-অনুভব করলাম, অশ্রু এসে জমা হচ্ছে আমার চোখগুলোতে।

এগিয়ে চললাম আমি। মনে হচ্ছে যেন পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপরে উঠছি-একটা একটা করে পা ফেলছি শুধু। করিডোর ধরে এগোতে এগোতে সামনে তাকলাম, দেখলাম গার্ডের নীল শার্ট পরা পিঠ। তাকে অনুসরণ করতে করতে এক সময় এসে দাঁড়লাম একটা ধাতব দরজার সামনে, তারপর সেটা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। যখন দরজাটা আমার পেছনে বন্ধ হয়ে গেল, দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে শুরু করলাম আমি।

সিঁড়ি দেখা গেল একটা। একটু সুস্থ হওয়ার পর সেটা ধরে উপরে উঠতে শুরু করলাম। হট্টগোল আর দুর্গন্ধ ধীরে ধীরে কমে যেতে শুরু করেছে।

গার্ড বলল, ‘লোকটা হাসপাতালে আছে এখন।’

দ্বিতীয় এক গার্ডকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলল সে। আরও একটা দরজা খুলে গেল আমাদের সামনে। উজ্জ্বল আলোর মধ্য থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। দেয়ালে লাগানো একটা ফ্যানের হাওয়া এসে লাগল গায়ে। এখানে বেশ অন্ধকার, তাই খাপ খাইয়ে নিতে একটু সময় লাগল আমার চোখগুলোর। সরু একটা করিডোর ধরে এগিয়ে গেলাম। শেষ মাথায় একটা হুইলচেয়ার দেখা গেল। তারপর আবার ডান দিকে একটা শূন্য কামরায়। ভেতরে একটা টেবিল, আর কয়েকটা চেয়ার পাতা রয়েছে। একটায় বসলাম আমি, তারপর দুই হাত টেবিলের উপর রেখে তাতে মাথার ভর রাখলাম, কারণ এখনও অসুস্থ ভাবটা সম্পূর্ণ কাটাতে পারিনি। গার্দো

সম্ভবত এক মুহূর্তের জন্য কোথাও উধাও হয়ে গেল। আরও একটু পানি খেলাম আমি। কিছুক্ষণ পরে একটু সুস্থ বোধ করলাম।

আবার ফিরে এল গার্দো, বসল আমার পাশে।

আমি বললাম, ‘ওখানে বাচ্চাদেরও আটকে রাখা হয়েছে।’

গার্দো শুধু তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

‘কি অপরাধ করেছে ওরা?’

কাঁধ ঝাঁকাল গার্দো। ‘ওরা গরীব। অনেক কিছুই করে।’

‘কিন্তু...এভাবে মানুষকে আটকে রাখা কি ঠিক? কি করেছে ওরা?’

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল গার্দো। তারপর বলল, ‘ওরা চুরি করে। মারামারিও করে।’ নরম হাসি ফুটল ওর মুখে, যেন আমার মন ভালো করতে চাইছে। ‘এখানে অন্তত খাবার পায় ওরা। যতটা ভাবছেন, অতটা খারাপ নেই ওরা এখানে।’

অপেক্ষা করতে লাগলাম আমরা...কতক্ষণ, খেয়াল নেই। সময়ের সংজ্ঞা যেন বদলে গেছে। হয়তো বেশিক্ষণ নয়। কিছুক্ষণ পর কারও কণ্ঠস্বর শোনা গেল, দুই গার্ড এসে হাজির হলো। খুব বুড়ো একটা মানুষকে আমাদের দিকে নিয়ে আসছে তারা। আস্তে আস্তে হাঁটিয়ে আনছে লোকটাকে, কারণ সহজে হাঁটতে পারছে না লোকটা। পরনে গাঢ় রঙের ঢোলাট্রাউজার, আর সাদা শার্ট, গলা পর্যন্ত বোতাম লাগানো। গার্ডরা তাকে সাহায্য করেছে ঠিক, কিন্তু হাতে একটা লাঠিও আছে লোকটার। বেশ কষ্টের সাথে সামনে এগিয়ে আসছে সে। আমার দিকে তাকিয়ে আছে সে। জ্বলন্ত চোখগুলোর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম আমি। ঝাপসা, কিন্তু ক্ষুধার্ত-তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাতে, যেন আমার জন্যেই অপেক্ষা করে ছিল।

অলিভিয়া বলছি, এখনও। আমাকে বলা হয়েছে সব কিছু লিখে জানাতে। কিন্তু গার্দোরও হয়তো কিছু বলার থাকতে পারে। খেয়াল করলাম, উঠে দাঁড়িয়ে আমার পেছনে চলে এল গার্দো। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। কেউ যেন বুঝতে পারছে না এখন কি করতে হবে।

‘মিস অলিভিয়া?’ জিজ্ঞেস করল লোকটা।

‘হ্যাঁ,’ জবাব দিলাম আমি।

চোখ পিটপিট করল লোকটা। ‘বসুন, প্লিজ,’ বলল সে, তারপর নিজের ভাষায় গার্ডদের বলল কিছু একটা। একটা চেয়ারে তাকে বসতে সাহায্য করল তারা। দারুণভাবে ঘামছে লোকটা, একটা রুমাল বের করে নিজের কপাল মুছে নিল। সেই সাথে মুখ আর ঘাড়ও পরিষ্কার করল।

কিছুক্ষণ পর আমার দিকে তাকিয়ে হাসল সে। বলল, ‘ওরা আপনার নামটা বলেছে আমাকে। আমাকে দেখতে আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আশা করি আপনার খুব বেশি সমস্যা হয়নি।’

বোঝাই যাচ্ছে, কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে তার। তাকে প্রচণ্ড অসুস্থ মনে হলো আমার কাছে, এমন অসুস্থ কারও জেলখানায় থাকা উচিত নয়। কী বলব বুঝে পেলাম না আমি।

‘আপনার নামটা আমার কাছে পরিচিত নয়,’ বলে চলল লোকটা। ‘আর আমাকে কেন দেখতে এসেছেন সেই কারণটাও কেউ বলেনি আমাকে। মাফ করবেন...দেখতেই পাচ্ছেন, আপনি এমন এক সময়ে এসেছেন যখন আমি অত্যন্ত অসুস্থ। কিন্তু আমি কখনও না বলি না...কখনও বলি না।’

লোকটাকে শুধু অসুস্থ বললে আসলে কিছুই বলা হয় না। মারী যাচ্ছে সে। কিভাবে বুঝলাম, জানি না, কিন্তু নিশ্চিত ছিলাম। চামড়া খুলে পড়েছে, প্রচণ্ড কষ্টে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। চোয়ালের নিচে ফুলে আছে কি যেন একটা, দারুণ ব্যথায় ভুগছে মনে হলো। সব কিছুর জন্য প্রাণপনে চেষ্টা করতে হচ্ছে তাকে। স্থির হয়ে বসে থাকতে, মাথা তুলে তাকাতে-নড়েচড়ে বসার সময় ব্যথায় কুঁচকে উঠল তার মুখ, স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমি। আবার

হাসল আমার দিকে তাকিয়ে। চামড়ার মধ্য দিয়ে তার খুলির গঠন স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আমি। এই লোকটা...গার্দোর দাদু? কিন্তু কোথায় যেন একটা গুগোল রয়ে গেছে। লোকটা এখন পর্যন্ত গার্দোর উদ্দেশ্যে কিছুই বলেনি।

‘আপনার সাথে দেখা হয়ে ভালো লাগল,’ বলল সে। ‘যা কিছু জানতে চান, সব বলব আমি। বলুন?’

এখনও কোনো কথা বলিনি আমি, কারণ বুঝতে পারছিলাম না, কথা বলার ক্ষমতা এখনও আছে কিনা আমার মধ্যে। যদি কিছু বলি, আমার কণ্ঠস্বর কেমন শোনাবে তাও বুঝতে পারছিলাম না। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে বললাম, ‘আমি দুঃখিত...’ আর কি বলব মাথায় আসছে না। ‘এভাবে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য। কিন্তু গার্দো...’

গার্দোর দিকে তাকলাম আমি। মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও। লোকটাকে উদ্দেশ্য করে এখনও কিছু বলেনি ও, আর লোকটাও কিছু বলেনি ওকে দেখে।

‘বিশ্বাস করুন,’ বলল বৃদ্ধ মানুষটা, ‘একজন দর্শনার্থীকে আমি কখনও ফিরিয়ে দিই না। তারা না থাকলে আমি অনেক আগেই পাগল হয়ে যেতাম। মাঝে মাঝেই পাগলামি ভর করে আমার মধ্যে। কখনও কখনও কয়েক সপ্তাহ কেটে যায়, কিন্তু কেউ আসে না। কিন্তু তারপরই যেন আবার আমার কথা মনে পড়ে যায় সবার, দিনে দু’জন করেও আসে। তবে গত বেশ কয়েক দিনে আপনিই প্রথম এলেন। আর এই ছেলেটা, এ কে...?’

‘ও গার্দো,’ বললাম আমি। ‘আপনারা তো পরস্পরকে চেনেন, তাই না?’

আমার দিকে তাকাল বৃদ্ধ, তারপর গার্দোর দিকে, মিস্ত্রি ফুটল তার চেহারায়ে। হাসল সে।

‘তার মানে আপনারা একে অপরকে চেনেন,’ বললাম আমি। ‘গার্দোই আপনার সাথে দেখা করতে চেয়েছে। আপনার বাড়িটার ব্যাপারে কথা বলতে চায়।’

নিজের ভাষায় কিছু একটা বলল লোকটা। মৃদু স্বরে জবাব দিল গার্দো। আবার কথা বলল লোকটা। এবার গার্দো কিছুই বলল না।

‘মিস অলিভিয়া,’ মুখে হাসি নিয়ে বলল বৃদ্ধ। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে অপেক্ষা করল সে। ‘আমি নিশ্চিত, আপনার সাথে যে ছেলেটা রয়েছে সে

একজন ভালো ছেলে, আর ও আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে বলে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। কিন্তু আপনার প্রশ্নের উত্তরটা হলো...' আবার থামল সে, দম নিল। 'আপনার প্রশ্নের উত্তরটা হলো : না। আমি ওকে চিনি না, আর আগে কখনও দেখিনি। আর বাড়ির কথা বললেন না? আমার কোনো বাড়ি নেই। প্রায় কিছুই বলতে গেলে নেই আমার। অনেক আগেই সব কিছু কেড়ে নেয়া হয়েছে আমার কাছ থেকে।'

'গার্দো, তুমি না বলেছিলে ইনি তোমার দাদু?' প্রশ্ন করলাম আমি।

অন্য দিকে তাকিয়ে রইল গার্দো।

'আমি বুঝতে পারছি না,' বললাম আমি। 'তুমি তো বলেছিলে...স্যার, আমি আসলে একটা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গেছি।'

'হ্যাঁ। আমিও।'

'আমি এখানে যে কারণে এসেছি...একটু আগেই বলেছি সেটা। গার্দো আপনার বাড়িটার ব্যাপারে কথা বলতে চেয়েছিল আপনার সাথে।'

মনে মনে গার্দোর বলা গল্পটা আবার স্মরণ করলাম। বিভ্রান্তির পরিমাণ আরও বাড়ল তাতে। ভয় লাগছে আমার। এই বৃদ্ধ যদি অন্য কোনো কয়েদি হয়ে থাকে? কয়েদির সিরিয়াল নাম্বার নিয়ে একটা ঝামেলা ছিল। যদি অন্য কারও সাথে দেখা হয়ে গিয়ে থাকে আমাদের?'

'অলিভিয়া, আপনি তো জানেন না আমি কে। তাই না? আমার সম্পর্কে কিছুই জানা নেই আপনার।'

'না,' বললাম আমি। 'কিছুই জানি না আমি।'

গার্দোকে নিজের ভাষায় কিছু একটা বলল লোকটা। আগের মতোই নিচু গলায় জবাব দিল গার্দো।

একটা বড় নিঃশ্বাস নিল লোকটা, তারপর চোখ বন্ধ করল। 'শুধু বলছে, আমার সাথে দেখা করার জন্য দশ হাজার পেসো খরচ করেছে। বেশ উদার হাতেই আপনার টাকা খরচ করেছে ও, বোঝা যাচ্ছে। বর্তমানে যে রেটটা চলছে তা হলো পনেরো শ, মিস অলিভিয়া। একবার এক সাংবাদিকের কাছ থেকে পাঁচ হাজার পেসো আদায় করেছিল ওরা, কিন্তু তিন দিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল তাকে। জাপান্টার নির্বাচনের সময় এগিয়ে আসছিল তখন।'

'কিছুই বুঝতে পারছি না আমি,' বললাম আবারও। 'আপনি কি গার্দোকে চেনেন না?'

‘না।’

‘তাহলে...’

‘আপনাকে ব্যবহার করে ঘুষ দিয়ে আমার সাথে দেখা করতে এসেছে ও। আপনি যে টাকাটা দিয়েছেন সেটা এখানকার কর্মকর্তাদের পকেটে ঢুকবে। গার্ডরা অনেকেই নিয়ে আসে আমার কাছে। আগেই বলেছি, আমার সাথে অনেকেই দেখা করতে চায়। ভেবেছিলাম, আপনিও হয়তো তাদেরই কেউ হবেন। আমাকে দিয়ে বেশ ভালো আয় হয় কারাগার কতৃপক্ষের।’

‘কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না...এখনও কিছু মাথায় ঢুকছে না আমার। লোকজন আপনার সাথে দেখা করতে আসবে কেন?’

‘গার্দো, তুমি কিছু বলবে না?’

নিজের ভাষায় কিছু একটা বলল গার্দো। সংক্ষিপ্ত, দ্রুত কয়েকটা বাক্য বিনিময় হলো দুজনের মধ্যে। মনে হলো কিছু একটা নিয়ে অনুরোধ করছে গার্দো। কিন্তু বাঁধা দিল বৃদ্ধ লোকটা। ‘না,’ বলল সে। ‘মিস অলিভিয়ার সাথে ইংরেজিতে কথা বলব আমরা। এই সাক্ষাতের জন্য টাকা দিয়েছেন তিনি। যা বলার, সব ইংরেজিতেই বলব আমরা।’ আমার দিকে তাকাল সে। ‘আপনার সাথে যে ছেলেটা রয়েছে, ও আমাকে ওর নিজের কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চায়। একা কথা বলতে চায় আমার সাথে। আমি নিষেধ করে দিয়েছি। বুঝতে পারছি যে আপনি বেশ ধাঁধার মধ্যে পড়ে গিয়েছেন, আর আমিও একই রকম বোধ করছি...মাফ করবেন।’

চেয়ারে ঝুঁকে বসল লোকটা। একটা মুহূর্তের জন্য মনে হলো অসুস্থ হয়ে পড়েছে সে। লাঠিতে ভর দিল, মনে হলো যেন ব্যর্থ কর্মে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। আবারও কিছু একটা বলল গার্দোকে। টেবিল থেকে একটা কাপ নিয়ে আমার পানির বোতল থেকে সেটা ভরে দিল গার্দো। বৃদ্ধ লোকটার দিকে সেটা এগিয়ে দিল সে, কিন্তু হাত কাঁপছে লোকটার। গার্দোর সাহায্য নিয়ে পানিটুকু পান করল সে।

‘আমি দুঃখিত,’ বলল লোকটা। আবার একটু পানি খেল। ‘যা বলছিলাম...আমি যদি আপনাকে আমার পরিচয় দিই, আর কিভাবে এই জেলে এলাম সেটা বলি, তাহলে হয়তো কিছুটা পরিষ্কার হয়ে আসবে সব কিছু। মৃত্যুর খুব কাছাকাছি চলে এসেছি আমি, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। ওরা আমাকে এখনও বের হতে দেবে না, জানেন? যেন ছেড়ে দিলেও

কারও কোনো ক্ষতি করতে পারব আমি।' আমার দিকে তাকিয়ে হাসল সে।
'আপনি আমার নাম জানেন, কিন্তু সেটা আপনার কাছে সম্পূর্ণ অর্থহীন।
আর সেটাই স্বাভাবিক।'

ব্যথা কমে গেছে বলেই মনে হলো। স্বাভাবিক হয়ে এল তার চেহারা।

'এই জেলে রয়েছি আমি, তার কারণ হলো-পঁয়ত্রিশ বছর আগে
সিনেটর রেজিস জাপান্টার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছিলাম আমি।
সিনেটর জাপান্টাকে চেনেন আপনি?'

'না,' বললাম আমি।

'এই দেশের অত্যন্ত প্রভাবশালী একজন লোক সে, আমাদের সম্মানিত
ভাইস প্রেসিডেন্ট। কোনো না কোনো কারণে প্রায় প্রতিদিনই পেপারে দেখা
যায় তার নাম। আপনি একজন ট্যুরিস্ট, ঘুরতে এসেছেন এখানে-এই
নামগুলো আপনার জানার কথা নয়। তবে গার্দো অবশ্য নামটা জানে, আর
তার চেহারাও চেনে। তাই না, গার্দো?'

মাথা ঝাঁকাল গার্দো। 'সবাই চেনে তাকে।'

'এই শহরে সে অত্যন্ত বিখ্যাত একজন মানুষ। আপনি খবরের কাগজ
পড়েন না?'

মাথা নাড়লাম।

'আমিও পড়ি না। মাসে হয়তো একবার, যদি কপাল ভালো
হয়-কোনো খবর আমার কাছে আসতে দিতে চায় না ওরা, হয়তো সেটাই
ভাল। পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করতে করতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি;
এত কম খবর জানতে পারায় হয়তো আমার জন্য ভালই হয়েছে। আমি
কখনই গুরুত্বপূর্ণ কেউ ছিলাম না, অলিভিয়া। ছোটখাট এক কর্মচারি
ছিলাম; থাকতাম শহরের পূর্ব অংশে। এখানকার সিস্টেম সম্পর্কে আপনার
ধারণা নেই, তাই আমিও...যাই হোক, এতে কিছু আসে যায় না। যেটা
গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, চল্লিশ বছর আগে আমি জানতে পেরেছিলাম,
আন্তর্জাতিক সাহায্যের তিন কোটি ডলার নিজের পকেটে পুরে ফেলেছে
সিনেটর জাপান্টা। আমেরিকা থেকে এসেছিল ওই সাহায্যের বেশিরভাগ
অংশ, দেয়া হয়েছিল হাসপাতাল এবং স্কুল তৈরির জন্য। এই টাকার
নাম দেয়া হয়েছিল "ফসল-বীজ" টাকা। এখন, এই "ফসল-বীজ" টাকা
কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যখন কোনো দেশ এভাবে অনুদান পায়, তখন শর্ত
থাকে যে সরকারের পক্ষ থেকে, আর অন্যান্য দাতা দেশের পক্ষ থেকেও

সমান অংকের টাকা আসতে হবে। যার মানে হচ্ছে, এই তিন কোটি ডলারের সাথে আমাদের সরকার, আর বেশ কিছু বড় বড় ব্যাংকেরও অনুদান দেয়ার কথা ছিল। সব মিলিয়ে ওই তিন কোটি ডলার গিয়ে দাঁড়াত ছয় বা সাত কোটিতে। সাত কোটি ডলার দিয়ে এই শহরের চেহারাই বদলে দেয়া যেত সেই সময়, মিস অলিভিয়া। কিন্তু কোনো স্কুল বা হাসপাতাল কখনও তৈরি করা হয়নি, দরিদ্রই থেকে গেছে পুরো শহর। সিনেটর জাপান্টা চুরি করেছে ওই টাকা, আর এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম আমি। বিচারটা কখনও আদালত পর্যন্ত যেতে পারেনি, কারণ তার আগেই পাল্টা মামলা করে বসেছিল সিনেটর। আমার চাইতে অনেক বেশি বন্ধু, অনেক বেশি ক্ষমতা ছিল তার। শেষ পর্যন্ত আমিই দোষী সাব্যস্ত হলাম, শাস্তি পেলাম। আমার আপিলগুলো আমারই মুখের উপর ছুঁড়ে দেয়া হলো। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলো আমার, আর...’

আবার থামল সে, ব্যথায় কঁচকে গেছে মুখ।

‘এত দিনে হয়তো সেই শাস্তির মেয়াদ ফুরোতে যাচ্ছে।’

গার্দো বলছি-অল্প একটু সময়ের জন্য। শুধু এটুকু বলে রাখি যে সিস্টার অলিভিয়ার কাছে আমি দুঃখ প্রকাশ করতে চাই। আমরা তিনজন আগেই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, আর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। র্যাট বলছিল আপনাকে অন্তত কিছুটা হলেও জানানো উচিত, কিন্তু আমি নিষেধ করেছিলাম। আমিই বলেছিলাম যে আমাদের তিনজন বাদে আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারব না আমরা।

সে জন্য আমি দুঃখিত।

আপনাদের মনে রাখতে হবে যে হোসে অ্যাঞ্জেলিকোর চিঠিটা আমিই পড়েছিলাম-একবার নয়, অনেকবার। তিনজনই বুঝতে পারছিলাম যে বিপদ কতটা কাছাকাছি চলে এসেছে আমাদের। আর রাফায়লের সাথে ওই পুলিশ স্টেশনে যা ঘটল...সিস্টার, ও কিভাবে সহ্য করতে পারল আমার জানা নেই। এর আগে আমার ধারণা ছিল ও নরম প্রকৃতির, একটু চাপ দিলেই ভেঙে পড়বে। কিন্তু ভুল হয়েছিল আমার। দয়া করে বোঝার চেষ্টা করুন, আপনাকে জানানোর কোনো উপায় ছিল না আমাদের। শুধু আমরা তিনজন : রাফায়েল, র্যাট আর আমি ছাড়া আর কেউ কিছু জানত না। আর আমরা জানতাম যে খুব তাড়াতাড়িই পালাতে হবে আমাদের, বেহালায় আর বেশি দিন থাকতে পারব না। তাই কাউকে কিছু জানাতে চাইনি।

দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। আশা করি আবারও আপনার সাথে দেখা হবে আমাদের। আপনার সাথে এমনটা করতে হলো বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

আমার দিকে তাকিয়ে হাসল গ্যাব্রিয়েল ওলেন্ড্রিজ।

আবারও অলিভিয়া বলছি।

‘আরও কিছুটা জানিয়ে রাখি আপনাকে,’ বলল সে। ‘এক সময় সব কিছুর অর্থ বুঝতে পারবেন আপনি। এই ছেলেটাও আমাদের বলবে, আসলে কি চায় সে।’

‘একজন মানুষের পক্ষে কিভাবে তিন কোটি ডলার চুরি করা সম্ভব?’ জানতে চাইলাম আমি।

‘কিভাবে?’

‘হ্যাঁ।’

‘এমনটা প্রায়ই হয়। খুব সহজ কাজটা—সুটকেসভর্তি টাকা চুরি করা, বা ব্যাংক ডাকাতি করার মতো কঠিন কিছু নয়। সরকারী ব্যাপারগুলোতে কাজটা করা হয় সাধারণত ভুয়া চুক্তিপত্রের মাধ্যমে। সবাই যেটা করে তা হলো কিছু টাকা এদিকে সরিয়ে ফেলে, কিছু টাকা ওদিকে। দক্ষ হিসেব নিকেশের মাধ্যমে, আর যারা এসব দিকে খেয়াল রাখে তাদের টাকা খাওয়ানোর মাধ্যমে করা হয় কাজটা। এর সাথে অনেক লোক জড়িত আছে বলে জানতাম আমি। কেউ কেউ হয়তো এমনও ভাবছিল যে আমাদের দেশের উপকারই করেছে তারা। প্রায় দুই বছর সময় লেগে গিয়েছিল আমার, কিন্তু সব দলিলপত্র জোগাড় করতে সক্ষম হয়েছিলাম আমি। আপনার মতো আমিও কিছু দিন অবৈতনিকভাবে কাজ করেছিলাম, মিস অলিভিয়া, কারণ এই স্বেচ্ছাসেবকের কাজটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাথে নিয়েছিলাম আমি। ভুয়া চুক্তিপত্রগুলোর কপি জোগাড় করেছিলাম, সেই সাথে ভুঁইফোড় ব্যাংক একাউন্টগুলোর হিসেবগুলোও। লেনদেনের কপি জোগাড় করেছিলাম। সব ছিল নগদ টাকায়, কারণ এই লোকটা বরাবরই নগদ টাকা ভালবাসত। বিশাল সব অংক, সব ডলারে! ডলারই ছিল সব লেনদেনের মূল মাধ্যম, কখনই আমাদের দেশের মুদ্রা নয়। আর এই টাকাগুলো কোথায় যাচ্ছিল? মাফ করবেন, অলিভিয়া। গল্পটা এতবার বলেছি যে, এখন একঘেয়ে লাগে আমার কাছে।

‘কি হলো তারপর?’ জানতে চাইলাম।

‘নিজের বাড়িতে একটা ভল্টে সব টাকা জমা করে রাখছিল লোকটা।’

‘কিন্তু...কিন্তু আপনি কিছু প্রমাণ করতে পারেননি?’

‘যথেষ্ট প্রমাণ ছিল আমার কাছে। কিন্তু বোকামী করেছিলাম আমি। আমার অফিসে তল্লাশী চালানো হয়েছিল, আর সেই একই রাতে ভয়ঙ্কর এক আগুন লেগেছিল আমার বাড়িতে। তখন ভেতরে ছিলাম না আমি, কিন্তু আমার পরিচারিকা এবং ড্রাইভার-দুজনই সেই আগুনে মারা যায়। সেই সাথে পুড়ে ছাই হয়ে যায় সব প্রমাণ। তারপর, অলিভিয়া, বুঝতে পারলাম লোকটা আসলে কত বড় ধুরন্ধর। আমাকে ফাঁসানোর জন্য ফন্দি আঁটছিল সে। অর্থনৈতিক অসততার অভিযোগ আনা হলো আমার বিরুদ্ধে। বলা হলো, আমি নাকি সরকারের পাঁচ লক্ষ ডলার মেরে দিয়েছি। প্রমাণ করা হলো যে একজন সুপরিচিত ব্যাংকারের খুনের পেছনেও আমার হাত ছিল। ভাবুন তো, মিস অলিভিয়া...সেফ ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই এতগুলো অপরাধ করে ফেলেছিলাম আমি! প্রথমে ভেবেছিলাম যে সব কিছু এত বেশি বানোয়াট, এত বেশি স্পষ্ট যে আমার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আমার উকিলরাও কোনো দৃষ্টিভঙ্গি করছিল না। কিন্তু আমার উকিলদের কিনে ফেলেছিল ওরা, আগে বুঝতে পারিনি। যখন বুঝলাম তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমার সপক্ষে যা কিছু ছিল তার সব সিনেটর জাপান্টার হাতে তুলে দিয়েছিল তারা। শুনলে আপনার হাসি পেতে বাধ্য। সিনেটর ছিল চালাক, আর আমি বোকা। আর এই দেশে বোকামির দণ্ড দিতেই হবে আপনাকে, যেমন দিতে হবে গরীব হওয়ার দণ্ড। কয়েক মাস পর, যখন সব কিছু ভালভাবে চলছে, আর আমিও ভাবছি যে জিতে যাব...তখনই গ্রেফতার করা হলো আমাকে। শাস্তি দেয়া হলো, একটু আগেই বলেছি যার কথা।’

কিছুক্ষণ থামল লোকটা। ‘তার পর থেকেই জেলে রয়েছি আমি।’

উঠে দাঁড়িয়ে তার কপালে একটা কাপড় চেপে ধরল গার্দো। আবার তার হাতটা চেপে ধরল বৃদ্ধ, দেখতে পেলাম আমি।

‘স্যার,’ হঠাৎ বলে উঠল গার্দো। ‘দাস্তে জেরোম নামে কাউকে চেনেন?’

তার দিকে তাকাল বৃদ্ধ, তারপর আমার দিকে।

‘আমার মনে হয় অনেক প্রশ্ন রয়েছে এই ছেলেটার কাছে,’ বলল সে। ‘আমাকে সেই প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করতে এসেছে সে। সবগুলোর উত্তরই দেবো আমি। দাস্তে জেরোম ছিল আমার ছেলে।’

‘আর...ফসল মানে কি বোঝানো হতে পারে?’ জানতে চাইল গার্দো।
‘এবং...কয়েকটা শব্দ...“কাজটা শেষ হয়েছে”, এর মানে কি?’

বৃদ্ধ লোকটা বলল, ‘কি শেষ হয়েছে? কি বলতে চাইছ তুমি?’ মৃদু স্বরে কথা বলছে সে।

‘কাজটা শেষ হয়েছে,’ আবার বলল গার্দো। ‘বাড়িতে গেলে তোমার মন এখন আনন্দে নেচে উঠবে।’

ঠোট নড়তে লাগল লোকটার, স্থির চোখে তাকিয়ে আছে। ‘কি শেষ হয়েছে সেটা তোমাকেই বলতে হবে,’ বলল সে। ‘তুমিই এর ব্যাখ্যা দিতে পারবে বলে আমার ধারণা।’

‘আমি জানি না,’ বলল গার্দো। ‘আমি জানি না এর অর্থ কি। কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে যে এই মুহূর্তে যদি আপনার সিনেটর জাপান্টার বাড়িতে যান তাহলে আপনার মন আনন্দে নেচে উঠবে, কারণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।’

মুখ খুলল লোকটা, কিন্তু কিছু বলল না। আমার দিকে তাকাল সে, তারপর গার্দোর দিকে। চোখগুলো আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সামনে ঝুঁকে বসল সে, গার্দোর হাতটা চেপে ধরে অত্যন্ত নিচু, মৃদু গলায় বলল, ‘কে তুমি, ছেলে? দয়া করে হেয়ালি বন্ধ করো এবার। তুমি এমন কিছু জিনিস জানো, যেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’

‘আমি বেহালার ভাগাড়ে থাকি।’

‘হ্যাঁ, রাস্তার ছেলে। আগেই বুঝতে পেরেছি আমি।’

গার্দোকে শব্দ করে ধরে রেখেছে সে। ‘এবং ওই জায়গা হচ্ছে সবচেয়ে অন্ধকার রাস্তাগুলোর একটা, আমার ধারণা। পথশিশুদের নিয়ে ওখানে বহু বছর কাজ করেছি আমি, আর আমার ছেলেও। অলিভিয়া, আপনার হয়তো মনে হতে পারে যে আমার কথাগুলো কৰ্কশ; কিন্তু এই নতুন কাপড় ভেদ করেও রাস্তার গন্ধ আসছে আমার নাকে। এই গন্ধ কখনো মুছে যায় না, মোছা সম্ভব হয় না। এখানে কেন এসেছ তুমি, ছেলে? বলো আমাকে।’

গার্দো বলল : ‘কারণ আমি মি. হোসে অ্যাঞ্জেলিকোর লেখা একটা চিঠি খুঁজে পেয়েছি, স্যার। একটা স্টেশনের লকারে ঝেঁয়েছি চিঠিটা। পুলিশ ওই চিঠিটাই খুঁজছে। আপনাকে লেখা হয়েছে ওটা, বলা হয়েছে যে আপনার এখন আনন্দিত হওয়া উচিত, কারণ কাজ শেষ হয়েছে।’

‘চিঠিটা দাও আমাকে।’

‘ওটা এখানে নিয়ে আসার সাহস পাইনি আমি, স্যার।’

‘কেন?’

‘কারণ মনে হচ্ছিল যে ওটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হতে পারে।’

‘হোসে আমার কাছে প্রতি বছরই চিঠি লেখে। ওর লেখা চিঠি তোমার কাছে যাবে কিভাবে?’

‘আমার ধারণা, পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার ঠিক আগেই চিঠিটা লিখেছিল সে। আমরা খুঁজে পাই সেটা, আর—’

‘পুলিশ ওকে ধরে নিয়ে গেছে? ও কোথায় এখন?’

‘তাকে খুন করেছে পুলিশরা, স্যার। জিজ্ঞাসাবাদের সময় মারা গেছে সে।’

মৃদু স্বরে কথা বলছিল গার্দো, কিন্তু ওর শেষ কথাগুলো যেন হাতুড়ির মতো আঘাত করল বৃদ্ধ মানুষটাকে। দেখলাম, চমকে উঠল সে, যেন ধসে পড়ল তার ভেতরের সব কিছু। একটু সরে এল গার্দো। নিজের ভাষায় আরও কিছু কথা বলল সে লোকটাকে, প্রতিটা কথা যেন নতুন করে আঘাত করল বৃদ্ধকে। শেষ পর্যন্ত যখন মুখ তুলে তাকাল, তখন অপরিসীম কষ্ট ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলাম না আমি তার মুখে।

থরথর করে কাঁপছে সে। তার গভীরে কিছু একটা যেন ভেঙে পড়ছে। তাকিয়ে দেখা ছাড়া কিছুই করার রইল না আমাদের।

রাফায়েল বলছি :

সিস্টার অলিভিয়া সেই দিন আমাদের প্রকৃত বন্ধুর মতো কাজ করেছিলেন। তার সাথে আর কখনও দেখা হয়নি আমাদের-খুব তাড়াতাড়িই জানতে পারবেন কারণটা-আর সে কারণে ধন্যবাদও জানাতে পারিনি তাকে। এটা লেখার পেছনে একটা উদ্দেশ্য হলো তাকে ধন্যবাদ জানানো। হয়তো এক দিন আমাদের দেখা হবে আবার, তখন তাকে সঠিকভাবে ধন্যবাদটা দিতে পারব।

আপনার কাছে মিথ্যে বলার জন্য দুঃখিত, সিস্টার।

গার্দো যখন জেলখানায় গেল, তখন আমরা কি করছিলাম সেটা বলে রাখা জরুরি। সেটা বলা শেষ হলে র‍্যাট বলতে শুরু করবে, আর ওর কথাগুলো লিখে রাখব আমি। ও আর আমি একটা কাজ করব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, কারণ সারা দিন বসে বসে অপেক্ষা করা বেশ কঠিন কাজ। তাছাড়া, পুলিশ স্টেশন থেকে ফিরে আসার পর কিছু একটা বদলে গিয়েছিল আমার মধ্যে-স্থির হয়ে বসতে পারছিলাম না কোথাও, আর সবাই শুধু তাকিয়ে থাকছিল আমাদের দিকে। তাই চিঠিটা নিয়ে খালের পাশ দিয়ে এমন একটা জায়গায় চলে গিয়েছিলাম যেখানে কেউ যায় না-যেখানে বেশ নিরাপদ বোধ করতে পারব আমরা, কারণ কেউ ওখানে আসতে চাইলে আমাদের চোখে না পড়ে আসতে পারবে না। সেখানে বসে খবরের কাগজ থেকে পাওয়া কাটিংগুলো আবার পড়তে শুরু করলাম আমরা, একটার পর একটা। চিঠিটাও পড়ে দেখলাম। এতবার ওটার ভাঁজ খোলা হয়েছে যে এখন প্রায় ছিঁড়ে যাওয়ার অবস্থা। দুজনেরই অবশ্য প্রায় মুখস্ত হয়ে গেছে, কারণ গার্দোকে এটা মুখস্ত করতে সাহায্য করেছিলাম আমরা। এমনকি চিঠির শেষে থাকা এলোমেলো, দুর্বোধ্য সংখ্যাগুলোও মুখস্ত করে ফেলেছি প্রায়। ওই নামগুলো আবার ফিরে এল আমাদের কাছে : হোসে অ্যাঞ্জেলিকো, পুলিশ স্টেশনে মারা যাওয়া একজন মানুষ। এখন আমার ভাইয়ের মতো মনে হয় তাকে, স্বপ্নেও তাকে দেখি আমি। গ্যাব্রিয়েল

ওলেন্দ্রিজ, কোলভা জেলখানায় বন্দি তার বন্ধু। সেই সাথে মোটা সিনেটর, জাপান্টা...সিনেটর জাপান্টার সম্পর্কে লেখা কথাটা পড়ছিলাম চিঠিতে, এই সময় হঠাৎ আমাকে বাঁধা দিল র‍্যাট, তারপর আবার পড়তে বলল ওই লাইনটা। ‘যদি তুমি এখন জাপান্টার বাড়িতে যাও, তাহলে তোমার মন আনন্দে নেচে উঠবে।’

‘মানে কি এর?’ প্রশ্ন করল র‍্যাট।

আমি জানি না। প্রতিবারই চিঠিটা পড়ার সময় এই কথাটাই বলে আসছি আমরা : আমি জানি না। আমি জানি না, জানি না।

‘লোকটার বাড়ি কোথায়? হয়তো ওখানে যাওয়া উচিত আমাদের।’

‘গ্রিন হিলস,’ বললাম আমি। ‘সবাই জানে। হোসে অ্যাঞ্জেলিকো যেখানে থাকত।’

সিনেটর একজন বিখ্যাত মানুষ। সবাই জানে যে ওই এলাকায়, শহরের ঠিক বাইরেই তার একটা বাড়ি আছে। সবাই জানে যে সিনেটর একজন ধনী আর বয়স্ক মানুষ। কুড়িয়ে পাওয়া খবরের কাগজগুলোতে তার ছবি প্রায়ই দেখেছি আমি, আর বেশিরভাগ সময়ই সেই কাগজগুলোর ভেতর পেয়েছি স্টুপ। সবাই জানে যে শহরে বেশ কিছু সম্পত্তি আছে তার-যে পরিমাণ সম্পদ আছে স্রেফ আরও পাঁচ কি ছয়টা পরিবারের। রাস্তার নামকরণ হয়েছে সিনেটরের নামে, শহরের ধনী এলাকায় তার নামে একটা শপিং মল আছে, সেই সাথে আছে আকাশচুম্বী অটালিকা...সব দিক দিয়েই লোকটা অনেক বড় কেউ। দুই বছর আগে ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছে সে, সব জায়গাতেই তার হাস্যোজ্জ্বল মুখের ছবি দেখা যায়।

র‍্যাটের মাথা থেকেই প্রথম বুদ্ধিটা বের হলো-সিনেটরের বাড়িতে যেতে হবে আমাদের। বেহালা থেকে বের হওয়ার সুযোগ পেয়ে আমিও খুশি হলাম।

‘কিন্তু ওখানে গেলে মন আনন্দে নেচে উঠবে কেন?’ প্রশ্ন করল র‍্যাট। অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করলাম আমরা, আর শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলাম যে ওখানে না গেলে সেটা বোঝা যাবে না।

তবে স্বাভাবিক সমস্যাটা এখানেও দেখা দিল। টাকা লাগবে, বাসভাড়ার জন্য। আমার কাছে যা ছিল সব আন্টিকে দিয়ে দিয়েছি, তাই এখন আবার ফাঁকা আমার পকেট।

র‍্যাট বলল, ‘অসুবিধে নেই। আমার কাছে যথেষ্ট আছে।’

বলতেই হচ্ছে, ওর কথা বিশ্বাস হলো না আমার। বললাম, ‘তোমার কাছে টাকা এল কিভাবে?’ কথাটা ওকে খোঁচানোর জন্য বলিনি। এই এলাকায় ওকে সবচেয়ে গরীব ছেলে বলে চালিয়ে দেয়, তাই ওর কাছে যে একটা পেসোর বেশি কিছু থাকতে পারে এই চিন্তাটা করতেই হাসি চলে এল মুখে।

পাল্টা হাসি উপহার দিল র্যাট, তারপর মাথা নাড়ল। ‘তুমি যা ভাবছ তার চাইতে বেশি আছে আমার কাছে। এসো, দেখাচ্ছি তোমাকে-কে বেশি গরীব।’

তখনই র্যাটের সম্পর্কে কিছু কথা জানতে পারলাম আমি, যেগুলো আগে কখনও জানতে পারিনি।

পুরনো বেল্টের গোঁড়ায় যাওয়ার পথটায় চলে এলাম আমরা। বেল্টটার নাম্বার চোন্দ। পুরো পথটা সতর্ক চোখে দেখতে দেখতে এলাম, কেউ নজর রাখছে কিনা। এখনও ভয় লাগছে আমার সব কিছুতে-কিছুতেই অনুভূতিটা ঝেড়ে ফেলতে পারছি না। বারবার শুধু পেছনে তাকাচ্ছি। তাই সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় যখন ইঁদুরগুলো চিৎকার ছেড়ে দৌড়ে পালাল, তখন আমি নিজেও ভয়ে চৈচিয়ে উঠলাম। ছোট্ট একটা শিশু যেন আমি, এমনভাবে আমাকে ধরে রাখল র্যাট।

‘এখানে তুমি থাকো কিভাবে?’ বললাম আমি। পুরো ভাগাড়ে এই জায়গাটাই সবচেয়ে বেশি খারাপ।

র্যাট শুধু হাসল। ‘যত জায়গায় আমি থেকেছি, তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে ভাল। তোমার পছন্দ হচ্ছে না কারণ তুমি ভাগ্যবান। বাড়ি বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু বরাবরই ছিল তোমার।’

‘তুমি কিভাবে এসব সহ্য করো আমার জানা নেই।’

‘ইঁদুরগুলো তো আমাকে বিরক্ত করে না, সত্যি বলছি। কয়েকটা বরং বেশ বন্ধুর মতো আচরণ করে।’

‘আর রাতের বেলা?’ প্রশ্ন করলাম আমি। ‘কামড়ে তোমার মাংস তুলে নেয় না কখনও?’

হেসে উঠল র্যাট। ‘মাঝে মাঝে হয়তো শুকে দেখে, যখন আমি ঘুমিয়ে থাকি। কিন্তু কামড়াবে কেন? আমার গায়ে তো মাংসই নেই!’

দুটো মোমবাতি জ্বালাল ও। দেয়ালের ওপাশে খচমচ শব্দ শুনতে পেলাম আমি, সাথে কিচকিচ ডাক।

‘একটা বাসা আছে এখানে কোথাও,’ বললাম আমি। ‘আমাকে টাকা দিলেও এখানে ঘুমাব না কখনও।’

‘সব জায়গাতেই ওদের বাসা আছে। তবে এখানকার বাসাটা বেশ বড়। গত রাতে ওদের শব্দে ঘুমাতে পারিনি। ও, হ্যাঁ, ওই ব্যাগটা...’

‘কি হয়েছে ব্যাগটার?’

ব্যাগটার চিন্তা মাথায় আসতেই জমে গেলাম আমি।

‘পুলিশ যদি এখন এখানে এসে তল্লাশী করেও, তাহলে কোনো ক্ষতি নেই। কারণ ওটা আর নেই এখানে, রাফায়েল। দুই রাতের মধ্যেই ইঁদুরের দল ওটা খেয়ে ফেলেছে। ওয়ালেটটাও অদৃশ্য হয়েছে।’

দেয়ালের একটা ইট এদিক ওদিক নাড়াচ্ছিল র্যাট। হঠাৎ গম্ভীর চোখে তাকাল আমার দিকে।

‘আরেকটা কথা,’ বলল ও। ‘তোমাকে বিশ্বাস না করে উপায় নেই আমার। আশা করি আমার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে তুমি। গার্দোকে বলবে, সেটা জানি। কিন্তু আর কাউকে বলা যাবে না!’

‘কি বলব?’ জানতে চাইলাম ওর কাছে। কথাগুলো একটাও আমার মাথায় ঢোকেনি।

‘ভাবছিলাম, তুমি আর আমি এখন রয়েছি এখানে, আর তোমাকে আমার গোপন দিকটা দেখাচ্ছি আমি। ইচ্ছে করলেই এখন তুমি আর গার্দো মিলে আমার সব কেড়ে নিতে পারো। তখন আমি কি করব?’

কথাগুলো বলার সময় ঠাটার কোনো চিহ্ন রইল না ওর গলায়, কিন্তু তবুও না হেসে পারলাম না। অবজ্ঞা করছি না ওকে—কিন্তু ওর কাছ থেকে কিছু কেড়ে নেয়ার কথা ভাবাই যায় না।

‘তোমার কাছে আছে কি কেড়ে নেয়ার মতো?’ বললাম আমি। ‘একটা হাফপ্যান্ট, সেটাও তুমি পরে আছ।’

হাসতে শুরু করল র্যাট, সেই বাচ্চাদের মতো চিকন গলার হাসি। দেয়ালের আলগা ইটটা খুলে মেঝেতে নামিয়ে রাখল ও, তারপর ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল। সরু সরু আঙুলগুলোতে সাবধানে ধরে বের করে আনল ছোট্ট একটা ধাতব বাস্ক, সিগারেটের প্যাকেটের চাইতে বেশি বড় হবে না। ইঁদুরগুলোর চেচামেচি বেড়ে গেল কয়েক গুণ। বাস্কটার মুখ শক্ত করে বন্ধ করা। সেটা দুই পায়ের মাঝখানে রেখে মুখ খুলল ও।

তারপর দাঁত বের করে হাসল আমার দিকে তাকিয়ে। ‘কেড়ে নেয়ার মতো কিছু নেই আমার কাছে, তাই না? দেখবে, কি আছে আমার কাছে? তোমার আন্দাজের চাইতে অনেক বেশিই আছে।’

‘কি ওর মধ্যে?’

‘গুপ্তধন, বুঝলে? দুই হাজার তিনশ ছাব্বিশ পেসো। আমার মুক্তির টিকেট।’

সত্যিই, টাকাগুলো বের করে গুনে দেখাল আমাকে। আমার চেহারা য় নিশ্চয়ই বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছিল, কারণ আবার হাসতে শুরু করল ও, দুই পায়ের উপর দুলছে। ‘টুকটাক জিনিসপত্র রাখার জন্য আরও একটা বাক্স আছে আমার কাছে,’ বলল ও। ‘আরেকটা টিনের বাক্স, যাতে হুঁদুরগুলো ভেতরের জিনিস খেয়ে ফেলতে না পারে। ওটার মধ্যে আছে দুই শ ষাট পেসো। আজ অবশ্য আমাদের জন্য অনেকটা ছুটির দিন, তাই এই বাক্সটা থেকেই কিছু টাকা ধার নিচ্ছি আমি।’

‘কিন্তু এত টাকা পেলে কোথায়?’ অবাক হয়ে বললাম আমি। ‘আমাদের মতো ছেলেদের জন্য দুই হাজার অনেক বড় অংক।’

‘অল্প অল্প করে জমিয়েছি। প্রায় সবাই আমাকে কিছু না কিছু টাকা দেয়। সেগুলো আস্তে আস্তে জমা হয়। খুব বেশি খাই না আমি, আর অনেকেই খাবারও দেয় আমাকে। সিস্টার অলিভিয়ার কথাই ধরো না-গতকালই আমাকে পঞ্চাশ পেসো দিয়েছে সে। তারপর আবার তার কাছ থেকে একটা স্যান্ডউইচও পেয়েছি।’

‘কিসের জন্য এই টাকা জমাচ্ছ তুমি?’

মাথা নিচু করে ফেলল র‍্যাট, মনে হলো গভীরভাবে চিন্তা করেছে কিছু। তারপর সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ বাইরে তাকিয়ে রইল, যেন দেখছে যে কেউ কান পেতে শুনছে কিনা ওর কথা। তারপর ফিরে এসে উবু হয়ে বসল মেঝেতে। বাক্স থেকে একটা নোট বের করে রাখল পকেটে, তারপর ঢাকনা বন্ধ করে দিল। এবার আমার দুই কাঁধে দুই হাত রাখল ও, সরাসরি চোখ রাখল আমার চোখে।

‘তুমি আর আমি তো এখন বন্ধু,’ বলল ও। ‘তাই না?’

মাথা ঝাঁকালাম আমি।

‘সত্যিকারের বন্ধু?’

‘অবশ্যই,’ বললাম আমি।

‘ঠিক আছে। তোমাকে এমন একটা কথা বলব, যেটা কখনও কাউকে বলিনি। অলিভিয়াকে বলেছি, কিন্তু সে আমাকে কথা দিয়েছে যে আর কাউকে বলবে না। তাকে বলেছিলাম শুধু এই কারণে যে একেবারেই কাউকে না বলতে পারলে ভালো লাগে না।’ গলা নামিয়ে আনল ও। অন্ধকারে একটা হুঁদুর দৌড়ে গেল আমাদের মাঝখান দিয়ে। নিজেকে শান্ত রাখতে বেগ পেতে হলো আমার। ‘আমি এখানে জন্ম নিইনি,’ ফিসফিস করে বলল র‍্যাট। ‘তুমি সেটা জানো। তোমাদের বেশিরভাগই বেহালায় জন্মেছে। কিন্তু আমি এসেছি দক্ষিণ থেকে। প্রায় এক বছর সেন্ট্রাল স্টেশনে ছিলাম আমি। সেখানেই মিশন স্কুলের কথা জানতে পারি, তারপর চলে আসি এখানে।’

আবার মাথা ঝাঁকালাম আমি। চুপ করে রইল র‍্যাট, যেন এরপর কি বলবে ঠিক করে উঠতে পারছে না।

‘আমি বাড়ি ফিরে যেতে চাই, রাফায়েল,’ বলল ও। এত নিচু গলায় বলল কথাটা, শুনতেই পেলাম না প্রায়। ‘দ্বীপ থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম আমি, কিন্তু আবার ফিরে যেতে চাই সেখানে।’

‘তোমার বাড়ি কোথায়?’

‘সামপালো। ওখানেই জন্ম আমার।’

‘ফিরে যাও তাহলে,’ বললাম আমি। ‘দুই হাজার দিয়ে নিশ্চয়ই ফিরে যেতে পারবে? ফেরির ভাড়া কত আর হবে?’

বিরক্তিসূচক একটা শব্দ বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে। চুপ করে গেলাম আমি।

‘ফেরিতে করে বাড়িতে ফিরতে পারব আমি, অবশ্যই। কালই ফিরে যেতে পারি চাইলে। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর? টিকেটের দামই পড়বে এক হাজার পেসো। তারপর? সামপালোর মানুষজন কি সেরা সাগরতীরের বালি খেয়ে বেঁচে থাকে বলে তোমার ধারণা? সে জন্মেই সবাই এখানে চলে আসে, রাফায়েল, আমিও সে জন্মই এসেছিলাম। আমাকে সে জন্মই পাঠানো হয়েছে এখানে! টাকা জোগাড় করতে হবে আমাকে। পঞ্চাশ হাজার। তারপর আমি নৌকা কিনতে পারব, বাড়ি ফিরে গিয়ে সারা জীবন মাছ ধরে কাটিয়ে দেবো।’

‘তুমি মাছ ধরতে পারো?’

‘অবশ্যই পারি! কথা বলতে শেখার আগে মাছ ধরতে শিখেছি আমি।’

হামাগুড়ি দিতে শেখার আগেই সাঁতার কাটতে শিখেছি! একটা নৌকা কিনব, তারপর শুধু মাছ ধরব আর মাছ ধরব।’

র্যাটের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। কি দৃঢ় শোনাল ওর গলা-বড় বড় চোখগুলো গভীর বিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ওকে সেই সামপালো দ্বীপে কল্পনা করতে চাইলাম একবার, নিজের মাছধরা নৌকাটা চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, জাল ফেলছে সাগরে। জায়গাটার কথা শুনেছি আমি, কিন্তু কখনও জানতাম না, ওখানেই র্যাটের বাড়ি। লোকজন এই জায়গার কথা বলে মাঝে মাঝে। আমি জানি যে জায়গাটা অনেক দূরে। ওখানে যাওয়ার পরে চোখে পানি চলে আসে, আর ফেরার সময়ও চোখে পানি চলে আসে-এমনটাই বলে সবাই।

‘ওখানে গেলে আমি নৌকায় মাছ ধরতে পারব,’ বলল র্যাট। ‘এখানে আমরা যা করি তার চাইতে অনেক ভালো হবে সেটা, তাই না? সৈকতে ছোট্ট একটা বাড়ি-কেমন লাগছে শুনতে?’ তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকাল ও। ‘একটা মাছধরা নৌকা? এই দুর্গন্ধময়, বিস্তীর্ণ জীবন আর কাটাতে হবে না। তুমি, আমি, গার্দো-চলে যাব ওখানে। সূর্য ওঠার আগেই বেরিয়ে পড়ব সাগরে। দরকার হলে সারা রাত কাটিয়ে দেবো সেখানে। ভেবে দেখো।’

‘আমি তো মাছ ধরতে পারি না,’ বললাম আমি।

‘তো কি হয়েছে?’ বলল র্যাট। ‘আমি শিখিয়ে দেবো তোমাকে। যা খেতে ইচ্ছে করবে রান্না করে নেবে, বাকিটা বিক্রি করে দেবে স্থানীয় বাজারে। ফুলের চাষ করবে। আমার একটা বোন ছিল, বালিতেও ফুল চাষ করতে পারত। শুনতে ভালো লাগছে না?’

‘আরও টাকা লাগবে আমাদের,’ বললাম আমি। ‘একটানা নয়, তিনটে নৌকা কিনতে হবে।’

‘হ্যাঁ,’ বলল র্যাট। ‘হয়তো তাই। কিন্তু...’

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল ও, গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। ‘যাই হোক না কেন, এখানে তো বেশি দিন থাকতে পারছি না আমরা। তাই না?’

হালকা আঙুলে আমার গাল স্পর্শ করল ও।

‘জানি না,’ বললাম আমি। ‘হয়তো অপেক্ষা করে দেখতে হবে সামনে কি হয়।’

‘এখানে থাকতে পারবে না তুমি, রাফায়েল। সারাক্ষণই তোমার মনে হবে যে তোমাকে ধরার জন্য ফিরে এল ওরা।’

এখনও ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে আমার চেহারা, তবে ধীরে ধীরে শুকিয়ে আসছে ক্ষতগুলো। জানালা দিয়ে আমাকে ঝুলিয়ে ধরার সময় পাঁজরে ব্যথা পেয়েছিলাম, এখনও সম্পূর্ণ কমেনি। প্রতিবার সেখানে স্পর্শ করার সাথে সাথে অসুস্থ বোধ করি। তাই, র্যাটের কথার অর্থ বুঝতে অসুবিধে হলো না আমার। কিন্তু ব্যাপারটা ও কিভাবে বুঝল আমার জানা নেই। পুলিশের সাথে ওই সময়টুকু কাটানোর পর সব যেন বদলে গেছে, এমনকি মানুষগুলোও—কেমন যেন অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে সবাই, যেন দুর্ভাগ্য বয়ে আনছি আমি। আমাকে নিরাপদে ফিরে আসতে দেখে সবাই খুশি হয়েছে, কিন্তু...আমার আন্টি এখন ভয় পাচ্ছে, আমিও ভয় পাচ্ছি। আরও একটা কথা আছে যেটা কখনও র্যাটকে বলিনি আমি, কারণ সেটা আমার জন্য লজ্জার ব্যাপার।

ঘুম।

ঘুমাতে দারুণ কষ্ট হয় আমার। দুঃস্বপ্ন দেখি, চিৎকার করে জেগে উঠি বারবার। সত্যি কথাটাই বলে দিই—মাঝে মাঝে এমনকি বিছানাও ভিজিয়ে ফেলি। ঘুম থেকে উঠে দেখি আমাকে শিশুর মতো জড়িয়ে ধরে রেখেছে গার্দো, ভয় পেয়ে জেগে উঠেছে আমার কাজিনরা। প্রতিবেশীরা বাড়ি দিচ্ছে দেয়ালে, কারণ খুব বেশি চিৎকার করছিলাম আমি।

আমার ধারণা, আন্টি আর চায় না আমি থাকি এখানে। এ নিয়ে কি করা যায় সেটাও জানা নেই আমার।

জুন-জুন, ওরফে র্যাট বলছি। আমার গল্পটা মুখে বলছি আমি, আর সেটা লিখে নেয়া হচ্ছে।

বেহালা থেকে একটা বাস ধরে শহরের বিশাল বাস স্টেশনটায় চলে এলাম আমরা। রাফায়েলই সব জায়গায় কথা বলল। ওর চেহারা এখনও বেশ ক্ষতবিক্ষত, ঠিক। কিন্তু যখন আমার মতো চেহারার কেউ এগিয়ে যায়, এমনকি বাসেও উঠতে দেয়া হয় না তাকে, একা থাকলে তো আরও নয়। সবাই এমনভাবে খেদিয়ে দেয় যেন আমি একটা অভিশাপ। তাই আমার সামনে রইল রাফায়েল, আর ওর পেছনে রইলাম আমি। একদম বাসের পেছনে চলে গেলাম আমরা।

অবশ্য, বাস স্ট্যাণ্ডে যাওয়ার পর আবিষ্কার করলাম যে জাপান্টার বাড়িতে যাওয়ার জন্য যে বাস দরকার হবে সেটা ছাড়ে আরেক জায়গা থেকে। তাই মাইল দুয়েক দৌড়াতে হলো আমাদের, তারপর বড় একটা লাল রঙের বাসে উঠে পড়লাম। ব্রিজের উপর দিয়ে, ব্রিজের নিচ দিয়ে এগিয়ে চলল বাস। জানালার পাশে বসলাম আমি, বাইরে তাকিয়ে দেখলাম ছোটখাট শহরের সমান এক একটা শপিং মল চলে যাচ্ছে রাস্তার পাশ দিয়ে, একটা বড় স্টেডিয়ামও দেখা গেল। খুব শীঘ্রই হয়তো বক্সিং ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে, কারণ খেলোয়াড়দের বিশাল সব ছবি ঝুলছে স্টেডিয়ামের পাশ থেকে, দানবের মতো হাসছে তারা নিচের চলমান জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে। লোকজন বাসে উঠছে, নামছে, আর টিকেট বয় বাসের গায়ে হাত দিয়ে বাড়ি দিয়ে চিৎকার করছে। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই শহরের সীমানা ছাড়িয়ে বেরিয়ে এলাম আমরা, এগিয়ে চললাম ফল স্ট্রেন্ডের মধ্য দিয়ে। একটা পাহাড়ের মাথায় উঠতে হলো আমাদের, আরও একটা উপত্যকায় নেমে এল বাস। এত দূরে চলে আসতে পেরে খুব ভালো লাগছিল আমার। রাফায়েলও দেখলাম বেশ আনন্দে আছে। গান গাইছিল আমরা, আমাদের সামনের সিটে বসা একটা মিষ্টি বাচ্চার সাথে খেলছিলাম সেই সাথে। সমুদ্রও দেখা যাচ্ছিল রাস্তার পাশে, কারণ গ্রিন হিল্‌স জায়গাটা

সমুদ্রের তীরেই অবস্থিত। ধনীরা সবাই সাগর খুব পছন্দ করে, তাই না? আর বেহালা নামের ওই ময়লার ভাগাড়ের চাইতে এখানকার বাতাস যে অনেক সুগন্ধী, সে কথাও বলার অপেক্ষা রাখে না।

বিশাল একসারি গেটের পাশে বাস থামাল ড্রাইভার, শিষ দিল আমাদের লক্ষ্য করে।

লোকজন আমাদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। সবার উদ্দেশ্যে গুডবাই জানালাম আমি, এমনকি হাতও মেলালাম কয়েকজনের সাথে। ওরা নিশ্চয়ই ভেবেছিল, আমি বোধহয় পাগল গোছের কিছু একটা হবো, তাই ওরাও হাসল আমার সাথে হাত মেলানোর সময়। হাসতে হাসতেই বাস থেকে নেমে এলাম আমরা। কোথাও না থেমে সামনে এগিয়ে যাওয়াই ঠিক হবে, তবে তার আগে বিশাল গেটটার দিকে একবার ভালো করে দেখে নিতে ভুললাম না। রাফায়েলকে এখানে থামতে দেয়া যাবে না, কারণ সব কিছু দেখেই ভয় পাচ্ছিল ও। এখন যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে গার্দো ওর হুকটা দিয়ে আমার মাথাটাই কেটে ফেলবে, আমি নিশ্চিত।

গেটের দু-পাশে দাঁড়ানো দুই গার্ড তীক্ষ্ণ চোখে চাইল আমাদের দিকে। সতর্ক হয়ে উঠল রাফায়েল, বুঝতে পারলাম আমি। প্রায় সাথে সাথেই ওর হাত ধরে সরে এলাম জায়গাটা থেকে। ভেতরে আরও এক গার্ড চোখে পড়ল, সাথে কুকুর। এছাড়া মেশিন গানসহ আরও দুজন। ড্রাইভওয়ে ধরে এগিয়ে যেতে চাওয়া গাড়িগুলোকে আটকানোর জন্য রয়েছে দুটো বড় পোল, সেই সাথে রাস্তার উপরেও রয়েছে কাঁটা বা স্পাইক। অনেক দূর চলে গেছে রাস্তাটা। গাছপালা, আর ঘাসে ছাওয়া জমি—সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে যেন মি. ভাইস প্রেসিডেন্ট স্বর্গের একটা টুকরো কিনে নিয়েছেন, তারপর এই গার্ডগুলোকে বসিয়ে দিয়েছেন যেন আর কেউ ভেতরে ঢুকতে না পারে সেটা নিশ্চিত করার জন্য। দৌড়াতে শুরু করলাম আমরা, হাসছি—যেন স্রেফ মজা করতে বের হওয়া দুটো ছেলে, যাদের দেখে কেউ কিছু সন্দেহ করে না—আর দেয়ালের পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম সামনে। আরও একটা গেটের কাছে চলে এলাম বেশ তাড়াতাড়িই, আগেরটার মতোই বড়; ধাতব দরজাগুলো বন্ধ করা ভেতর থেকে—আর এটার সামনেও না থেমে আরও এগিয়ে যেতে লাগলাম। আমার ধারণা ছিল, ভেতরে নিশ্চয়ই ক্যামেরা থাকবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেবল গেটগুলো ছাড়া আর কোথাও কোনো ক্যামেরা দেখিনি। তাই একটু আশা পেলাম।

মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছি যে ইচ্ছা করলে ভেতরে ঢুকতে সমস্যা হবে না আমাদের, কোনো একটা গাছে উঠেই করতে পারব কাজটা। তবে বাড়ির কত কাছাকাছি যেতে পারব সেটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।

কিন্তু এখানে এলে কেন হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হবে? কে জানে, হয়তো বাড়িটা আগুন ধরে পুড়ে গেছে, আর মোটা সিনেটর সেই আগুনে পুড়ে মরেছে? দেখার মতো একটা ব্যাপার হয়েছে নিঃসন্দেহে। যাই হোক, এই সময় হঠাৎ থমকে দাঁড়াল রাফায়েল। হাঁপাচ্ছে। আমাকে টেনে ধরে থামাল, জিজ্ঞেস করল, ‘কাজটা বোকার মতো হয়ে যাচ্ছে না?’

‘কি?’ ভান করলাম যেন বুঝতে পারিনি। আবারও সামনে নিয়ে যেতে চাইলাম ওকে।

‘কাজটা কি ঠিক হচ্ছে? র্যাট, যদি কেউ আমাকে দেখে ফেলে...’

ওর কাঁধে হাত রেখে একপাশে নিয়ে গেলাম আমি। ‘কে দেখে ফেলবে তোমাকে?’ প্রশ্ন করলাম। ‘এখন তুমি এই কথা বলছ? আমার টাকা খরচ করে এখানে আসার পর বলছ বাড়ি ফিরে যেতে চাও?’

‘আমি শুধু ভাবছি...’ নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে রাফায়েল, কিন্তু ঘামছে প্রচণ্ড পরিমাণে। ‘ভেতরে ঢুকে কি দেখব আমরা? ঢুকলেই তো আমাদের ধাওয়া করে বের করে দেবে ওরা, হয়তো মারও লাগাবে...’

‘এর আগেও ধাওয়া খেয়েছি আমরা, রাফায়েল। ওরা ধরতে পারবে না আমাদের।’

‘এটা কিন্তু অনেক বড় ব্যাপার। ওই কুকুরটা কত বড়, দেখেছ?’

‘ওগুলো শুধু দেখানোর জন্য। এমনিতে ওগুলো আলসের ধাড়ি...’

‘জায়গাটা তো দেখলামই,’ বলল রাফায়েল। ‘এখন তো বোঝা যাচ্ছে এটা কি ধরনের জায়গা!’

একটা গাছের দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। রাফায়েলকে থামতে দেয়া যাবে না, কে যেন বলছে আমার ভেতর থেকে। তাই ওকেও টেনে নিয়ে চললাম আমার সাথে।

‘আমাকে অনুসরণ করো,’ বললাম আমি। ‘তোমার সাহস আমার চাইতে অনেক বেশি। আমরা অবশ্যই পারব!’

গাছের উপর উঠে পড়লাম আমি। রাফায়েলও পিছু নিল আমার। একটু পরেই গাছের ঘন পাতার আড়াল থেকে দেখতে পেলাম প্রাচীরের ভেতরের অংশ। বাইবেলের গল্প জানি আমি, মনে হলো যেন ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত

দেশের দিকে মুসা বোধহয় এভাবেই তাকিয়েছিল। সরু একটা ডাল ধরে প্রাচীরের এপাশে চলে এলাম আমরা, তারপর আলতো করে লাফিয়ে পড়লাম ঘাসের উপর। এক গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েই দৌড়াতে শুরু করলাম একটা গাছের জটলার দিকে। সেগুলো পার হতে ছোট একটা পুকুর পড়ল। পুকুরের অপর পাশে আসতে দেখলাম সামনে একটা গলফ কোর্স, সুন্দর করে ছাটা ঘাসে ছাওয়া মাঠ। পতাকা দিয়ে সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে, বাচ্চাদের জন্য খেলার জায়গাও আছে একটা। আশেপাশে কেউ নেই, শুধু স্প্রিংকলারগুলো ঘুরে ঘুরে পানি ছিটিয়ে যাচ্ছে। মাথা নিচু করে রেখেছি আমরা, সব সময় চেষ্টা করছি আড়ালে আড়ালে থাকার। কিন্তু কোনো জনমানুষ চোখে পড়ল না।

একটু পরেই এক সারি বিশাল গাছের আড়ালে চলে এলাম আমরা। গাছের ডালগুলো নিচু হয়ে ঘাস স্পর্শ করেছে। জায়গাটা ঠাণ্ডা, আর নির্জন-কেউ দেখতে পাচ্ছে না আমাদের। সেগুলোর উল্টো দিকে চলে এলাম আমরা, আর অবশেষে বাড়িটা চোখে পড়ল।

রাফায়েল বলে উঠল, ‘বাপ রে!’

আমি শুধু তাকিয়ে রইলাম, ভাষা হারিয়ে ফেলেছি।

‘কতজন মানুষ থাকে ওখানে?’ প্রশ্ন করল রাফায়েল।

হেসে উঠলাম আমি। কিছুক্ষণ হেসে নিয়ে বললাম, ‘আমার কি মনে হয় জানো? ওখানে লোকটা একাই থাকে। সারা দিন ঘুরে বেড়ায় বাড়ির মধ্যে, নিজের টাকা পাহারা দেয়। ভয়ে ভয়ে থাকে, এই বুঝি কেউ তার টাকা চুরি করতে এল!’

‘কতটা বড়লোক হতে হয় এমন একটা বাড়ি বানাতে?’ প্রশ্ন করল রাফায়েল। ‘কত বড় বাড়ি...’

‘টাওয়ারগুলো দেখেছ? মনে হচ্ছে যেন রূপকথা’র গল্প থেকে উঠে আসা একটা দুর্গ।’

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছিলাম শুধু আমি, কারণ এর আগে কখনও এমন কিছু দেখিনি আমি। লোকটা একটা ভালো জায়গা বেছেছে, এটা স্বীকার করতেই হবে। এই এলাকার সবচেয়ে সুন্দর জঙ্গলটুকু কিনে নিয়েছে, তারপর যেখানে ঘাস গজিয়েছে সুন্দর, নরম হয়ে; সেইখানটায় নিজের জন্য বানিয়েছে এক প্রাসাদ। সাদা আর কালো কাঠের তৈরি, এতগুলো জানালা যে সেগুলো পরিষ্কার করা তো দূরে থাক, গুনে শেষ

করতেই হাঁপ ধরে যাবে। একটার উপর আরেকটা সাজানো, আর প্রাসাদের ঠিক মাঝখানে একটা সোনালি গম্বুজ-সূর্যের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে তাতে। যেন মাঝপথে মিস্ত্রিরা ঠিক করেছিল, তাদের আসলে একটা ক্যাথেড্রাল বানানোর চেষ্টা করা উচিত, তাই এভাবে প্রাসাদটা বানিয়েছিল তারা। প্রতিটা কোণে দাঁড়িয়ে আছে একটা করে টাওয়ার, তার উপর গর্বিত ভঙ্গিতে উড়ছে আমাদের দেশের পতাকা। সব জায়গায় ছোট ছোট মূর্তি আর ভাস্কর্য। একটা বিরাট ফোয়ারাও আছে বাড়ির সামনে, পানি ছুঁড়ে মারছে আকাশের দিকে। এমনকি এই শুকনো মৌসুমেও তার বিরাম নেই, যদিও দেখার মতো কেউ নেই এখন-আমরা ছাড়া।

হঠাৎ করে ড্রাইভওয়ে ধরে একটা পুলিশ কার এগিয়ে আসতে দেখা গেল। তারপর, হঠাৎ করেই আমাদের পেছন থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠস্বর : ‘তোমরা এখানে কি করছ, ছেলেরা?’

চমকে উঠে ঘুরে তাকালাম আমি। কিন্তু বেচারা রাফায়েল-সরাসরি দৌড় দিল ও। ঘাসের মধ্যে কিছু দূর দৌড়ে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, বুঝতে পারছে না কি করবে। তবে আমি নিজের জায়গা ছেড়ে নড়লাম না, চিৎকার করে ডাক দিলাম ওকে, ‘থামো, ভয় নেই!’ কখনও কখনও বিপদের উপস্থিতি বুঝতে মুহূর্তের ভগ্নাংশের বেশি সময় লাগে না। আমি বুঝতে পারছিলাম, আসল বিপদটা হবে যদি রাফায়েলকে ওভাবে খোলা জায়গায় কেউ দেখে ফেলে।

কণ্ঠস্বরটা সম্পূর্ণ শান্ত ছিল।

কথাগুলো যে বলেছে, আমাদের উপর রাগের কোনো চিহ্ন শুনি নি তার গলায়। কাছের একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে সে, আমাদের কাছ থেকে একটুখানি দূরে। তাকে দেখতে পাইনি আমরা। লোকটা যে আমাদের ভয় দেখাতে চায়নি সেটা নিশ্চিত। একদম কুঁজো হয়ে আছে, এমনভাবে মিশে আছে ছায়ার সাথে যে আমাদের ডাক না দিলে আমরা তাকে খেয়ালই করতাম না। হাতে একটা ঘাস কাটার কাচি দেখতে পাচ্ছি, আর মাথায় রোদ থেকে বাঁচার জন্য একটা চওড়া কানিওয়ালা হ্যাট। দেখেই বোঝা যাচ্ছে লোকটা এখানকার মালিদের একজন, আর কেউ নয়। ওর মতো এমন শত শত লোক নিশ্চয়ই কাজ করে এখানে।

একটু শান্ত হয়ে আমার পেছনে ফিরে এল রাফায়েল, তবে এখনও কাঁপছে আর হাঁপাচ্ছে।

‘কি খুঁজছ তোমরা?’ প্রশ্ন করল লোকটা।

‘কিছু খুঁজছি না, স্যার,’ বললাম আমি।

‘আচ্ছা। তাহলে ঘুরতে এসেছ। নাকি হাসতে এসেছ?’

‘হাসির কি আছে এখানে?’ জানতে চাইলাম আমি।

আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসল লোকটা। রাফায়েলকে হাঁপাতে দেখেছে সে। ‘আমি ভেবেছিলাম তোমরা হয়তো আগেই গুনেছ, তাই দেখতে এসেছ এখানে। একটু বসো,’ বলল সে। ‘সিগারেট চলবে? গেটহাউসের গার্ডরা বলছে, অনেক লোকই নাকি আসছে ইদানিং, জানতে চাইছে পেপারে যে সব কথা লেখা হয়েছে সেগুলো সত্যি কিনা।’

‘আমরা ঘুরতে এসেছি শুধু,’ বললাম আমি। ‘কি লিখেছে পেপারে?’

আবার হাসল লোকটা, মাথা থেকে খুলে হাতে নিল হ্যাট। অসংখ্য ভাঁজ পড়েছে তার মুখে, মনে হচ্ছে যেন গুকনো ফল। রোদে পোড়া চামড়া। দেখেই বোঝা যায় অনেক বয়স। বৃকের গভীর থেকে একটা হাসি উঠে এল তার মুখে, হাসতে হাসতে কাশিতে বদলে গেল সেটা। পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরাল সে, তারপর বাকি সিগারেটগুলো এগিয়ে দিল আমাদের দিকে।

‘সব পেপারে অবশ্য লেখেনি,’ বলল সে। ‘তবে কেউই নিশ্চিত করে কিছু জানে না। স্বীকার করতে চায় না কেউ, আমার অন্তত তাই ধারণা। কিন্তু পুলিশের গাড়িগুলো কেন আসছে তাহলে? সেটাই সবাই জানতে চাইছে।’

‘কেন আসছে ওরা?’ একটা সিগারেট নিয়ে জানতে চাইলাম আমি।

‘গুনে দেখেছ? আজ কতগুলো এসেছে?’

‘সাত,’ হাত দিয়ে চোখের উপর থেকে রোদ আড়াল করে জবাব দিলাম আমি। ঝর্ণার চারপাশে সাতটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

‘গতকাল এসেছিল বারোটা। তার আগের দিন...ষোলটা। প্রেসিডেন্ট নিজেও এসেছিলেন। একটা হেলিকপ্টার নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল তাকে।’

আবার হাসতে শুরু করল বুড়ো লোকটা। রাফায়েলের দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিলাম আমি, তারপর ছায়ার মধ্যে বসলাম।

‘ওই পুলিশগুলো কেন এসেছে এখানে, বলতে পারব না। বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা। যদিও সব তো শেষ, আমি যত দূর বুঝতে পারছি-খেল খতম, এখন আর কিছু করার নেই। ঘুরে ফিরে সবাইকে ওই

একই প্রশ্নগুলো আবার জিজ্ঞেস করছে ওরা। এখানে কে থাকে, তোমরা নিশ্চয়ই জানো-জানো না? কার বাড়িতে এসেছ তোমরা, জানা আছে?’

‘হ্যাঁ,’ বললাম আমি। ‘সিনেটরের বাড়ি এটা।’

আরও চওড়া হলো মালির হাসিটা। ‘বাইশ বছর ধরে এখানে কাজ করছি আমি, তার মধ্যে সিনেটরের সাথে কথা হয়েছে স্রেফ দুই বার। প্রথমবার বলেছিলাম, “হ্যাঁ, স্যার,” আর দ্বিতীয়বার-“ধন্যবাদ, স্যার।” তার চাইতে মোটা লোক আর দেখিনি আমি। শুনেছি, তার জন্য নাকি অর্ডার দিয়ে একটা গাড়ি বানাতে হয়েছে। যে পরিমাণ খাবার নষ্ট করে লোকটা, সেগুলো অনায়াসে তিনটে লোকের পেট ভরাতে পারে!’ কাশতে শুরু করল সে, তারপর আরও লম্বা একটা টান দিল সিগারেটে। ‘ভেতরে যেতে পারলে খুব ভালো হতো, বুঝলে? গিয়ে শুনতাম ওরা কি বলাবলি করছে। তবে আন্দাজ করতে পারি কথাগুলো, খুব একটা কঠিন কিছু নয়।’

‘কি ব্যাপারে?’ জানতে চাইলাম আমি। ‘কী হচ্ছে ওখানে, স্যার?’

‘খুব পরিশ্রম করছে ওরা, সব কিছু ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছে। সিনেটরের সম্মান রক্ষার চেষ্টা করছে। নিজেকে যাতে বোকা প্রমাণ করতে না হয় সে জন্য সব কিছু করতে রাজি আছে লোকটা।’

আমি কিছুই বললাম না। নিজে থেকেই বলছে যখন, বলুক। সময় হলে সবই জানা যাবে। আমার পেছনেই রয়েছে রাফায়েল। সিগারেটের ধোঁয়া ধীরে ধীরে শান্ত করে আনছে ওকে।

চোখ বন্ধ করল বুড়ো লোকটা, সিগারেটে টান দিল। ‘ভাবতেই ভালো লাগে, বুঝলে,’ বলল সে। ‘পুলিশগুলো সব তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, আর বলছে, “স্যার, আরেকবার বলুন তো? আপনার হাউসবয় কিভাবে আপনার নাকের ডগা দিয়ে ছয় কোটি ডলার নিয়ে বের হয়ে গেছে?”’ এবার বেশ দীর্ঘ সময় ধরে হাসল সে। রাফায়েল আর আমিও তার সাথে যোগ দিলাম।

‘ছয় কোটি ডলার,’ শেষ পর্যন্ত বলল লোকটা। ‘সবার সামনে দিয়ে টাকাগুলো নিয়ে চলে গিয়েছিল সে। কিভাবে করেছিল কাজটা, জানো?’

দুজনেই মাথা নাড়লাম, হাসছি এখনও। বুড়ো লোকটা গল্পটা বলে খুব মজা পাচ্ছে, বোঝাই যায়।

‘এখানে সবাই জানে,’ বলল সে। ‘কিন্তু খবরের কাগজওয়ালারা কিছু জানে না এখনও-পুরো গল্পটা এখনও যায়নি ওদের হাতে। কাজটা করেছিল ওদের বিশ্বাসী ওই ছেলেটাই।’

‘কিভাবে করেছিল সে?’ জিজ্ঞেস করলাম আমি। অনুভব করতে পারছি, আমাকে শক্ত করে ধরে আছে রাফায়েল। মনে হচ্ছে, গল্পের টুকরোগুলো অবশেষে পরস্পরের সাথে জোড়া লাগতে শুরু করেছে। আরও একবার আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যবস্তুর খুব কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা।

‘সবাই বলছে, কাজটা সে করেছিল একটা ফ্রিজ দিয়ে।’

‘কি?’ বলে উঠলাম আমি। ‘ফ্রিজ-মানে রেফ্রিজারেটর? ছয় কোটি ডলারের কথা বললেন না আপনি? কিভাবে...’

‘গার্ডরা এটাই বলছে,’ বলল বৃদ্ধ। ‘এমনকি পরিচারিকাদের একজনও একই কথা বলেছে। ছেলেটার নাম এসেছে পেপারে, কিন্তু সে কি করেছে তা প্রকাশ করা হচ্ছে না। কেন তাকে খুন করা হলো, সে ব্যাপারেও মুখ খুলছে না পুলিশ।’ ঘাসের উপর থুতু ফেলল লোকটা। ‘ছেলেটা ছিল এখানকার হাউসবয়। কত দিন ধরে কাজ করছিল ঠিক মনে নেই-আমার মতো লম্বা সময় নয়, তবে একেবারে কম সময়ও নয়। মাঝে মাঝে কথা হতো ওর সাথে, সিগারেট খেতাম একসাথে। ভালো ছেলে ছিল। কিছু দিন আগে ওকে বলা হয় নতুন একটা ফ্রিজ কিনে আনার জন্য। আগের ফ্রিজটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, আর সিনেটরের তো প্রচুর খাবার দরকার হয়! তাই ছেলেটা নতুন একটা ফ্রিজের অর্ডার দেয়। ডেলিভারিম্যানরা সেটা নিয়ে আসার পর পুরনো ফ্রিজটা তাদের নিয়ে যেতে বলে সে। কারণ, ওটা এখন স্বেচ্ছা আবর্জনা, সিনেটরের কাছে আর কোনো দাম নেই। ডেলিভারিম্যানরাও আপত্তি করেনি, কারণ পুরনো ফ্রিজে কিছু পার্টস থাকে যেগুলো তারা পরে বিক্রি করতে পারে। তাই ফ্রিজটা ট্রাকে তোলেন তারা, আর আমাদের এই ছেলেটাও ট্রাকে উঠে পড়ে তাদের সাথে গेट দিয়ে বের হওয়ার সময় গার্ডদের সাথে কয়েকটা কথাও হয় তার, হাসিঠাট্টা করে। সব কিছুই দেখা গেছে ক্যামেরায়। ফ্রিজটা ট্রাকের সাথে বাঁধা ছিল দড়ি দিয়ে। কিন্তু গेट দিয়ে বের হওয়ার পরে সে ট্রাক থেকে নামেনি, বলে যে একটা শর্ট কাট রাস্তা দেখিয়ে দেবে ওদের। এভাবে পুরো পথটা ট্রাকেই থেকে যায় সে। পরে ওদের জানায় যে ফ্রিজটা সে নিজেই রেখে দিতে চায়, তার কি একটা কাজে নাকি দরকার। তারপর ওদের দুই হাজার পেসো ধরিয়ে দেয়, আর তার কথামতো ফ্রিজটা এক জায়গায় নামিয়ে দেয় লোকগুলো। দুই হাজার পেসো বেশ বড় অংকের টাকা, ফলে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজনবোধ করেনি। বলেছে, কোন একটা কবরস্থানে নাকি

নামিয়ে দিয়েছিল ফ্রিজটা। সেখানেই সব কিছু শেষ-আর সামনে এগোতে পারেনি পুলিশ। ছেলেটাকেও আর কখনও দেখা যায়নি।’

‘টাকাগুলো ফ্রিজের ভেতর রেখেছিল সে?’

আবার হাসতে শুরু করল বুড়ো মালি। ‘সবাই সেটাই ভাবছে। একটা ভাঙা ফ্রিজের ভেতর ছয় কোটি ডলার!’

বাড়িটার দিকে, আর পুলিশ কারগুলোর দিকে তাকিয়ে একবার মাথা ঝাঁকাল সে।

‘খালি খালিই দাঁড়িয়ে আছে ওরা, বাজি ধরে বলতে পারি। কারও কোনো ধারণা নেই, টাকাগুলো কোথায় থাকতে পারে। সাবাস, ছেলে! ওর সাথে হাত মেলাতে পারলে খুব ভালো লাগত আমার।’

হাসিটা মুছে গেল তার মুখ থেকে।

‘জানি না। খবরের কাগজে কিছু লেখেনি।’ সিগারেটটা ঘাসের উপর ছুঁড়ে ফেলল সে। ‘অবশ্য ওর একটা ছোট্ট মেয়ে ছিল, এটা জানি। হয়তো ওর মেয়ের মাধ্যমেই ধরেছে।’

প্রথমবারের মতো মুখ খুলল রাফায়েল। ‘তার নাম ছিল হোসে অ্যাঞ্জেলিকো, তাই না?’ প্রশ্ন করল ও।

মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল বৃদ্ধ। তারপর মাথা ঝাঁকাল। ‘তুমিও পড়েছ তাহলে খবরগুলো, তাই না? ফ্রিজটা পাওয়া গেছে, জানো? কিন্তু টাকাগুলো ছিল না ভেতরে। আমি মনে মনে কি আশা করছি জানো, ছেলেরা? ধরা পড়ার আগে টাকাগুলো গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে গেছে হোসে। কারণ, ওই সিনেটর কুত্তার বাচ্চাটা বহু বছর ধরে মানুষের টাকা চুরি করে আসছে। আমার কাছ থেকে, তোমাদের কাছ থেকে-বিশ্বাস হয় কথাটা?’

মাথা নাড়তে লাগল লোকটা।

‘ভাইস প্রেসিডেন্ট,’ বলে আবার থুতু ফেলল ঘাসের উপর। ‘আমি প্রার্থনা করি, ওই টাকার একটা সামান্য অংশও যেন কখনও ফিরে না পায় সে। প্রার্থনা করি, টাকার শোকে যেন হার্ট ফেল করে মারা যায় হারামজাদা।’

অলিভিয়ার গল্প-শেষ অংশ।

‘হোসে অ্যাঞ্জেলিকো ছিল আমার নাতি,’ বলল বৃদ্ধ।

কাপটা আবার তার মুখে ধরল গার্দো। পানি খেল বৃদ্ধ, তারপর চোখ মুছল।

একটু হাসল সে। ‘অনেক নাতি নাতনি ছিল আমার,’ বলল সে। ‘কেন, জানতে চান? কারণ, দান্তে-মানে আমার ছেলে, দান্তে জেরোম-ও তেরো জন ছেলে, আর উনিশটা মেয়েকে দত্তক নিয়েছিল।’ হাসল সে আবার, তবে ক্লান্ত দেখাল হাসিটা। ‘ব্যাপারটা অসম্ভব শোনাচ্ছে, আমি জানি। কিন্তু তখন একটা সরকারী প্রোগ্রাম চলছিল। প্রায় ট্যাক্সি ডাকার মতোই সহজভাবে ছেলেমেয়েদের দত্তক নেয়া যেত তখন। দান্তে একটা স্কুল খুলেছিল-আপনি যে স্কুলে কাজ করেন, হয়তো তেমনই ছিল স্কুলটা। ওর নিজের ছেলেমেয়ে ছিল চারজন, আর ও বুঝতে পেরেছিল যে নিজের কাছে দত্তক নেয়াই সবচেয়ে নিরাপদ। প্রতিবার ওর সাথে দেখা হওয়ার পর আমি বলতাম...’ থেমে গেল তার কথা। ‘ওহ,’ বলে মাথা চুলকাল সে। ‘ছোট্ট হোসে, ছোট্ট হোসে...এমনভাবে যেন কাউকে মরতে না হয়।’

আবারও নিজের ভাষায় কিছু বলল গার্দো।

গুণ্ডিয়ে উঠল বৃদ্ধ, দম নেয়ার জন্য কষ্ট করল বেশ কিছুক্ষণ। অপেক্ষা করলাম আমরা।

‘হোসে ছিল আমাদের সবচেয়ে প্রিয়। অন্যদের চাইতে কড়িবে বেশি প্রিয় ভাবা ঠিক নয়, জানি। কিন্তু হোসে অ্যাঞ্জেলিকো...এই মিষ্টি ছিল ও! বুদ্ধিমানও ছিল খুব। কখনও ঘুমাত না প্রায়, শুধু কাজ করত। “আমি ডাক্তার হবো,” বলতো ও। অনেকেই তাই বলত। কিন্তু...ওহ, কিছু সময়ের জন্য আমরা ভেবেছিলাম সত্যিই তাই হবে। অলিভিয়া, আপনার কাছে কি অর্থহীন শোনাচ্ছে সব কথা?’

‘না,’ মাথা নেড়ে বললাম আমি। কথাটা মিথ্যা, কারণ আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থ বোধ করছিলাম।

‘ওহ, গার্দো,’ ছেলেটার দিকে ফিরে বলল বৃদ্ধ। ‘তুমি তো চিঠিটা আনোনি। ওতে কি বিপজ্জনক কিছু লেখা আছে?’

‘আমাদের তাই ধারণা,’ বলল গার্দো। ‘আমরা ভেবেছিলাম পুলিশ চিঠিটা কেড়ে নিতে পারে। আমার বন্ধুকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ওরা, এমন কিছু যে ওরা খুঁজছে তা আমরা জানি।’

‘ওর মেয়ের কি খবর? পিয়া দাস্তে কোথায়?’

‘আমরা জানি না, স্যার।’

‘কেউ রইল না ওর।’ কিছু সময়ের জন্য চিন্তায় ডুবে রইল লোকটা, তারপর আমাকে বলল, ‘প্রতি বছর আমার কাছে চিঠি লিখত হোসে। আমার জন্মদিনে, আর ক্রিসমাসের সময়। কখনও বলত ডাক্তার হবে, কখনও আবার উকিল। দাস্তে ঠিকই টাকার ব্যবস্থা করে ফেলত-অনেক রাস্তা ছিল ওর টাকা আয় করার! যে ছেলেগুলোকে ও কলেজে পড়িয়েছিল, তারা খুব চালাক ছিল। কিন্তু ছোট্ট হোসে...’ চোখ মুছল সে আবার। ‘এখন আর ছোট বলা যাবে না ওকে। গত বছর ওর সাথে দেখা হয়েছিল আমার, পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষ হয়ে উঠেছে তখন। ওর মেয়েকে নিয়ে এসেছিল আমার কাছে। আমি ওর মেয়ের ধর্মপিতাও বটে। ওহ...’ চোখ মুছল বৃদ্ধ। ‘পড়ালেখা ছেড়ে দিয়েছিল অনেক আগেই, হাউসবয় হিসেবে কাজ করত। অন্য অনেক কাজের চাইতে অন্তত ভাল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই আমার। তবুও, ওকে দিয়ে আরও ভালো কিছু আশা করেছিলাম আমরা...হয়তো ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিল ও।’

‘ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিল মানে?’ প্রশ্ন করলাম আমি।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল বৃদ্ধ। তারপর বলল, ‘সারা জীবন অপেক্ষা করে থাকা যায় না। অথচ কখনও কখনও তাই করতে হয় আমাদের, সারা জীবন ধরে ধর্না দিতে হয় দুয়ারে দুয়ারে। হোসে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিল, উচ্চাকাঙ্ক্ষা হারিয়ে ফেলেছিল। স্কুল ছেড়ে দিয়েছিল। কোথায় কাজ করছিল তা আমাকে বলত না কখনও। ছেলে,’ গার্দোর দিকে তাকিয়ে বলল সে। ‘এই কাজটা আমাদের করতেই হবে। আমি সন্তুষ্ট ক্লান্ত।’

‘হ্যাঁ, স্যার,’ বলল গার্দো।

‘তুমি জানতে চাইছিলে কাজ শেষ হয়েছে-এর মানে কি। এটা চিঠিতে ছিল? সত্যি কথা বলবে।’

‘হ্যাঁ।’

‘ও কি বলেছিল তা কি সম্পূর্ণ মনে আছে তোমার?’ এ জন্যই কি এখানে এসেছ তুমি?’

‘স্যার,’ বলল গার্দো। ‘পুরো চিঠিটা মুখস্ত করে এসেছি আমি। আপনি চাইলে...’ দরজার দিকে তাকাল সে একবার। ‘আপনাকে শোনাতে পারি সেটা।’

আমরা দুজনই তাকালাম ওর দিকে। ‘পুরো চিঠিটা মুখস্ত করে ফেলছ তুমি?’ প্রশ্ন করল বৃদ্ধ। ‘সবটুকু?’

মাথা ঝাঁকাল গার্দো। হেসে বলল, ‘খুব বেশি বড় নয় চিঠিটা।’

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল বৃদ্ধ। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল গার্দো।

‘বলো।’

সোজা হয়ে দাঁড়াল গার্দো। দুই হাত পেছনে বাঁধা, দেখে মনে হলো যেন ক্লাসরুমে দাঁড়িয়ে কবিতা আবৃত্তি করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

‘কয়েদি নাম্বার ৭৪৬২২৯-এর প্রতি,’ বলল ও। ‘সেল ব্লক ৩৪কে, সাউথ উইং, কোলভা জেলখানা।’ বড় একটা নিঃশ্বাস নিল গার্দো। ‘প্রিয় দাদু। তোমার কাছে শেষ চিঠিটা লেখার পর অনেক দিন কেটে গেছে। কিন্তু তোমার কথা কখনও ভুলিনি আমি। ইদানিং তোমাকে আরও বেশি মনে পড়ে। তুমি জেনে খুশি হবে, তোমার জন্মদিনে অনেকেই এসেছিল। এমন একটা দিনও যায় না যে দিন আমি তোমার কথা ভাবি না, যদিও তোমার সাথে যোগাযোগ করা এখন অনেক কঠিন। বিশেষ করে, দায়িত্বের চাপে যখন আমাকে শহর থেকে দূরে গিয়ে থাকতে হচ্ছে।’

বিরতি নিল গার্দো।

‘তোমার ছেলে, দান্তে জেরোমের কথাও আমি ভাবি, স্মরণ করি। আমার মেয়েকে তার এবং তোমার গল্প বলি আমি। তোমাকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলতে চাই এখন। হতে পারে যে আর কখনও তোমার সাথে দেখা হবে না আমার। আমি তোমাকে বলতে চাই, ফসল-বীজ রোপন করা হয়ে গেছে, তবে তুমি যেভাবে চেয়েছিলে ঠিক সেভাবে নয়। খুব তাড়াতাড়িই ফসল কাটার সময় চলে আসবে, আমি প্রার্থনা করি; কারণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে, সমাপ্ত হয়েছে, সমাপ্ত হয়েছে। তিনবার বললাম কথাটা; যদি পারতাম তাহলে বিরাট ব্যানারের উপর কথাগুলো লিখে ভাসিয়ে দিতাম আকাশে, যাতে দেখতে পাও তুমি। দাদু, কাজ সমাপ্ত হয়েছে আমাদের। দ্রুত চিঠি লিখছি আমি, কারণ কোনো কিছুই নিশ্চিত নয়, আর সব সময়

সাবধান থাকার অনেক কারণ আছে আমার, যেটা তুমি নিজেও আমাকে বহুবার বলেছ। আমি জানি, ওরা আমাকে খুঁজে বের করবে। এই চিঠিটা রাখা থাকবে একটা গোপন জায়গায়, নির্দেশনাসহ। যদি চিঠিটা তোমার হাতে যায়, তাহলে বুঝবে ধরা পড়ে গেছি আমি। আমার মেয়ের খোঁজ করো-তোমার সবটুকু ক্ষমতা কাজে লাগিও। কারণ, পিয়া দান্তের জন্যেও ভয় হচ্ছে আমার। কিন্তু বীজগুলো নিরাপদ, স্যার-আর মন্দিরের পর্দা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে ঠিক মাঝখান থেকে। এখন যদি তুমি জাপান্টার বাড়িতে যাও, আনন্দে নেচে উঠবে তোমার মন।

‘তোমার প্রিয় নাতি, হোসে অ্যাঞ্জেলিকো। তুমি, তোমার স্ত্রী, তোমার সন্তান এবং তাদের স্মৃতির উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমার আলোয় জন্ম নিতে পেরেছি বলে আমরা সবাই গর্বিত।’

গার্দো থামল। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে বৃদ্ধের চেহারা। চোখগুলো বন্ধ, মূর্তির মতো স্থির হয়ে আছে সে। মুখটা হাঁ করে খোলা। একটা মুহূর্তের জন্য মনে হলো হয়তো হার্ট অ্যাটাক হতে যাচ্ছে তার। দেখতে পাচ্ছিলাম, হাপরের মতো উঠছে আর নামছে তার বুক। পানির গ্লাসটা তুলে নিল গার্দো।

‘না,’ বলল বৃদ্ধ। ‘ও যা বলছে তা অসম্ভব।’

‘এই কথাগুলোই লেখা ছিল চিঠিতে, স্যার।’

‘আরও কিছু আছে, তাই না?’ ফিসফিস করে বলল বৃদ্ধ। ‘ও চিঠিতে নির্দেশনার কথা বলেছে।’

‘স্যার?’

অনেক কষ্ট করে যেন চোখ খুলল বৃদ্ধ। রঙ বদলাল তার চেহারা। আবারও ঘামে ভিজে উঠল মুখ। গার্দোর দিকে ফিরে তাকাল সে, হাত বাড়িয়ে দিল তার দিকে। ছেলেটার হাত ধরল নিজের হাতে। ‘আর কিছু কি ছিল? এক টুকরো কাগজের মতো কিছু?’

‘হ্যাঁ, স্যার।’

‘থাকতেই হবে। না থেকে যায়ই না। এনেছ সেটা?’

‘না, তবে মুখস্ত করেছি, কিছুটা অংশ।’

‘কিছুটা অংশ কেন?’

‘কারণ...’

‘কারণ ওটা খুব বড় ছিল? কোনো অর্থই বোঝা যাচ্ছিল না?’

মাথা ঝাঁকাল গার্দো।

‘শুধু সংখ্যা আর বিরামচিহ্ন দিয়ে ভর্তি, তাই না?’

‘হ্যাঁ, স্যার। শুধু সংখ্যা দিয়ে ভর্তি। শুরুটা ছিল এ রকম-৯৪০.৪.১৮.১৩.১৪, তারপর যত দূর মনে পড়ে...৫.৩.৬.৪-আর মনে নেই।’

চুপ করে রইল গার্দো। ফিসফিস করে বলল বৃদ্ধ, ‘এর অর্থ কি তুমি জানো না, গার্দো। নির্দেশনা রয়েছে তোমার হাতে-একটা চাবি রয়েছে। এই সংখ্যাগুলো একটা কোড।’ নিজের ভাষায় কথা বলতে শুরু করল সে, ছটফট করছে চেয়ারে। উঠে দাঁড়াতে চাইছে।

‘চিঠিটা না এনে সঠিক কাজ করেছ তুমি,’ নিচু গলায় বলে উঠল সে। ‘তুমি-তুমি একটা দেবদূত, ছেলে। এক কিশোর, নিষ্পাপ দেবদূত। হোসে আর আমি-সেই সাথে অন্য ছেলেরাও এই কোডটা প্রায়ই ব্যবহার করতাম। একে বলে বুক-কোড, সঠিক বইটা থাকলে যার মর্মোদ্ধার করা খুবই সহজ। এই কোড দিয়ে খেলতাম আমরা, তবে নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজেও ব্যবহার করা হতো। ওই সংখ্যাগুলো দিয়ে একটা বিশেষ পৃষ্ঠার বিশেষ বিশেষ অক্ষরকে বোঝানো হচ্ছে-আমার বাইবেলটা লাগবে। যদি জানা থাকে কোথায় খুঁজতে হবে, আর যদি জানা থাকে নিয়মগুলো...তাহলে এই কোড ভাঙা কোনো ব্যাপারই না।’ আবারও নিজের ভাষায় কথা বলতে শুরু করল সে, টেবিলে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

‘উনি কি বলছেন, গার্দো?’

‘আমার বাইবেলটা লাগবে,’ বলল বৃদ্ধ। ‘বাইবেলটাকেই নির্দিষ্ট বই হিসেবে ব্যবহার করতাম আমরা।’

‘বুঝতে পারছি না আমি,’ বললাম আমি। দরজা খুলে গেল এই সময়; এক গার্ডকে এসে দাঁড়াতে দেখা গেল। আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

‘আপনার বোঝার কথাও নয়। কিভাবে বুঝবেন? এখন কিছু বলতে রাজি নই আমি, অলিভিয়া। ছেলেটার হাতে বাইবেলটা পৌঁছানো খুব জরুরি...ওহ, ঈশ্বর। আমার ধারণা, এর মধ্যেই জানা যাবে যে ফসলের বীজগুলো কোথায় রাখা আছে। যদি হোসে সত্যি বলে থাকে...অবশ্য ও মিথ্যে কথা বলার মানুষ নয়। সত্যি না হলে কথাগুলো এভাবে চিঠিতে লিখত না ও।’

আমাদের দিকে এগিয়ে এল গার্ড, কিন্তু খেয়াল করল না বৃদ্ধ। ‘কাজ

সমাপ্ত হয়েছে-এই কথাটাই ব্যবহার করেছিলাম আমরা-কথাগুলো যিশুর, অনুবাদ করলে এটাই দাঁড়ায় অর্থ। বাইবেল পড়েছেন না? সেন্ট জন অধ্যায়ে, ত্রুশবিদ্ধ করার অংশে বলা আছে : কাজ সমাপ্ত হয়েছে...আর আমরা সেই অর্থটাকে ব্যবহার করেছি যা চুরি হয়ে গিয়েছিল তা আবার ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে-এটা বোঝাতে। সারা জীবন ধরে এই কাজটাই করার চেষ্টা করেছি আমরা। এখন বুঝতে পারছেন?'

এতক্ষণে আমিও যেন অন্ধকারে একটা আলোর রেখা দেখতে শুরু করলাম। বললাম, 'আপনি বলতে চাইছেন যে হোসে কিছু টাকার সন্ধান পেয়ে গিয়েছিল-'

আমাকে থামিয়ে দিয়ে গার্ডের দিকে তাকাল বৃদ্ধ। 'আমার বাইবেলটা লাগবে, এখনই। আমার বিছানার পাশেই আছে।'

গার্ড বলল, 'সাক্ষাতের সময় শেষ হয়ে এসেছে, স্যার।'

'কিন্তু আমার যে বাইবেলটা লাগবে,' আবার বলল বৃদ্ধ।

মাথা ঝাঁকাল গার্ড, কিন্তু নড়ল না জায়গা থেকে। নিজের ভাষায় আবারও কিছু একটা বলল সে।

'প্লিজ,' বলল বৃদ্ধ। 'আমার বন্ধুদের কিছু একটা দিতে চাই আমি। অনেক দূর থেকে এসেছে ওরা।' নিজের ভাষায় আরও কিছু বলল সে, কিন্তু গার্ডের দৃষ্টি নরম হলো না। আবার যখন মুখ খুলল সে, কড়া শোনা তার কণ্ঠস্বর।

আমার দিকে তাকাল বৃদ্ধ। 'এখন ও আমাদের সাহায্য করতে পারবে না,' বলল সে। 'বলছে, সাক্ষাতের সময় শেষ হয়ে গেছে, আর কারাগার থেকে কোনো কিছু বাইরে নিয়ে যাওয়ার নিয়ম নেই। কিন্তু ও পরে আমাদের সাহায্য করবে বলেছে। ওর নাম মার্কো। ও বলছে, এখন চলে যেতে হবে আপনাদের।'

'বাইবেলটা আমরা নিতে পারব না?' গার্ডকে প্রশ্ন করলাম আমি। 'কোথায় ওটা?'

'ও বলছে, ওটা পরে এনে দেবে আপনাদের। ওর নাম মার্কো। আমি ওকে বলেছি যে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ও কথা দিয়েছে আমাকে। তাই না, মার্কো?'

মাথা ঝাঁকাল গার্ড। দশ মিনিট পর গার্ডকে নিয়ে কারাগারের গেটের বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি। অপেক্ষা করলাম আমরা, কিন্তু কাউকে

আসতে দেখা গেল না বাইবেল নিয়ে। গার্ডও ভেতরে চলে গেল। তবে যাওয়ার আগে গার্ডের সাথে নিচু গলায় কথা বলে গেল সে। গার্ডও জবাব দিল, তারপর হাত মেলাল দুজন।

‘ও বলছে, এই মুহূর্তে ওটা এনে দেয়া অসম্ভব,’ বলল গার্ড। ট্যাক্সি খুজছিলাম আমরা। ‘কিন্তু ও নাকি ওটা বেহালায় পৌঁছে দেবে।’

‘কখন?’

‘আমি জানি না।’

‘জানতে চাওনি? কি বললে ওকে? এটা কি...যা ঘটছে তার কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। ও বাইবেলটা আনবে তো?’

‘টাকা চায় লোকটা,’ মৃদু গলায় বলল গার্ড। ‘অনেক টাকা চাইবে বলে আমার ধারণা। তবে আনবে ঠিকই। সব কিছু এখন অনেক বেশি বিপজ্জনক হয়ে গেল, আপনার জন্যেও। আমাদের কথা ফাঁস করে দিতে পারে সে।’

পরদিন সকালে অনেক কিছুই ঘটে গেল। আমার গল্পটাও এখানেই শেষ হতে চলেছে।

জেলখানার হাসপাতালে মারা গেল গ্যাব্রিয়েল ওলোন্ড্রিজ। অনেকগুলো খবরের কাগজে এল তার মৃত্যুসংবাদ। আমার ধারণা, জেলখানার সেই গার্ড-যার কাছে তখন বুড়ো লোকটার বাইবেলটা ছিল-এক মুহূর্তের মধ্যেই বুঝে ফেলেছিল যে এই মুহূর্তে তার কাছে একজন বিখ্যাত ব্যক্তির স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে। যার অর্থ হলো, বাইবেলটার দাম এখন অনেক বেড়ে যাবে। হয়তো বুড়ো লোকটার কিছু কথা আড়ি পেতে শুনেছিল সে, গল্পটার কিছু অংশ বুঝতে পেরেছিল। অথবা কে জানে, বৃদ্ধের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠা তার নজর এড়ায়নি, বুঝতে পেরেছিল যে অনেক টাকার আলোচনা হচ্ছে এখানে।

সেই গার্ডের সাথে কখনও আর দেখা হয়নি আমার, কারণ আমার গল্প এখানেই শেষ হতে যাচ্ছে। সব কিছু খুব দ্রুত ঘটতে শুরু করল। জীবনে কখনও এত ভয় পাইনি আমি।

বাড়ি পৌঁছানোর পর আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী ডিনারে গেলাম আমি, আর এত কিছুর মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরেও বেশ ভালো ঘুম হলো রাতে। তবে পরদিন ভোরবেলা তিনজন পুলিশ এল আমার হোস্টেলে। তাদের সাথে এক পুলিশ স্টেশনে যেতে হলো আমাকে। আমার বন্ধু মি. অলিভা

সব কিছু তার সিকিউরিটি চিফের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল আগেই। গার্দো আর আমার ব্যাপারে কম্পিউটারে খোঁজ নিয়েছিল কেউ একজন। আমার বেহালার ঠিকানা দিয়েছিলাম আমি। ওই ঠিকানা দেখেই নিশ্চয়ই সতর্ক হয়ে যায় ওরা। বেহালার উপর আগে থেকেই নজর রাখা হয়েছিল, তাই ওখানকার যে কোনো অদ্ভুত ঘটনাই পুলিশকে সতর্ক করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

আমার দরজায় তিন পুলিশকে দেখে দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমি-কোনো ধারণাই ছিল না কী করা যেতে পারে। ফাদার জুইলার্ডের কাছে একটা মেসেজ দিয়েছিলাম। সাথে সাথে এসে হাজির হলেন তিনি, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ; এবং আমার বাবার সাথে যোগাযোগ করলেন। পুলিশ আমাকে হুমকি দিল কিছুই তাদের অজানা থাকবে না। ছেলেগুলোকে রক্ষা করার জন্য সম্ভাব্য সব রকম চেষ্টা করলাম আমি, প্রার্থনা করতে লাগলাম যেন আবারও ধরে নিয়ে যাওয়া না হয় ওদের কাউকে। পুরো ঘটনার প্রায় কিছুই যে বুঝতে পারিনি, এটা সম্ভবত আমার সৌভাগ্য। বাইবেলের কথা বলিনি পুলিশকে, বলেছি যে গার্দোর সাথে নিজস্ব ভাষায় কথা বলছিল বৃদ্ধ লোকটা। শুধু এটুকুই বুঝতে পেরেছি, একটা বাড়ি নিয়ে দাদুর সাথে নাতির মধ্যে কথা হচ্ছিল।

আমার বাবার কারণেই বৃটিশ অ্যান্টিসি থেকে চলে এল একজন, আর অত্যন্ত কড়াভাবে দাবি করল যে আমি নির্দোষ, আর কোনো আইনও ভঙ্গ করিনি। বারবার বলতে লাগল সে, আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনার উপায় নেই।

কিছু সময় পর আমাকে ছেড়ে দেয়া হলো। কম্পিউটারে ফিরিয়ে দেয়া হলো। এন্টিসি কর্মকর্তার উপদেশ মেনে নিয়ে ওই একই দিনে প্লেনে করে দেশ ছাড়লাম আমি।

এই আমার গল্প, আর গল্পটা আমাকে বলার সুযোগ দেয়ার জন্য তোমাদের ধন্যবাদ। তোমাদের দেশে আমার হৃদয়ের একটা অংশ রেখে এসেছি আমি, ছেলেরা। এখন আর সেখানে ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই আমার। নিজের কাছে বলি, এই ঘটনা থেকে তুমি কী শিখলে? বেহালার ভাগাড়

থেকে কি শিখলে তুমি, আর তোমার মধ্যে কোন দিকটা বদলে দিল এই ঘটনা?

এমন কিছু জিনিস শিখেছি আমি, যেগুলো সম্ভবত পৃথিবীর কোনো বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে শেখাতে পারত না। আমি শিখেছি যে পৃথিবী আবর্তিত হয় টাকাকে কেন্দ্র করে। মূল্যবোধ, সততা, ন্যায়-এসব জিনিস আছে ঠিক; সম্পর্ক, ভালোবাসা, বিশ্বাস-এসবও আছে-আর এগুলোর সবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু টাকা আরও বেশি গুরুত্বের দাবিদার। মহামূল্যবান পানির মতো ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ে টাকা। কেউ কেউ প্রাণ ভরে পান করে, কেউ রয়ে যায় পিপাসার্ত। টাকা ছাড়া মানুষ পিপাসায় শুকিয়ে মারা যায়। টাকার অভাব যেন এমন এক খরা, যেখানে কিছুই জন্মাতে পারে না। বেহালার মতো চির খরায় আক্রান্ত কোনো জায়গায় থাকলেই কেবল টাকা নামক এই পানির মূল্য বোঝা সম্ভব। এমন এক জায়গা, যেখানে অসংখ্য মানুষ অপেক্ষা করে থাকে বৃষ্টির।

প্রায় কারও কাছেই বিদায় নিতে পারিনি আমি, কখনও আর ফিরেও যেতে পারব না। খুব খারাপ লাগে ভাবলে, মনে হয় অন্যায় হয়েছে আমার সাথে। কারণ, আমি আমার হৃদয়ের একটা অংশ রেখে এসেছি গার্দো, রাফায়েল, আর বিশেষ করে র্যাটের কাছে। এই কাহিনী লিখতে বসে শুধু তোমাদের সাথে একবার দেখা করার ইচ্ছাই আরও জোরালো হয়েছে। ছেলেরা, আমার চোখের পানিতে ভিজে যাচ্ছে লেখার কাগজগুলো।

বিদায় তোমাদের, আর আমার সাহায্য নিয়েছিলে বলে ধন্যবাদ।

অধ্যায় ১

র্যাট, ওরফে জুন-জুন বলছি আবারও। এবার বলব সে অংশটা, যেখানে আমি ছিলাম নেতা। যেখান থেকে গল্পটা খারাপ, রক্তাক্ত এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক দিকে মোড় নিল!

গার্দো ফিরে আসার পরেই ঘটনা ঘটতে শুরু করল। আমি আর রাফায়েল অপেক্ষা করছিলাম ওর জন্য, খালের ধারে। সূর্য ডুবতে বসেছে তখন। ওর পিছু পিছুই যেন এল পুলিশ। আমরা কোনো কথা বলার আগেই সাইরেনের শব্দ শুনলাম। মনে হলো গাড়ির কোনো শেষ নেই! যদি চুপিচুপি আসত তাহলে হয়তো ধরে ফেলতে পারত আমাদের। কিন্তু কপাল ভাল, নিজেদের জাহির করতে খুব ভালবাসে ওরা। পুরো শহরকে সাইরেনের শব্দে সচকিত করে দিয়ে এগিয়ে আসছিল গাড়িগুলো। তাই আমরাও সেটাই করলাম যেটা স্বাভাবিক : গাড়িগুলোকে দেখার সাথে সাথে পালাতে শুরু করলাম। কাউকে বিদায় জানানোর সময় ছিল না, শুধু আমার টাকাগুলো বের করে আনার জন্য ত্রিশ সেকেন্ড সময় নিলাম, তারপর দৌড়! বেহালা প্রায় এক মাইল চওড়া একটা জায়গা, আর এর মধ্যে অসংখ্য রাস্তা রয়েছে। তাই প্রথমে ডকের দিকে এগিয়ে গেলাম আমরা। একটা গারবেজবাহী বার্ড ছেড়ে যাচ্ছিল ডক থেকে, সেটায় চড়ে পানির অংশটুকু পার হয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলাম।

গার্দোর কোন এক চাচা বা চাচার বন্ধু আছে এখানে, শুকনো জিনিসের ব্যবসা করে। তার দোকানে ঢুকে পড়লাম আমরা, রাতটা সেখানেই ঘুমিয়ে কাটাব। মাথার ভেতর কিছুই কাজ করছে না। এবার সত্যি সত্যি পালাতে শুরু করেছি আমরা।

আমাদের জন্য ব্যাপারটা এখন এমনই দাড়িয়েছে। পালিয়ে বেড়াচ্ছি ফেরারি আসামী হয়ে, যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। চিঠিটা এখনও আছে আমাদের কাছে, ম্যাপটাও আছে—গার্দো আমাদের বাইবেল কোডের ব্যাপারে বলেছে, মানে যতটুকু বুঝতে পেরেছে আর কি। বদলে ওকে আমরা জানালাম জাপান্টার বাড়িতে যাওয়ার কথা, ফ্রিজে করে টাকা পাচার

করার কথা। দোকানের মধ্যে বসে বসে আমরা ভাবতে লাগলাম, এরপর কি করব-সবাই নিশ্চিত যে বাইবেলটা আমাদের দরকার। কিন্তু সেটা পাওয়ার জন্য এখন কি করতে হবে তা কেউই বুঝতে পারছিল না।

তখনই চিন্তাটা এল আমার মাথায়, কারণ এটা ঠিকই বুঝতে পারছিলাম যে আমাদের নিরাপদ থাকতে হবে। বললাম, বড় বড় ট্যুরিস্ট এলাকাগুলোতে গিয়ে লুকাতে হবে আমাদের, যেখানে অনেক ছেলেমেয়ে কাজ করে বা ভিক্ষা করে। ওদের বড় বড় দল রয়েছে ওসব এলাকায়, আর স্টেশনে থাকার সময় ওদের সাথেও পরিচয় হয়েছিল আমার। তাই সেটাই করলাম আমরা। বুয়েন্দিয়ার চারপাশে থাকা স্ট্রিপ ক্লাবগুলোর পাশে যে সস্তা হোটেলগুলো থাকে, তার পাশে একটা জায়গা খুঁজে নিলাম। ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকার চেষ্টা করছি, যেন কারও নজর না পড়ে আমাদের উপর। কেউ যদি খুঁজতে খুঁজতে চলে আসে এই ভয়ে রাফায়েলের চুল কেটে দিলাম আমি। একটু পাগলাটে দেখাতে লাগল ওকে, তবে এখনও সুন্দর চেহারা-অন্তত যতটা সুন্দর হলে বিদেশিদের কাছ থেকে ভিক্ষা পাওয়া যায়। তবে কাজটা কিছুতেই করতে রাজি নয় ও।

আমি জোর করলাম ওকে, কিন্তু তবুও রাজি হলো না। বললাম, আমার টাকা বেশি দিন থাকবে না। গার্দো ধমক দিয়ে মুখ বন্ধ রাখতে বলল আমাকে। তাই টাকাগুলো আমার হাফপ্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে সেলাই করে দিলাম। ওই টাকা দিয়েই আমাদের খরচ চলতে লাগল। রাস্তায় খাই আমরা, আর নিজেদের মধ্যে কঠোর ভাব আনার জন্য সিগারেট টানি। এক সাথে থাকি সব সময়-আঁধারের মধ্যে মিশে থাকার চেষ্টা করি। এক রাতে রাস্তার ছেলেদের সাথে ওদের ব্যবহৃত একটা ধসে পড়া বাড়ির মধ্যেও থাকলাম, কিন্তু সেখানে নিরাপদ বোধ করলাম না আমরা কেউই। স্টেশনের ছেলেদের মতো দুর্ব্যবহার করল না ওরা, কারণ এখানে সব সময়ই কেউ না কেউ যাচ্ছে অথবা আসছে। কিন্তু আমার ধারণা, আমরা তিনজন একসাথে থাকতে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এখন ভিড়ের মধ্যে গেলে ভয় পায় রাফায়েল। তাই একটা লন্ড্রির উপর ছোট্ট একটা ঘর খুঁজে বের করলাম আমরা। একটা কফিনের চাইতে খুব বেশি বড় হলে না ঘরটা, কিন্তু কোনো ঘর না থাকার চাইতে অন্তত ভালো। তাছাড়া ভাড়াটাও কম। ঘরের ভেতর কোনোমতে সোজা হয়ে বসা যায়। সেখানে বসেই আমাদের পরিকল্পনা সাজাতে শুরু করলাম আমরা।

একটা ছোট্ট পরিবর্তন আনলাম আমি-যেটার জন্য গার্দো হাসল-কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমিই কি বাঁচাইনি ওদের সবাইকে? এর আগে কখনও একটা ঘরের মধ্যে আটকে থাকতে হয়নি আমাকে, রাফায়েলের জন্য তাও করতে হলো। রাতে ঘুমাতে পারে না রাফায়েল। একটা পুরনো টায়ার লিভার এনে ছাদের কিছু অংশ আলাগা করে রাখলাম আমি, দরকার হলে ওই ফাঁকা জায়গা দিয়ে বের হয়ে যেতে পারব। কারণ, আমাদের জানা ছিল, পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। আবহাওয়ার অবস্থাও একই রকম-গরম আর ভ্যাপসা। সাগরে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক ভয়ঙ্কর টাইফুন, যে কোনো মুহূর্তে আঘাত হানবে। কেবলই মনে হচ্ছিল, বড় কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। এখন আর পিছিয়ে আসার কোনো উপায় নেই। আমার সঙ্গিরা আর কখনও তাদের আত্মীয়স্বজনকে দেখতে পাবে বলে মনে হয় না। ফিসফাস করতে শুনি ওদের, রাতের বেলায় ওর আন্টি আর কাজিনদের কথা ভেবে কাঁদে রাফায়েল।

আর কখনও বেহালায় ফিরে যেতে পারবে না ওরা। ঘর হারাতে হয়েছে ওদের, যতটুকু বুঝতে পারছি আমি।

আমরা জানতাম, বেশিরভাগই নির্ভর করছে ওই বাইবেলটা, আর আমাদের কাছে যে কাগজের টুকরোটা আছে তার উপর। বাইবেলটা লাগবে আমাদের, তারপর দুটোকে মেলাতে হবে।

তাই গার্দো ঝুঁকিটা নেবে বলে ঠিক করল। এক দিন আমার ময়লা কাপড়গুলো পরে হেঁটে হেঁটেই চলে গেল কোলভা জেলখানায়।

অনেকক্ষণ ধরে সেখানে বসে রইল ও, খেয়াল করল গার্ডরা কোন দিক দিয়ে বের হয়। আরও দুই দিন কাটাল তাদের শিফটগুলো হিসাব করে। ভান করল যেন বোবা ও, কানেও শোনে না। তারপর যখন সেই বিশেষ গার্ডকে চোখে পড়ল, অনুসরণ করল তাকে।

কিছু দূর অনুসরণ করার পর ওকে দেখতে পেল সেই গার্ড, অর্থাৎ মার্কো। আরও কিছু দূর এগিয়ে গেল সে, তারপর শহরের চাইনিজ অংশে একটা ছোট্ট চায়ের দোকান খুঁজে বের করল। সেখানে গিয়ে বসল ওরা দুজন। দারুণ সাহসের কাজ করেছে গার্দো, স্বীকার করতেই হবে। কারণ আমরা সবাই আন্দাজ করতে পেরেছিলাম, গার্দোকে ধরিয়ে দিলে পুরস্কার পাওয়া যাবে-এ কথা জানে গার্ড। জেলখানার লোকরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল যে বেহালা থেকেই এসেছে ও, আর পুলিশকেও জানিয়েছিল

তারা। বুড়ো লোকটার সাথে গার্দোর কি নিয়ে কথা হয়েছিল, এটা যে কোনো মূল্যে জানতে চাইবে পুলিশ।

তাই সবচেয়ে বড় প্রশ্নটা ছিল, মার্কোকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি কিনা।

ফিরে এসে আমাদের একটা খারাপ খবর দিল গার্দো।

‘বিশ চায় লোকটা,’ বলল ও।

মানে বিশ হাজার। বাইবেলটা পেতে হলে বিশ হাজার পেসো খরচ করতে হবে আমাদের।

গালি দিয়ে উঠল রাফায়েল। বলল, ‘বাইবেলটা আছে তো তার কাছে? তুই নিশ্চিত?’

গার্দোর ধারণা, আছে। তবে চিন্তার কথা হলো, লোকটা আসলেও বাইবেলটা দেবে কিনা। ইচ্ছা করলেই সে কিছু টাকা ঘুষ নিয়ে আমাদের ধরিয়ে দিতে পারে। গার্দোকে পাওয়ার জন্য ওরা কত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করতে পারে? একটা ব্যাপার নিয়ে আমরা কেউই আলোচনা করছিলাম না—ধরা পড়ে গেলে কি হবে। আমরা সবাই জানতাম যে একবার যদি আমাদের নাগালে পায় ওরা, কেউই আর বের হতে পারব না। ওখানেই মরতে হবে আমাদের। এই পর্যায়ে এসে আমিও দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম, কাঁদতে কাঁদতে জেগে উঠতাম ঘুম থেকে। তিনজনই যেন ভয়াবহ শিশুতে পরিণত হয়েছিলাম।

তবুও পরস্পরের কাছ থেকে আলাদা হলাম না আমরা।

‘বাইবেলটা সে দেবে বলে মনে হয়?’ সম্ভবত শততম বারের মতো জিজ্ঞেস করল রাফায়েল। ‘এতগুলো টাকা যদি আমরা জোগাড় করতে পারিও—গার্ডটাকে কি বিশ্বাস করা যায়?’

কাঁধ ঝাঁকাল গার্দো। ‘হয় সব কিছু ভুলে গিয়ে ওখানেই সারা জীবন কাটিয়ে দেয়ার চিন্তা করতে হবে,’ বলল ও, ‘না হলে ঝুঁকিটা নিতে হবে। আর কোনো উপায় নেই।’

তবে বিশ হাজার পেসো সহজ কথা নয়। আমার কাছে আছে স্রেফ দুই হাজার। বাড়ি ফেরার জন্য যে টাকা জমিয়েছিলাম, এখন সেটা বসে বসে খাচ্ছি। আগেই বলেছি, আমরা সবাই বুঝতে পারছিলাম যে বড় কিছুর খুব কাছাকাছি চলে এসেছি। কিন্তু সেই বড় কিছুর চারপাশটা দুর্ভেদ্য বেড়া দিয়ে আটকানো। রাফায়েল আমাকে পেপার পড়ে শোনায়। প্রতিদিনই জাপান্টার

বাড়ি থেকে চুরি সম্পর্কে কোনো না কোনো খবর থাকে, কিন্তু কিভাবে কাজটা করা হয়েছিল সে ব্যাপারে তথ্য থাকে খুবই সামান্য। পুলিশ নাকি তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে, খুব শীঘ্রই কাউকে গ্রেফতার করতে পারবে তারা। মোটা ভাইস প্রেসিডেন্ট এখনও মুখ খুলছে না, কিন্তু তার অতীতের ধামাচাপা পড়ে যাওয়া অন্যায়গুলো আবার সামনে বেরিয়ে আসছে। এখন আর হাসি দেখা যায় না তার ছবিগুলোতে। প্রতিটা খবরের শেষেই একই কথা থাকে : জাপান্টার বিরুদ্ধে কখনও কিছু প্রমাণ করা যায়নি। গার্দোর কাছ থেকে জেলখানায় বন্দি সেই বৃদ্ধ লোকটার কথাগুলো শুনেছি আমরা, আর কাকে বিশ্বাস করতে হবে সে ব্যাপারেও আমাদের কোনো সন্দেহ নেই।

হোঁতকা গুয়েরটার টাকা আমার চাই-এত বেশি করে চাইছি যে কখনও ভুলতে পারি না সেই সাহসী হাউসবয়ের কথা। ফ্রিজের ভেতর টাকাগুলো নিয়ে চলে গেল সে, থামল একটা কবরস্থানের কাছে। চাবি আর ওয়ালেটটা কিভাবে আবর্জনার মধ্যে ফেলেছিল সে? পুলিশ যখন ধাওয়া করেছিল তখন ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, নাকি নির্দিষ্ট কারও খুঁজে পাওয়ার আশায় রেখে দিয়েছিল ডাস্টবিনের মধ্যে? অনেকবার আলাপ করেছি আমরা এসব ব্যাপার নিয়ে, কিন্তু কখনও কোনো উত্তর খুঁজে পাইনি। আমার ধারণা, শেষ মুহূর্তে বেপরোয়া হয়েই এমন কিছু একটা করে বসেছিল সে। পুলিশ স্টেশনের লোকরা পরে পিটিয়ে কথাটা বের করে নেয় তার পেট থেকে, আর খুন করে ফেলে তারপর। যদি কখনও স্বর্ণে যেতে পারি, তাহলে জিজ্ঞেস করব লোকটার কাছে। সে যে ওখানে আছে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই আমার মনে।

যাই হোক, গল্পে ফিরে আসি। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে এভাবে নুকিয়ে থাকার পর অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলাম যে কাজে নামতে হবে। মার্কোকে দেয়ার জন্য জোগাড় করতে হবে বিশ হাজার পেসো। কথাটা বারবার মাথার ভেতর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভেবে দেখেছি আমি, কিন্তু এখনও বলিনি কারও কাছে। তবে যত ভাবছি, ততই মনে হচ্ছে-এটাই একমাত্র রাস্তা।

রাফায়েল আর গার্দোকে বললাম, বেহালার ফিরে যেতে হবে আমাকে, একটা জিনিস নিয়ে আসতে হবে। ভেবেছিলাম ওরা রাজি হবে না। ওরা বলল, আমি নাকি পাগল হয়ে গেছি; কাজটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। বলল, কেউ যদি আমাকে দেখে ফেলে তাহলে ধরিয়ে দেবে পুলিশের

কাছে-আমাদের তিনজনের জন্যই নিশ্চয়ই এত দিনে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়ে গেছে।

আমি কি আনতে চাইছি এটা অবশ্য ওরা অনুমাণ করতে পারল না। আর আমিও ভয় অথবা দুর্ভাগ্যের ভয়ে ওদের কাউকে বলতে চাইলাম না। সব কিছু নিজের ভেতর রাখতে রাখতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমি-কি করতে যাচ্ছি তা বলতে পারছিলাম না, আবার এটাও বলতে পারছিলাম না যে মাস শেষ হওয়ার আগেই কাজটা করতে হবে আমাকে। অল সোল'স নাইট চলে আসছে, অর্থাৎ আমাদের ডে অফ দ্য ডেড, বা মৃতদের দিন। তার আগেই কাজটা শেষ করতে হবে আমাকে।

তাই শুধু একটাই কথাই বারবার বলতে থাকলাম ওদের, 'আমি যাচ্ছি।' মাঝরাত চলে আসতেই ওদের ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে বেরিয়ে পড়লাম ছাদের ফুটো দিয়ে।

একটা কথা তো আগেই বলেছি আপনাদের-ভুতের বাচ্চার মতো চেহারা যদি হয় আপনারা, তাহলে এমনকি বাসেও চড়তে পারবেন না?

এমনকি টাকা দেখানোর পরেও মাছির মতো খেদিয়ে দেয়া হবে আপনাকে। রাফায়েলের সাথে যেবার বাসে উঠেছিলাম সেবার কপাল ভালো ছিল। তাছাড়া রাফায়েলের হাসিটা ছিল সুন্দর, আর ওর পেছনে লুকিয়ে ছিলাম আমি। তাই কিছু পথ হেঁটে এগোলাম, বাকি পথ পাড়ি দিলাম ট্রাকের পেছনে চড়ে। ভাগ্য ভালো ছিল আমার, শহরের চিড়িয়াখানার পাশে একটা আবর্জনার ট্রাক পেয়ে গেলাম। বুঝতেই পারছেন, ওটা কোথায় যাচ্ছিল। হ্যাঁ, বেহালাতেই যাচ্ছিল ট্রাকটা, তাই তার পেছনে চড়ে বসলাম আমি। আমার পুরনো বাড়ির কাছাকাছি আসতে বাইরে মজার রাখলাম আমি। অন্যান্য ছেলেমেয়েরাও ট্রাকটায় চড়ে বসতে পারবে। যদি ওরা কেউ দেখে ফেলে আমাকে, তাহলে আমাকে বিক্রি করে দিতে একটুও বাধবে না কারও। পরিবার বলে কিছু নেই আমার।

তবে নিরাপদেই ঢুকে পড়তে পারলাম গিটার ওপাশে। একটা পুলিশ কার দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়, দরজাগুলো খোলা। দেখে ভয় পেলাম আমি। কিন্তু পুলিশগুলো শ্রেফ গল্প করছিল গার্ডদের সাথে। ওদের কুকুরগুলোও কিছু খেয়াল করল না।

মিশন স্কুলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গতি কমিয়ে আনল ট্রাকটা, যেন আমার ভাড়া করা ট্যাক্সি। এক লাফে বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি, তারপর

ঢুকে পড়লাম স্কুলের ভেতরে। স্কুল বলতে অবশ্য বড় এক সারি ধাতব বাস্ক, সব একসাথে আটকানো। নিচেরগুলো দাঁড়িয়ে আছে ধাতব পায়ার উপরে, তাই কিছুটা জায়গা আছে সেখানে। ওই জায়গার মধ্যে গুড়ি মেরে ঢুকে পড়লাম আমি, অপেক্ষা করলাম হুৎপিণ্ডের গতি স্বাভাবিক হওয়ার জন্য। কেউ বাইরে নেই এই সময়ে, তাই কিছুক্ষণ পর স্কুলের পেছন দিকে সরে এলাম।

সামনের দিকে একটা গার্ডকে দেখা গেল। তবে ঘুমে ঢুলছে সে। এই সময়ে কে-ই বা চুরি করে স্কুলে ঢুকতে চাইবে? গল্পের বই চুরি করার ইচ্ছে কার আছে? নিজের কাছেই খারাপ লাগছিল আমার, মনে হচ্ছিল নিজের বাড়ি থেকেই চুরি করছি। শুধু বেহালার মানুষ নয়, বরং ফাদার হুলিয়ার্ডের কাছ থেকে চুরি করতে যাচ্ছি আমি, যাকে বলা যায় আমার বাবার মতোই। আমার সত্যিকার বাবাকে কখনও দেখিনি আমি। ফাদার হুলিয়ার্ড একটু বোকা হতে পারে, একটু বেশিই বিশ্বাস করে সবাইকে—এটা সবাই জানে। কিন্তু খুব ভালো মানুষ সে, আর আমিও তাকে ভালবাসি।

স্কুলের কোণ বেয়ে উপরে উঠে এলাম আমি।

নিচতলার জানালাগুলোতে পাল্লা লাগানো আছে, আর রাতের বেলায় সব বন্ধ থাকে। উপরতলার জানালাগুলোতে শুধু গরাদ লাগানো, পাল্লা নেই। ভেতরে ঢোকানোর জন্য একটা ব্যবস্থা আমার আগেই করে রাখা ছিল। সত্যি কথাটা হলো, বড় একটা ঘরে মাঝে মাঝে ঘুমাতে বেশ ভালই লাগে, কিন্তু তাই বলে ব্যাপারটা অভ্যাসে পরিণত করতে চাইনি কখনও। আর দ্বিতীয় সত্যি কথাটা হলো, স্কুলের তহবিল থেকে টাকা চুরি করার একটা খুব, খুব খারাপ বদভ্যাস আছে আমার। যদিও সেটা পরিমাণে খুব অল্প, আর মাসে একবার। তাই একটা জানালার দুটো গরাদ আমি আলাদা করে রেখেছি, যেটা কেউ খেয়াল করবে না। আমার মাথাটা খুব সহজেই গলে যেতে পারে সেখান দিয়ে। ছায়ার মতো ভেতরে ঢুকে পড়লাম আমি, নেমে এলাম অফিসের মেঝেতে পেতে রাখা কাপের উপর।

সিন্দুক থেকে টাকা চুরি করলাম কিভাবে, জানতে চান?

বেশ। সিন্দুকটা থাকে একটা টেবিলের উপর, দেয়ালের সাথে আটকানো অবস্থায়। খুব বেশি বড় নয়—বড় হওয়ার প্রয়োজনও নেই, কারণ ভেতরে বেশি কিছু থাকে না। বড় অংকের টাকাগুলো সাধারণত ব্যাংকে চলে যায় সরাসরি। শুধু হঠাৎ করে দরকার পড়ে যেতে পারে, এই ভেবে

কিছু নগদ টাকা রাখা হয় স্কুলে। তবে তার পরিমাণটাও বিশ থেকে পঁচিশ হাজারের কম হওয়ার কথা নয়, তাই আমি আশাবাদী বোধ করছিলাম। কখনও বেশি টাকা নিই না আমি, খুব বেশি হলে শ খানেক পেসোর মতো। মনে মনে আশা করি যে ফাদার হুলিয়ার্ড কখনও খেয়াল করবে না, অথবা খেয়াল করলেও ভাববে যে, গুনতে ভুল হয়েছিল তার। মাসে একবার, খুব বেশি হলে দুইবার কাজটা করি আমি। এভাবেই ধীরে ধীরে বেড়েছে আমার জমানো টাকার পরিমাণ, তবে কথাটা রাফায়েলকে বলিনি। কারণ, আমার চাইতে ওর সততার পরিমাণ বেশি। কিন্তু এখন সেটা প্রকাশ পাবেই।

আপনারা নিশ্চয়ই ভাবছেন, আমার মতো একটা ছেলে কিভাবে সিন্দুকের দরজা খুলল? উত্তরটা খুবই সাধারণ, আর এত বেশি সহজ যে, আপনাদের হাসি পাবে। ফাদার হুলিয়ার্ডের স্মৃতিশক্তি নিশ্চয়ই খুবই খারাপ, কারণ সিন্দুকের কম্বিনেশনটা নিজের ডায়রিতে লিখে রাখে সে। প্রতি মাসে অবশ্য বদলানো হয় সেটা, মাসের শেষ নাগাদ, আর নতুন কোডটা লিখে রাখা হয় তার নিচেই। তার ডেস্কের উপরেই থাকে ডায়রিটা। এই মাসে সেই কোডটা হচ্ছে ২০৮৬১। আমরা যখন কম্পিউটারে কাজ করছিলাম, আর ফাদার হুলিয়ার্ড যখন আমাদের জন্য খাবার আনতে গিয়েছিল-সেই সময় কোডটা দেখে নিয়েছি আমি। কিন্তু, এই মাসের শেষে, অর্থাৎ অল সোল'স নাইটের পর সেই কোডটা আর থাকবে না। সে জন্যই মাস শেষ হওয়ার আগেই এখানে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি।

কোডটা সিন্দুকে প্রবেশ করাতেই খুলে গেল দরজা। ভেতরে পাওয়া গেল তেইশ হাজারের কিছু বেশি। মি. মার্কোকে এই টাকাটা দিয়ে নিতে হবে বাইবেলটা।

টাকাগুলো প্যান্টের পকেটে ভরলাম আমি, তারপর ঘর হওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম।

কিন্তু তারপর আরেকটা কথা মনে পড়তে-অসিলে, লজ্জায় আমার মাথা নিচু হয়ে যাচ্ছিল বারবার, তাই-থমকে দাঁড়ালাম। বুড়ো মানুষটার ডেস্কের উপর অনেক রকম কাগজ পড়ে থাকে সব সময়, আর ড্রয়ারে একটা কলমও পাওয়া গেল। কাজটা আমার করার ইচ্ছা ছিল না, আর এটা ঝুঁকিপূর্ণও বটে-কিন্তু ফাদার হুলিয়ার্ড কখনও জানতে পারবে না যে, কাজটা কে করেছে-এই চিন্তাটাই থামিয়ে দিচ্ছিল আমাকে। তাই একটা ছবি আঁকলাম আমি। জুন-জুন কথাটা আমি লিখতে পারি, তাই আমার একটা ছবি এঁকে

তার উপর লিখে দিলাম নামটা। একটা বড় তীর চিহ্ন দিয়ে নির্দেশ করতেও ভুললাম না। ছবিতে দেখা গেল, ফাদার হুনিয়ার্ডকে জড়িয়ে ধরে আছি আমি। তাকে যেন চেনা যায় এজন্য বড় একটা ত্রুশ ঐকে দিলাম তার বুকে। চারপাশে অনেকগুলো এক্স ঐকে দিলাম, কারণ লোকে ওগুলো ব্যবহার করে চুমু বোঝানোর জন্য। তারপর কাগজটা রেখে দিলাম সিন্দুকের মধ্যে। চোখে পানি চলে এসেছে আমার। বিদায় নিচ্ছি আমি। বেহালার ভাগাড়ে আগুন ধরে গেলেও কখনও কিছু আসে যায় না আমার, কিন্তু মিশন স্কুল ছিল আমার জন্য এক নিরাপদ, আনন্দময় আশ্রয়। সিস্টার অলিভিয়া, আর তার আগে যে-সব স্বেচ্ছাসেবকরা এসেছে, তারা সবাই আমার সাথে ভালো ব্যবহার করেছে। ফাদার হুনিয়ার্ড আমাকে গল্প বলত, খাবার দিত, টাকা দিত। একবার এমনকি চুমুও খেয়েছিল আমাকে, যেটা আর কেউ করেনি কখনও।

এই কথাগুলো মনে পড়ে যাওয়ার পর খুব খারাপ লাগছিল আমার, যেতে ইচ্ছা করছিল না। কিন্তু তারপরই রাফায়েল আর গার্দোর কথা ভাবলাম, সামনে যে কাজটা করতে হবে তার কথা ভাবলাম। হোসে অ্যাঞ্জেলিকোর কথাও ভাবলাম, যাকে খুন করেছে পুলিশ। তারপর এগিয়ে চললাম সামনে।

একটা ময়লার ট্রাক কাছাকাছি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম আমি। সেটার গতি ধীর হয়ে আসতেই উঠে পড়লাম পেছনে। তারপর গেট দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম আমরা। ভোর হতে তখনও বেশ কিছুটা বাকি, এই সময় আমাদের আশ্রয়ে ফিরে এলাম আমি। রাফায়েল আর গার্দো তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। রাফায়েলের বেশ মজার একটা অভ্যাস আছে, সম্ভবত ওর কাজিনদের সাথে ঘুমিয়ে অভ্যস্ত বলেই—পাশে যে ঘুমায় তাকে জড়িয়ে ধরে ও। কন্সলের নিচে ঢুকতেই ওর হাতটা আমাকে জড়িয়ে ধরল। নিজেকে একজন অকৃতজ্ঞ চোর ভেবে যে দুঃখটা পাচ্ছিলাম, কিছুটা হলেও কমে গেল সেটা।

সেই রাতে আর কোনো দুঃস্বপ্ন দেখল না রাফায়েল—ভোর হওয়ার আগ পর্যন্ত নিশ্চিন্তে ঘুমাতে দেখলাম ওকে।

গার্দো বলছি, আবারও।

টাকাগুলো কোথায় পেল সে ব্যাপারে দুই দিন মুখে তালা আটকে রেখেছিল র‍্যাট। শেষ পর্যন্ত যখন বলল, ব্যাপারটা বেশি খারাপ কিছু মনে হলো না আমার কাছে। কিন্তু ওর মন কিছুতেই ভালো হচ্ছে না দেখে শেষ পর্যন্ত বললাম, বাইবেলটা যদি আমরা পাই, আর তা থেকে যদি হোসে অ্যাঞ্জেলিকো রহস্যের সমাধান হয় এবং টাকাগুলো সত্যিই চলে আসে আমাদের হাতে-তাহলে মিশন স্কুলকে বিশ হাজার পেসো আবার ফিরিয়ে দেবো আমরা, সেই সাথে কিছু বাড়তি টাকা দেবো উপহার হিসেবে।

এবার খুশি হলো র‍্যাট। শহরের মধ্যে কয়েকদিন ঘুরতে হলো আমাদের সেই গার্ডের খোঁজে। শেষ পর্যন্ত খোঁজ পাওয়া গেল তার। টাকার বদলে বাইবেলটা ফেরত দেয়ার জন্য রাজি করালাম তাকে। এই অংশটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক, জানা আছে আমার, কারণ গার্ড লোকটা জানে যে বাইবেলটা পাওয়ার জন্য পাগল হয়ে আছি আমরা, যার অর্থ হচ্ছে ওটা অনেক দামি-আর দ্বিতীয়ত, সে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে অদ্ভুত কিছু একটা ঘটছে।

সিস্টার অলিভিয়ার সাথে সেই জেলখানায় যাওয়ার স্মৃতি বারবার ফিরে আসছে আমার মনে। আমার ছবি তুলেছিল ওরা। শুধু মনে হচ্ছে, যদি...যদি...যদি...ঘুমের লেশমাত্রও নেই আমার চোখে।

যদি ওরা ওই চায়ের দোকানে ওঁত পেতে বসে থাকে?

যদি আমাকে ধরে ফেলে?

যদি আমাকে গুলি করে?

যদি পুরো জায়গাটা আগে থেকে ঘিরে রাখে ওরা?

যদি সাদা পোশাকে অপেক্ষা করে থাকে পুলিশরা, আর সঠিক সময়ে ওদের দেখতে না পাই আমি?

একবার ধরতে পারলে হয়; ধীরে ধীরে, যত্নের সাথে আমাদের শরীরের প্রত্যেকটা হাড় ভাংবে ওরা, আর উপভোগ করবে কাজটা।

পুলিশ স্টেশনের জানালা দিয়ে কিছুক্ষণ ওকে ঝুলিয়ে ধরা হয়েছিল, সে

ব্যাপারে সব কিছু আমাকে বলেছে রাফায়েল। আমি জানি, একবার ধরা পড়লে ওখান থেকে আমরা কেউই বেরিয়ে আসতে পারব না। মরার আগ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাব আমি, কারণ রাফায়েলের মুখ থেকে যা শুনেছি তাতে ভয়ে আমার আত্মা উড়ে গেছে। ওর মতো সাহস রাখতে পারব না আমি, জানা আছে আমার।

মঙ্গলবার বিকেলে দেখা করব বলে ঠিক করেছি আমরা, মার্কোর শিফট শেষ হওয়ার ঠিক পরপর। চায়নাটাউনের সেই চায়ের দোকানটায়। সিস্টার অলিভিয়ার দেয়া সেই কাপড়গুলো ধুয়ে রেখেছি আমি, কারণ শহরের ওই অংশটায় আমাদের মতো ছেলেদের খুব বেশি দেখা যায় না। সবার সাথে মিশে যেতে চাই আমি যতটা সম্ভব। রাফায়েল আর র্যাট পুরো রাস্তা আমাকে অনুসরণ করল, কিছুটা দূর থেকে। পুলিশ যদি ফাঁদ পেতেই রাখে, সেই ফাঁদে তিনজনেরই ধরা পড়ার কোনো অর্থ হয় না।

পঞ্চাশ পেসো দিয়ে একটা বেসবল ক্যাপ কিনলাম আমি। তার সাথে টেনার জুতো থাকায় চেহারা বেশ অনেকটা বদলে গেল। সবার পাশ কাটিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলেছি, চোখ সোজা সামনে। হুকটা অবশ্য সাথে রাখতে ভুলিনি। কেটে ছোট করে নিয়েছি ওটাকে, আমার জিনসের পেছনে গোঁজা রয়েছে এখন। কিনারটা ধারালো করেছি ঘষে ঘষে। আগেও লড়াই করতে হয়েছে আমাকে, আর তখন বুঝেছি, সাথে একটা অস্ত্র থাকলে বিরাত উপকার হয়।

ছোট চায়ের দোকানটা বেশ অন্ধকার, শাটারগুলো নামানো। সরাসরি ভেতরে ঢুকে পড়লাম আমি, কোনো দিকে না তাকিয়ে চলে গেলাম। গ্রেমবার যে টেবিলটায় বসেছিলাম সেটায়। উপরে একটা লাল রঙের বাতি জ্বলছে, সেই আলোতে কোনো রকমে টাকাগুলো গোনা যাবে। আমরা আগেই চলে এসেছে মার্কো। লম্বা চওড়া লোক, ঘাড়টা বেশ বড়ো। তার সামনে গিয়ে বসলাম আমি, মনে মনে ভাবছি-তাড়াতাড়ি করতে হবে যা করার। এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে যত দ্রুত সম্ভব। যদিও মনে হচ্ছে কেউ নেই আশেপাশে, নিরাপদই লাগছে সব কিছু। রান্নাঘরের দিক থেকেও কোনো আওয়াজ আসছে না।

মার্কো প্রথমেই টাকাগুলো দেখতে চাইল। তাই সবগুলো নোট গুনে দেখালাম আমি। লোভ ঝলসে উঠল লোকটার চোখের তারায়, মনে হলো হয়তো কোনো ভয় নেই। বিশ হাজার পেসো যথেষ্ট হবে তার জন্য। টাকাগুলো গুনলাম আমি, যে কোনো মুহুর্তে উঠে দৌড় দেয়ার জন্য প্রস্তুত।

বাইবেলটা ব্যাগ থেকে বের করে আনল মার্কো, টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল সেটাকে। দুই কাপ চা রেখে গেল দোকানের চাইনিজ মালিক।

আমি বললাম, বইটা যে গ্যাব্রিয়েল ওলোন্দ্রিজেরই বাইবেল তার প্রমাণ কি? কারণ, হঠাৎ করেই আমার মনে পড়েছে যে পুরনো একটা বই আমাকে ধরিয়ে দিয়ে যদি বলা হয়, এটাই ওলোন্দ্রিজের বাইবেল, তাহলে সেটা মিথ্যা প্রমাণ করার কোনো উপায় নেই আমার। কিন্তু আমি বলার সাথে সাথেই বাইবেলটা খুলে দেখাল মার্কো। দেখলাম, ভেতরে ওলোন্দ্রিজের সাক্ষর রয়েছে। তাছাড়া, সে যেই কোডগুলোর কথা বলেছিল সেগুলোর মতো বেশ কিছু সংখ্যাও লেখা রয়েছে ভেতরে। আর বইটা এত বেশি পুরনো আর জীর্ণ যে আমার মনে আর সন্দেহ রইল না।

টাকাগুলো তাই টেবিলের উপর নামিয়ে রাখলাম আমি, তারপর বইটা তুলে নিয়েই উঠে দাঁড়লাম।

মার্কো সম্ভবত আশা করেনি যে আমি এমন আচমকা চলে যেতে চাইব। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা আগেই মনে মনে সাজিয়ে রেখেছিলাম আমি। রান্নাঘরটা কাছাকাছি, তাই প্রথমে ওখানে ঢুকে পড়ব বলে ঠিক করেছিলাম—আর ঠিক সেটাই করলাম। তারপরেও যথেষ্ট দ্রুত হলো না আমার নড়াচড়া, আমাকে ধরে ফেলল মার্কো; প্রায় টেবিলের উপর লাফ দিয়ে উঠে আমাকে চেপে ধরতে চাইল সে। চিৎকার করে উঠল তারস্বরে, একই সাথে কাপগুলো মেঝেতে পড়ে ভেঙে চৌচির হয়ে গেল। টাকাগুলো ছড়িয়ে পড়ল ঘরময়। আমার হাতের উপর কিছুটা টিল হলো তার হাতের চাপ, সম্ভবত টাকার চিন্তায়। তাই হাতটা মুচড়ে ছাড়িয়ে নিলাম আমি, আর ঘুরে তাকাতেই দেখলাম বাইরে কে যেন দৌড়ে আসছে দোকানের দিকে। একটা হুইসেল বাজল কোথাও—লোকজন চেচামেচি শুরু করল। আমার আরেক হাত চেপে ধরল মার্কো, কিন্তু আবারও নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইলাম আমি, প্রাণপনে যুঝছি। মার্কো চিৎকার করে উঠল, ‘ধরেছি ওকে, ধরেছি!’

আমার হুকটা বের করে আনলাম এবার।

হ্যাঁ, জিনসের পেছন থেকে এক টানে বের করে এনেই চালিয়ে দিলাম মার্কোর মুখ বরাবর। কোথায় লাগল জানি না, কিন্তু লাগল কোনো এক জায়গায়, আর চিৎকার করে উঠে মাটিতে পড়ে গেল লোকটা। আমার হাত ছেড়ে দিয়েছে আগেই, সম্ভবত চোখে লেগেছে আঘাত—আর সত্যি কথাটাই বলছি; আমি আশা করি যেন সত্যিই একটা চোখ হারিয়ে থাকে সে, যেন

কানা গার্ড হিসেবে ওকে এখন চেনে সবাই। কিভাবে সে একটা কিশোর ছেলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চেয়েছিল, আর সেই ছেলেটা কিভাবে তার একটা চোখ গেলে দিয়ে তাকে শাস্তি দিয়েছিল-সেই গল্পটা সবাইকে বলবে সে, নোংরা বিশ্বাসঘাতক কোথাকার।

ফিরে তাকানোর সময় ছিল না আমার হাতে, কারণ আমি ততক্ষণে দৌড় দিয়েছি রান্নাঘরের মধ্য দিয়ে। সরাসরি এক পুলিশের গায়ে গিয়ে পড়লাম; বা পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম-একদম শেষ মুহূর্তে তার হাতের নিচ দিয়ে বাউলি কেটে বেরিয়ে গেলাম। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল পুলিশটা। আবার হুক চাললাম আমি, কিন্তু মিস হলো এইবার। তারপরই বেরিয়ে এলাম বাইরের উঠোনে, এক লাফে বেড়া ডিঙিয়ে ছুটে শুরু করলাম রাস্তা ধরে।

‘গার্দো! গার্দো! গার্দো!’

র্যাটের গলা, আমার ঠিক পাশেই ছুটছে ও। দুটো গুলির শব্দ শুনলাম, কিন্তু আমার গায়ে লাগল না। কে যেন চিৎকার করতে শুরু করেছে। বাইবেলটা র্যাটের হাতে দিয়ে দিলাম আমি, তারপর আলাদা হয়ে গেলাম পরস্পরের কাছ থেকে। ব্যস্ত রাস্তা ধরে ছুটে চলা গাড়ির মধ্য দিয়ে রাস্তার অপর পারে চলে এলাম। লোকজন তাকিয়ে রইল আমার দিকে, কিন্তু কেউ ধরার চেষ্টা করল না; এমনকি আমি যখন একটা ট্যাক্সির উপর লাফিয়ে উঠে পার হয়ে গেলাম তখনও না। ট্যাক্সির ছাদ থেকে গড়িয়ে পড়লাম রাস্তার উপর-আর এক মুহূর্ত পরেই লাফিয়ে উঠে ঢুকে পড়লাম রাস্তার ওপারে অবস্থিত মাছের বাজারের মধ্যে। শার্টটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম-এত সুন্দর শার্টটা আমার-তারপর দৌড়ে চলে এলাম সবচেয়ে অন্ধকার কোণটায়, যেখানে ছেলেপুলেরা ডেনের পাশে বসে মাছ পক্কাকার করেছে। আমার দিকে তাকাল না কেউ, তবুও দৌড় থামলাম না আমি। দৌড়াতে দৌড়াতেই চলে এলাম খালের কাছটায়, তারপর লাফিয়ে পড়ে সাঁতরাতে শুরু করলাম। কুঁড়েঘরগুলো যেখানে কিনারের দিক কাছাকাছি সেখানে এসে উঠে পড়লাম কূলে, তারপর হুকটা দিয়ে আমার জিনসটা কেটে ছোট করে নিলাম। পা থেকে খুলে ফেললাম ট্রেনারগুলো, দিয়ে দিলাম পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ছেলেকে। খালের কিনার ধরে কিছু দূর এগিয়ে ঢুকে পড়লাম কুঁড়েঘরের জঙ্গলের মধ্যে। মনে মনে প্রার্থনা করছি ঈশ্বরের কাছে - আমার বন্ধুরা যেন নিরাপদে থাকে; সেই সাথে কাপছি থরথর করে।

নিরাপদই আছি আমরা, কিন্তু জানি যে বেশিক্ষণ থাকবে না এই অবস্থা।

রাফায়েল বলছি আবার। তবে লিখছি র্যাটকে সাথে নিয়ে, যাতে কোথাও কোনো ভুল হয়ে না যায়-কারণ এর পরের ঘটনাগুলো আমার ভুলের কারণেই ঘটেছে বলে আমার ধারণা। গার্দোকে দৌড়াতে দেখলাম আমি, র্যাটও পিছু নিল ওর। তারপর হঠাৎ এক পুলিশ আমাকে দেখতে পেয়ে চেষ্টা করে উঠল, তাই আমিও দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে গেলাম। তীক্ষ্ণ শব্দে ব্রেক কষল বাসগুলো, হর্ন বাজালো কান ফাটানো আওয়াজে। পুলিশগুলো নিশ্চয়ই আমাকে অনুসরণ করেছিল, কারণ আমি অত জোরে দৌড়াতে পারি না। কয়েকটা অলিগলি দিয়ে দৌড়েও ফাঁকি দিতে পারিনি ওদের, সম্ভবত ওরা দেখে ফেলেছিল আমি কোন দিকে যাচ্ছি, তারপর আন্দাজ করে নিয়েছিল যে আমার গন্তব্য কোথায় হতে পারে। র্যাটের ধারণা, আমরা যখন চায়ের দোকানটায় পৌঁছলাম তখন ওরা আমার আর গার্দোর ছবি তুলে নিয়েছিল।

যাই হোক, আমার মনে হয় ধরা পড়ার খুব কাছাকাছি চলে এসেছিলাম আমরা। কেন যে ওরা তখন আমাদের ধরে ফেলল না তা একটা রহস্য। হয়তো ওরা নিশ্চিত হতে চেয়েছিল যে বাইবেলটাই চাই আমরা, আর জানতে চেয়েছিল কেন ওটা আমাদের দরকার। হয়তো ভেবেছিল গার্দোর মতো একটা বাচ্চা ছেলেকে সামলানোর জন্য একজন গার্ডই যথেষ্ট হবে-সঠিক কারণটা আমি জানি না।

যাই হোক, ওরা নিশ্চয়ই আমাদের ছবি তুলে রেখেছিল, কারণ পরদিন সকালেই আমাদের দরজায় আঘাতের শব্দ শুনলাম, ঠিক যেখানে আমরা আস্তানা গেড়েছিলাম সেখানেই। র্যাটের ধারণা, ওরা লোক লাগিয়ে দিয়েছিল আমাদের খুঁজে বের করার জন্য। আমাদের ছবি আর কিছু টাকা দেখিয়ে লোকজনকে জিজ্ঞেস করে বেড়াচ্ছিল ওরা, আর কেউ না কেউ আমাদের খোঁজ দিয়েছিল ওদের...

রাফায়েল বলছি :

সন্ধ্যা নামার একটু পর দেখা হলো আমাদের তিনজনের। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনজন তিন দিকে চলে গিয়েছিলাম আমরা, তারপর আলাদা আলাদাভাবেই হাজির হয়েছিলাম আমাদের ছোট বাস্কের মতো ঘরটায়। পরস্পরকে দেখে এত খুশি লাগল আমাদের, কিছুক্ষণ শুধু হাত মেলাতে লাগলাম আমরা, একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরলাম আর হাসলাম।

র্যাট পড়তে জানে না, তাই ও গেল খাবার আনতে। আর আমি এবং গার্দো কাজে লেগে পড়লাম। সময় নষ্ট করা যাবে না, একটুও না।

আমরা জানি যে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে, তাই আমরাও কাজ করে চললাম। ঘুমানোর কোনো সুযোগ নেই।

এক ডজন মোমবাতি জ্বালালাম আমরা, তারপর সেগুলোকে রাখলাম বাইবেল আর কাগজটার চারপাশে। প্রথমে অবশ্য কিছুক্ষণ তর্ক চলল বুক কোড জিনিসটা কি হতে পারে তাই নিয়ে। গার্দো যদিও বৃদ্ধ লোকটার কাছ থেকে শুনেছিল এ সম্পর্কে, কিন্তু আমিই প্রথম বের করলাম সমাধানের উপায়টা। গার্দোকে ছোট করতে চাইছি না, কিন্তু আমার চোখগুলো বেশি দ্রুত কাজ করে। তবে গার্দো বলছে যে আমরা একসাথেই বের করেছি সমাধানটা। সেটাও সত্যি।

স্কুলের বাচ্চাদের মতো একই সাথে কাজ করে চললাম আমরা। বাইবেলের মলাটটা জীর্ণ হয়ে এসেছে, পৃষ্ঠাগুলো ময়লা। পৃষ্ঠাতে বেশ কিছু সংখ্যা লেখা রয়েছে এক সারিতে : ৯৩৭, ৯৪০, ৯২২... এমন অনেকগুলো সংখ্যা, লম্বা সারি ধরে। আমরা কখনও ওইভাবেই পড়াশোনা না করলেও জীবনে চলতে হলে যোগ বিয়োগ শিখতেই হয়। আর আমরা কেউই বোকা নই, তাই মোটামুটি আন্দাজ করে নিতে পারলাম সব কিছু।

যে পৃষ্ঠা সংখ্যাগুলো লেখা রয়েছে তার সবই শেষের দিকে। গার্দোর মনে পড়ল, বুড়ো লোকটা গসপেল অধ্যায়ের কথা বলছিল।

‘সেন্ট জন,’ বলল ও। ‘ইহা সমাপ্ত হইল।’

ওখান থেকেই খুঁজতে শুরু করলাম আমরা। প্রচুর আঙুলের ছাপ লেগে আছে পৃষ্ঠাগুলোতে। সবগুলো পৃষ্ঠাই এমনকি বাকি পৃষ্ঠাগুলোর চাইতেও জীর্ণ আর পাতলা হয়ে এসেছে, তাই সেগুলো যেন খুলে না আসে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হলো আমাদের। ত্রুশবিন্দু করার অধ্যায়টা রয়েছে ৯৪০ পৃষ্ঠায়, যেটা কিনা চিঠির সাথে থাকা কাগজটার প্রথম সংখ্যা। তাই ওই পৃষ্ঠাতেই মনোযোগ দিলাম আমরা। একেবারে শেষে, কেউ একজন হাতে লিখেছে :

শেষ পর্যন্ত আকাশ অন্ধকার হইয়া আসিল, আর যিশু চিৎকার করিয়া উঠিলেন—‘ইহা সমাপ্ত হইল’, আর মন্দিরের পর্দা মধ্যস্থান বরাবর উপর হইতে নিচ পর্যন্ত ছিড়িয়া গেল—মাটি কাপিয়া উঠিল, আর কবরের মুখ খুলিয়া গেল, সাধুরা উঠিয়া আসিলেন...

গার্দো খেয়াল করল, প্রতিটি লাইনের শুরুতে একটি করে ছোট্ট সংখ্যা দিয়ে বাইবেলের প্রত্যেকটা বাক্য নির্ধারিত করা হয়েছে। এবার অসংখ্য বিন্যাস নিয়ে কাজ শুরু করলাম আমরা, কখনও সামনে গেলাম, আবার কখনও পেছনে। কাগজে লেখা সংখ্যাগুলো বাইবেলের প্রথম পাতায় থাকা সংখ্যার সাথে মিলিয়ে দেখলাম প্রথমে। প্রথমে উপর থেকে নিচ-এভাবে গুনে দেখলাম, তারপর এক পাশ থেকে আরেক পাশে। কিন্তু কাজটা সহজ হলো না, কারণ কারও জানা নেই আমরা আসলে কি খুঁজছি। তাই গার্দো একভাবে খুঁজতে লাগল, আমি আরেকভাবে। এক পর্যায়ে দেখা গেল একই পদ্ধতিতে বারবার খুঁজছি আমরা দুজন। যে সংখ্যাগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে সেটা আমাদের জানা আছে—৯৪০.৪.১৮.১৩.১৪, আর এগুলোকে এখন মেলাতে হবে বইয়ের লাইনগুলোর সাথে যাতে ওখান থেকে অক্ষরগুলো আলাদা করা যায়। বৃদ্ধ লোকটাই এমনই বলেছিল। কিন্তু যেভাবেই চেষ্টা করি না কেন, অর্থহীন কিছু অক্ষরের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না।

র্যাট ফিরে এল এই সময়। রামের গন্ধ বের হচ্ছে গা থেকে, আমাদের জন্যেও নিয়ে এসেছে কিছুটা। খেয়ে নিলাম আমরা, আর ও ঘুমিয়ে নিল কিছুক্ষণ।

অন্যান্য বিন্যাস নিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি আর গার্দো। নতুন মোমবাতি জ্বালানো হলো। এখন আর তাড়াহুড়ো করছি না আমরা।

কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর আমার উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিল গার্দো। তারপর যখন আবার ওর পালা এল, তখন আমি শুধু বসে বসে ভাবলাম। আমার পালা এলে একই কাজ করল গার্দো নিজেও।

মাঝরাত এল এক সময়। আর আমার ধারণা, ওই সময়টাই আমাদের পক্ষে এনে দিল সব কিছু। মাসের শেষ আজ, অল সোলস' ডে' শুরু হলো মাঝরাতের পর থেকে—যেটা হচ্ছে আমাদের ডে অফ দ্য ডেড। হয়তো হোসে অ্যাঞ্জেলিকো আর গ্যাব্রিয়েল ওলোন্দ্রিজও এসে বসেছিল আমাদের পাশে—ঘরের ভেতরটা তখন সত্যিই বেশ ভিড় মনে হচ্ছিল। হয়তো আমাদের মাথাতে ওরাই উত্তরটা এনে দিয়েছিল, কারণ গার্দোই প্রথম সঠিক উত্তরটা বের করতে পারল। বাম থেকে ডানে যাওয়ার বদলে ডান থেকে বামে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ও। চার লাইন নিচে, বাম দিকে আঠারো শব্দ পর একটা বড় হাতের 'জি' পেল ও। তেরো লাইন নিচে, চোদ্দ শব্দ বামে যাওয়ার পর পাওয়া গেল 'ও'। এই প্রথম একটা শব্দ তৈরি করতে পারলাম আমরা।

পাঁচটা অক্ষর এগিয়ে গেল গার্দো, কিন্তু কিছুই পেল না। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে স্ল্যাশ চিহ্নটা দিয়ে হয়তো বোঝানো হয়েছে যে পৃষ্ঠা ওল্টাতে হবে, তাই পরের পাতায় চলে এলাম। তাতে কোনো লাভ হলো না, তাই আগের পাতায় ফিরে এলাম আবার। পাঁচ লাইন নিচে, তিনটে অক্ষর পরেই পাওয়া গেল 'টি'। তারপর ছয় লাইন নিচে, চারটে শব্দ পরে পাওয়া গেল পরবর্তি ছোট হাতের 'ও'টা। স্ল্যাশ দিয়ে আসলে বোঝানো হয়েছে আগের পাতায় যেতে হবে। এখন দুটো অর্থপূর্ণ শব্দ রয়েছে আমাদের হাতে। সেগুলোর দিকে রুদ্ধবশ্বাসে তাকিয়ে রইলাম আমরা।

গো টু

এভাবে যখনই স্ল্যাশ পড়ল, তখনই এক পাতা পিছিয়ে এলাম আমরা। এভাবে পিছিয়ে যেতে লাগলাম একটু পরপর, চোখ কুঁচকে পড়ছি ছোট ছোট লেখাগুলো। ভুল হলো না তা নয়, কিন্তু তাতে দমলাম না আমরা, কারণ ধীরে ধীরে রহস্যের জট খুলতে শুরু করেছে।

শেষ পর্যন্ত যে লেখাটা পাওয়া গেল সেটা এ রকম :

গো টু দ্য ম্যাপ রেফ হোয়্যার উই লে লুক ফর দ্য ব্রাইটেস্ট লাইট
মাই চাইল্ড

ঘুম থেকে জেগে উঠল র্যাট। ওকে লেখাটা পড়ে শোনালাম আমরা।

আমাদের সাথে হাত মেলাল ও। ওকে জড়িয়ে ধরলাম আমরা। র্যাট বলল, ‘ম্যাপ রেফ বলতে কী বোঝানো হয়েছে আমি জানি।’ বলার সময় এত বড় বড় হয়ে উঠল চোখ। ‘এক সময় কিছু পড়াশোনা করতে হয়েছিল আমাকে, সেই ক্লাসের সবাইকে ম্যাপ বানাতে দেয়া হয়েছিল। ম্যাপ রেফ বলতে আসলে “রেফারেন্স” বোঝানো হচ্ছে। হোয়ার উই লে-মানে হয়তো বোঝানো হচ্ছে, “আমাদের যেখানে দেখা হয়েছিল,” বা এমন কিছু। মনে রাখতে হবে, এই লেখাটা নিজের ছোট্ট মেয়েকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিল হোসে অ্যাঞ্জেলিকো।’

‘ম্যাপটা খোলো,’ বললাম আমি। আমার ধারণা, তখনও নিজেকে অতিরিক্ত বুদ্ধিমান প্রমাণ করার চেষ্টা করছিল র্যাট, কিন্তু এখন সবার কথাকেই গুরুত্ব দিতে হবে আমাদের, সবগুলো পথই যাচাই করে দেখতে হবে। ‘আরেকবার দেখা যাক ওটা,’ বললাম ওকে।

কমপক্ষে কয়েক শতবার ম্যাপটার দিকে তাকিয়ে থেকেছি আমরা, তীরচিহ্ন বা ক্রস আছে কিনা খুঁজে দেখেছি। এমনও ভেবেছি, হয়তো এমন কোনো চিহ্ন সত্যিই ছিল, পরে মুছে ফেলা হয়েছে। কিন্তু কিছুই পাইনি। ম্যাপটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর র্যাট বলল, ‘ম্যাপ রেফ বলতে আসলে সংখ্যা বোঝানো হয়, ঠিক আছে? এক সারি সংখ্যা।’

‘আবারও সংখ্যা?’ বলে উঠলাম আমি। মাথা ব্যথা করতে শুরু করেছে আমার। তবে আবার চিঠিটায় ফিরে গেলাম আমরা। কোনো সংখ্যার কথা বলা নেই কোথাও। তাই ফিরে এলাম ম্যাপে। ম্যাপটার চারপাশের কিনারে অনেকগুলো সংখ্যা লেখা আছে ঠিক, কিন্তু সেগুলোর অর্থ উদ্ধার করার কোনো উপায় নেই। তারপর হঠাৎ চিঠির খামটার উপর চোখ পড়ল আমার। কয়েদি নাম্বার ৭৪৬২২৯, লেখা রয়েছে সেখানে।

লেখাটা জোরে জোরে পড়লাম আমি।

‘নাম্বারটা কিন্তু তার ছিল না,’ মৃদু স্বরে বলে উঠল গার্দো।

‘মানে? কি বলতে চাস তুই?’

‘আমরা যখন ওখানে গেলাম, ওয়েটিং রুমে বসতে হয়েছিল কিছুক্ষণ। জেলখানার এক কর্মকর্তা এসে সিস্টার অলিভিয়ার কাছে নামটা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল। সে বলেছিল, আমরা নাকি নাম্বারটা ভুল জেনেছি, কারণ প্রথমে আমার ধারণা হয়েছিল সম্পূর্ণ ভুল লোকের সাথে দেখা করতে গিয়েছি আমরা।’

‘উপর থেকে নিচে যেতে হয়, এটুকুই শুধু মনে আছে আমার,’ বলল র‍্যাট। আর এই কথাটার মধ্যেই উত্তর মিলে গেল। ছয়টা সংখ্যাকে দুই ভাগে ভাগ করে নিলাম আমরা-৭৪৬ এবং ২২৯। ম্যাপের মধ্যে ৭৪ আর ২২ পাওয়া গেল, আর সেগুলো বরাবর দুটো কাল্পনিক সরলরেখা আঁকতে ঠিক ম্যাপের মধ্যাঞ্চলটায় একটা স্কয়ারের উপর ছেদ করল তারা। যেখানে গিয়ে মিলল সেই জায়গাটা একটা কবরস্থান। সত্যি কথা বলতে পুরো স্কয়ারটাই একটা কবরস্থান। বাকি ৬ আর ৯ দিয়ে যে কি বোঝানো হয়েছিল তা আমরা কখনও খুঁজে বের করতে পারিনি।

‘ফ্রিজটা একটা কবরস্থানের পাশেই নামিয়েছিল হোসে,’ নিচু গলায় বলে উঠল র‍্যাট। ‘সেই মালি এমনটাই বলেছিল।’

‘হোয়ার উই লে,’ ফিসফিস করে বললাম আমি। ‘যেখানে আমরা গুয়ে থাকি...অর্থাৎ, যেখানে আমাদের কবর দেয়া হয়।’

কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করল, তারপর তিনজনই একসাথে হাসতে শুরু করলাম-যতটা নিঃশব্দে পারা যায়। ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে, সারা রাত ধরে কাজ করেছি আমরা। আর অবশেষে পাওয়া গেছে সেই কাজের ফল। হাত ধরাধরি করে বসে রইলাম আমরা, গার্দো তো আমার মাথায় একটা চুমুই খেয়ে বসল। রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে, খুব কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা। শহরের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত কবরস্থানটা, নাম নারাতো। ওখানে গিয়ে ব্রাইটেস্ট লাইট-মানে সবচেয়ে উজ্জ্বল আলোটা খুঁজতে হবে আমাদের, যেটা খুব সম্ভব একটা বিশেষ কবর। অথবা চার্চের একটা অংশ। ময়লাকুড়ানো ছেলেগুলো আরও একবার পুলিশকে টেকা দিয়ে এগিয়ে গেছে।

অন্তত তখন পর্যন্ত আমাদের তেমনই ধারণা ছিল।

এবার ওরা এল চুপি চুপি।

জুন-জুন বলছি, কারণ আমার স্পষ্ট মনে আছে কি হয়েছিল। আমার কান সবচেয়ে ভাল, আমি সবচেয়ে ভালো লাফ দিতে পারি, সবচেয়ে ভালো দৌড়াতে পারি-ওরা বলতে পারে আমি বাড়িয়ে বলছি, কিন্তু এটাই সত্যি!

একদম ভোরবেলা এল ওরা, ভেবেছিল আমাদের ঘুমন্ত অবস্থায় ধরবে-সাদা পোশাক আর ইউনিফর্ম পরে, চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলল আমাদের। মোমবাতিগুলো নিভিয়ে ফেলেছিল ততক্ষণে গার্দো আর রাফায়েল। কাগজগুলো ভাঁজ করে রাখছি আমরা, এই সময় নিচের সিঁড়িতে একটা ভারি পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম।

কেন শব্দটা খেয়াল করলাম আমি, জানা নেই আমার। হোসে এবং গ্যাব্রিয়েল হয়তো সত্যিই ছিল আমাদের সাথে। রাফায়েল বলেছে, মৃতদের দিনে ওরা নাকি জীবিতদের খেয়াল রাখে। যাই হোক, আগেই বলেছি যে চারপাশটা খুব নিস্তব্ধ ছিল। সাধারণত এই সময়টায় বাড়ির নিচতলায় যে বুড়ি থাকে তার চেচামেচি শোনা যায়। দশটার মতো ছেলেমেয়ে আছে তার, আর সবগুলো ভোর হওয়ার আগেই নানা রকম দুষ্টুমি করার জন্য জেগে ওঠে। কিন্তু এমন কোনো শব্দ তখনও শুনতে পাইনি, যেটা ছিল অস্বাভাবিক। তাই চুপচাপ রইলাম আমরা, আর বোঝার চেষ্টা করলাম যে সকালের স্বাভাবিক শব্দগুলো সব গেল কোথায়।

কে জানে, হয়তো বুড়িই আমাদের ধরিয়ে দিয়েছিল? জানি না।

কে যেন নিচ তলায় কথা বলছে, শুনতে পেলাম আমি-চিন্তিত গলা। তারপরই ভারি পায়ের শব্দটা শুনতে পেলাম সিঁড়িতে-এত ভারি পা আর কারও নেই এই বিন্ডিঙে।

সরাসরি ছাদের আলগা অংশটার কাছে চলে গেলাম আমি, সরিয়ে ফেললাম ওটা।

রাফায়েল এত বেশি ভয় পেয়ে গেছে যে নড়তেই পারছিল না-একটা থাপ্পড় মেরে ওর হাঁশ ফিরিয়ে আনতে হলো। গার্দো আর ও মিলে যা কিছু

সাথে নেয়া যায় নিয়ে নিল। আস্তে আস্তে কাজ করছি আমরা-কোনো শব্দ করতে চাই না। পুলিশই যদি হয়ে থাকে, তাহলে আমরা চাই ঘরের ভেতর ঢুকে কিছুই দেখতে না পাক ওরা। আমরা ধারে কাছেই আছি, এই ভেবে এখানে আরও কিছুক্ষণ সময় কাটাতে পারে তাহলে। আর যাই হোক, আমাদের পালাতে দেখে ফেলুক ওরা-এটা আমরা কিছুতেই চাই না। আর সে জন্যই হাজার দুশ্চিন্তা আর ভয় সত্ত্বেও তাড়াহুড়ো করলাম না আমরা।

প্রথমে বের হলাম আমি, তারপর রাফায়েল, তারপর গার্দো। চিৎকার বা গুলির শব্দ শোনার জন্য কান পেতে আছি-আমার ধারণা, জায়গাটাকে ঘিরে ফেলেছে ওরা, ছাদের দিকেও নিশ্চয়ই খেয়াল রাখবে কেউ। কিন্তু না, তেমন কিছুই হলো না।

তারপর, নিচ থেকে ভেসে এল কারও কণ্ঠস্বর। গার্দোর নাম ধরে ডাকছে সে।

‘অ্যাঁই, গার্দো, তোর ভাই এসেছে!’

মিথ্যে কথা।

‘গার্দো? কোথায় তুই? তোর ভাই খুব অসুস্থ!’

আরও বড় মিথ্যে কথা। পালাতে হবে এখন থেকে।

মাথা নিচু করে ছাদের উপর কয়েক মুহূর্ত বসে রইলাম আমরা, তিনটে ভয়াব্র বেড়ালের মতো। তারপর এক এক করে চলে এলাম পাশের বাড়ির ছাদের উপর। একটা টিভি এরিয়াল সাহায্য করল আমাদের। চারপাশে ছড়িয়ে আছে নানা রকমের তার, সাবধান থাকলাম যেন কোনোটার সাথে স্পর্শ না লেগে যায়। কারেন্টের শক একবার খাওয়াই যথেষ্ট। দুই ছাদের মাঝখানে একটা নিচু জায়গায় চলে এলাম আমরা, যেখানে আমাদের দেখতে পাওয়ার কথা নয় কারও।

ভাগ্য এখনও সহায়তা করছে আমাদের।

নিজের ঘরের জানালায় বসে বসে সিগারেট টানছিল একটা লোক। আমাদের দিকেই চোখ তার। আরও কয়েকজন মানুষকে দেখতে পেলাম আমি-এক মহিলা ভেজা কাপড় নেড়ে দিচ্ছে, একটা কুকুরের সাথে খেলা করছে দুটো বাচ্চা। সবাই থমকে গিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল, কিন্তু একটা কথাও উচ্চারণ করল না কেউ। এমনকি কুকুরটাও ঘেউ ঘেউ করে উঠল না।

তারপরই নিচ থেকে ভেসে এল দুন্দাম আওয়াজ, দরজার গায়ে ধাক্কা

দিচ্ছে কেউ। কাজে লেগে গেছে পুলিশরা। একই সাথে শুনতে পেলাম
পায়ের শব্দ, চিৎকার চাঁচামেচি, বড় বড় কুকুরের গর্জন, আর গাড়ির
ইঞ্জিনের শব্দ। হঠাৎ করেই ছাদগুলোর উপর উঁকি দিল এক পুলিশের
মাথা। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছে, চোখ সরাসরি আমার দিকে।

চিৎকার করে কিছু একটা বলে উঠল সে, একটা হুইসেল লাগাল মুখে।
তারপর নিজের অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াতে দেখলাম তাকে। কিন্তু তখনও
সিঁড়ির উপর স্থির থাকতে বেশ কসরত করতে হচ্ছে তাকে, তাই তার
লক্ষ্যস্থির করার আগেই হাওয়া হয়ে গেলাম আমরা। আমাদের নিচে, আর
চারপাশে হট্টগোলে ফেটে পড়ছে যেন পৃথিবী।

রাফায়েল বলছি :

একই দিনে দুইবার প্রাণ হাতে নিয়ে পালানো? দুইবারই প্রচণ্ড ভয়াত ছিলাম আমরা, মনে হচ্ছিল বুকের মধ্যে এখনই ফেটে যাবে হৃৎপিণ্ডটা। তবে পরে যখন ব্যাপারগুলো নিয়ে চিন্তা করার সময় পেলাম, তখন মনে হয়েছিল-র্যাটকে এতবার এমন ধাওয়া খেতে হয়েছে, ধরা পড়তে হয়েছে যে ওর নিশ্চয়ই অতিরিক্ত কোনো একটা ইন্দ্রিয় তৈরি হয়েছে। স্টেশনে যখন থাকত ও, তখন সময়টা বেশ খারাপ ছিল। তবে বেহালাতেও একই রকম খারাপ হতে পারত পরিস্থিতি-অনেকেই মনে করতে পারে যে টিঙটিঙে ছেলেটাকে ধরে একটু হাতের সুখ করে নিতে পারলে মন্দ হয় না। তাই র্যাট যখনই কাউকে এগিয়ে আসতে দেখে, দৌড়ানোর জন্য তৈরি হয়ে যায় ওর পাদুটো।

পিস্তল হাতে যে পুলিশটাকে প্রথম দেখতে পেয়েছিলাম, সে খুব বেশি ক্ষীপ্র ছিল না। কিন্তু এমন আরও কতজন আছে কে জানে, আর তাদের সবাই যে একই রকম ধীরগতির হবে না এটাও জানা কথা। র্যাট রইল আমাদের সামনে। ছাদের কিনারে একটা নিচু দেয়ালের উপর উঠে পড়লাম আমরা, তারপর সেখান থেকে লাফ দিয়ে পড়লাম একটা গুদামঘরের লম্বা ছাদের উপর, সেটার কিনার ধরে দৌড়াতে লাগলাম। অল্প কিছুক্ষণের জন্য মনে হলো কেটে গেছে বিপদ, কিন্তু তারপরই নিচের মাটিতে দেখতে পেলাম আরেক পুলিশকে। আবারও সেই একই ঘটনা-পিস্তল বের করল সে, মুখে হুইসেল লাগাল। কিন্তু গুলি করার সুযোগ পেল না, কারণ তাকে দেখেই কয়েকটা চিমনির অন্য পাশে চলে এলাম আমরা, তারপর ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলাম। কিন্তু এই পুলিশটার কাছে রেডিও আছে, খুব তাড়াতাড়িই তার সঙ্গিরা ঘিরে ফেলবে আমাদের। দ্রুত চিন্তা করতে হবে এখন। র্যাটকে আরেকবার ধন্যবাদ জানানো উচিত, কারণ এই এলাকাটা ওর বেশ ভালো করে চেনা। এখানকার রাস্তার ছেলেদের সাথে ও-ই

সবচেয়ে বেশি সময় কাটিয়েছে। তাই সুযোগটা সবার আগে ওরই চোখে পড়ল, আর একটুও দ্বিধা না করে এগিয়ে গেল।

পাশের বিন্ডিংটাতেই ওই ছেলেপুলেগুলো থাকে। ওখানেই একটা পুরো রাত কাটিয়েছিলাম আমরা। র্যাট সাথে সাথেই বুঝে নিল যে ওদের মধ্যে মিশে যেতে হবে আমাদের। শত শত ছেলেকে একই সাথে কিভাবে ধরবে পুলিশ? এটা ছিল র্যাটের পক্ষ থেকে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের মতো একটা কাজ।

যে জায়গাটায় ওরা থাকে—মানে আমরা এখন যে জায়গার সামনে দাঁড়িয়ে আছি—সেটা হচ্ছে বড়, পুরনো একসারি এপার্টমেন্ট বিন্ডিং—বেশ কয়েক বছর আগে যেখানে আগুন ধরে গিয়েছিল। এখন সেগুলো পরিণত হয়েছে বড়, কালো, কুৎসিত সিমেন্টের তৈরি কিছু আকৃতিহীন দালানে, যেগুলো নিয়ে কি করা যায় কেউ জানে না। রাস্তার ছেলেদের দলটা এখানেই থাকে—এক শ’রও বেশি হবে সংখ্যায়। রাস্তাতেই বেঁচে থাকে ওরা, ভিক্ষা করে, চুরি চামারি করে, আর আরও অনেক কিছু করে যেগুলোর কথা আপনি শুনতে চাইবেন না। কখনও কখনও খেদিয়ে দেয়া হয় ওদের, আবার ফিরে আসে, আবার খেদিয়ে দেয়, আবার ফিরে আসে। এভাবেই চলে আসছে সব কিছু।

আমরা যে ছাদে রয়েছি সেটা শেষ হয়েছে ওই বিন্ডিংয়ের পাশটায়, তাই ইচ্ছে করলে লাফ দিয়ে জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়া যাবে। ছাদের কিনারে আসতেই দেখলাম ভেতরে বসে আছে কয়েকটা ছেলে, সকালের নাস্তার ব্যবস্থা করছে। একজন মুখ তুলে তাকিয়ে আমাদের দেখতে পেয়ে হাত নাড়ল।

বেশ লম্বা একটা লাফ দিতে হবে, তাই আমি আর গার্দো এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধায় পড়ে গেলাম। কিন্তু তারপর করলাম কাজটা। প্রথমে র্যাট, তারপর গার্দো, তারপর আমি...নিজেকে ছুঁড়ে দিলাম শূন্যে, আর ওরা আমাকে ধরে ফেলল। জানালার কিনারে লেগে রক্ত ঝেরিয়ে এল আমার শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে। আবার দৌড়াতে শুরু করলাম আমরা। ছেলেগুলো আমাদের দেখে এগিয়ে এসেছিল সাহায্য করতে চায়—আমাদের পালাতে দেখেই ওরা বুঝে নিল কোনো একটা সমস্যা হয়েছে, কারণ ওদের সবারই এমন পালানোর অভিজ্ঞতা আছে—তাই যেন পাগল হয়ে গেল সব।

একই সাথে দৌড়াতে শুরু করলাম আমরা। নিচে নামার সিঁড়ি পাওয়া গেল সামনে, সেটা ধরে সব দল বেঁধে নামতে শুরু করলাম-হাসছি, চেচাচ্ছি পাগলের মতো। বন্ধুদের উদ্দেশ্যে চিৎকার ছুঁড়ছে ছেলেদের দল। স্রোতের মতো নিচতলায় নেমে এল সবাই।

আর এটাই আমাদের জীবন বাঁচিয়েছিল, বাজি ধরে বলতে পারি।

রাস্তায় নেমে এলাম আমরা, চিৎকার করতে করতে ছড়িয়ে পড়লাম চতুর্দিকে। এক শ'রও বেশি হবো আমরা সংখ্যায়। দুটো পুলিশ কার দাঁড়িয়ে ছিল, আরেকটা সবে ঢুকছিল রাস্তায়। রেডিও, পিস্তল নিয়ে ওরা আমাদের বাঁধা দিতে চাইল, দুই হাত ছড়িয়ে ধরতে চাইল কয়েকজনকে। কিন্তু ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দলটা ওদের চাইতে সংখ্যায় অনেক বেশি। একজন একটা ছেলেকে ধরে ফেলল, সাথে সাথে বাকি সবাই ছিটকে সরে গেল তার কাছ থেকে-চিৎকার করছে, হাসছে, যেন খেলা পেয়েছে। রাস্তায় একটা ট্রাক তীক্ষ্ণ শব্দে ব্রেক কষতে বাধ্য হলো, তাল হারিয়ে ধাক্কা মারল একটা পুলিশ কারের গায়ে।

তারপর ঠিক পাখির মতোই এদিক ওদিক অদৃশ্য হয়ে গেলাম আমরা, এ গলি ও গলি আর দোকানপাটের কোণা দিয়ে হারিয়ে গেলাম বিভিন্ন জায়গায়। পুলিশরা আমাদের ধাওয়া করতে চাইল ঠিক, কিন্তু ওরা অসহায়। আমরা তিনজন, সাথে আরও পাঁচ কি ছয়টা ছেলে সরে এলাম এক দিকে। কিছুক্ষণ পর ওরা চলে গেল আরেক দিকে। আমরা তিনজন নিরাপদেই সরে এলাম, দৌড়ে চললাম যতক্ষণ পর্যন্ত রাস্তা না পাওয়া যায়।

তারপর অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটল।

অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো একটা কাজ করল গার্দো, যে-জন্য র‍্যাট সম্ভবত ওকে চুমু খেয়ে বসেছিল! যদিও পরে ও বারবার বলেছে যে, খায়নি। যাই হোক, সাথে থাকা টাকাগুলো উঁচু করে ধরে একটা ধীর গতিতে চলতে থাকা ট্যাক্সিক্যাবকে থামাল গার্দো। ড্রাইভার সম্ভবত এতই চমকে গেছিল যে অগ্রাহ্য করার চিন্তাই আসেনি তার মাথায়। আমাদের গায়ের গন্ধ পাওয়ার আগেই তার পেছনের সিটে উঠে বসলাম আমরা। কয়েক মিনিট পরেই সাউথ সুপারহাইওয়েতে উঠে এল ট্যাক্সি। স্বাভাবিকের চাইতে দ্বিগুণ ভাড়া পেয়ে ড্রাইভারের মুখেও হাসি ফুটেছে।

‘কোথায় যাবে তোমরা?’ বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল সে। ‘কোথায়

যাবে?’

‘নারাভো কবরস্থান,’ বললাম আমরা।

আর কোথায় যাব এখন? ম্যাপের ওই স্কয়ারটাই এখন আমাদের গন্তব্য।

আর আজকের বিশেষ দিনটায় আরেকটা মজার ব্যাপার খেয়াল করলাম—পুরো শহরের অর্ধেক মানুষই যেন ওই একই দিকে চলেছে। আমরা শুধু তাদের ভিড়ে মিশে গেলাম। আজ হচ্ছে ডে অফ দ্য ডেড, আর নারাভো হলো এই শহরের সবচেয়ে বড় কবরস্থান। ধনী, গরিব—সবাই যায় ওখানে। তাই আমরা শুধু নিচু হয়ে বসে রইলাম আমাদের সিটে, আর আমাদের ড্রাইভার তীরবেগে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চলল রাস্তা ধরে। বাস, ট্রাক—সব কিছুকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলল আমাদের ট্যাক্সি। রেডিও চালিয়ে দিল ড্রাইভার। গলা ছেড়ে গান গাইতে লাগলাম আমরা।

আকাশের আরও উপরে উঠে এল সূর্য। জানালার কাচ নামিয়ে দিয়ে আরও জোরে গান গাইতে শুরু করলাম এবার। কাজ এখনও শেষ হয়নি, ঠিক। কিন্তু আরও একটা দিন বেঁচে আছি আমরা—গান গাওয়ার উপলক্ষ্য হিসেবে এটাই বা কম কি!

আমার নাম ফ্রেদেরিকো গঞ্জ। আমি কবরফলক তৈরি করি।

ফাদার হুলিয়ার্ডের অনুরোধে অল্প কিছু তথ্য দিতে রাজি হয়েছি আমি। আপনি জানতে চেয়েছেন, ফাদার, তাই বলছি।

অন্য সব খদ্দেরের সাথে যেভাবে দেখা হয়, হোসে অ্যাঞ্জেলিকোর সাথেও সেভাবেই দেখা হয়েছিল। কবরস্থানের পাশের রাস্তাটায় আমার একটা ওয়াকশপ আছে, কফিন প্রস্তুতকারকদের দোকানটার ঠিক পাশেই। ছোট, সাধারণ পাথর দিয়েই বেশি কাজ করতে হয় আমাকে। আমি জানি যে আমার বেশিরভাগ খদ্দেরই বেশ গরীব, আর কবর ভাড়া নিতেই তাদের বেশিরভাগ টাকা খরচ হয়ে যায়। তাই আমি চেষ্টা করি সবচেয়ে কম খরচের মধ্যে তাদের কাজটা করে দিতে। কবরে একটা ফলক, একটা স্মৃতিচিহ্ন দিতেই হয়-যা সবাইকে মনে করিয়ে দেয়, এই পুরুষ, এই মহিলা, অথবা এই শিশু এক সময় জীবিত ছিল।

কিছু কিছু কবরে নামগুলো এমনকি রঙ বা কলম দিয়েও লেখা হয়। ভাবলেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। আমি বলি, পাথর দিয়ে কিছু একটা লেখা হোক, তাহলে কেউ কবরটা স্পর্শ করতে আসবে না। দরিদ্রদের এমনকি মাটির কবরও জোটে না, জানেন তো? এখানে এখন আর যথেষ্ট জায়গা নেই, তাই নারাভোতে কবরগুলো নিচ থেকে উপরেও তৈরি করা হয়। দরিদ্রদের ভাগ্যে যে কবর জোটে তা হলো কংক্রিটের বাস্ক, একটা কফিন রাখা যায় এত বড়। একটার উপর আরেকটা বাস্ক রাখা হয়-কখনও কখনও এমন বিশ সারি বাস্কও তৈরি হয়ে যায় এভাবে। এখানে শেষকৃত্য মানে হলো কফিনটাকে ওই বাস্কে ঢুকিয়ে দেয়া, তারপর বাস্কের মুখটা বন্ধ করে দিতে দেখা। আমার কাজের একটা অংশ হলো আমার বানানো পাথরের সমাধিফলকটাকে ওই বাস্কের মুখে বসিয়ে সিল করে দেয়া।

হোসে অ্যাঞ্জেলিকোর ছেলে যখন মারা গেল তখন আমার কাছে এসেছিল সে। যে দিন মেয়ের মারা যাওয়ার খবর নিয়ে আমার কাছে এল,

সে দিন তাকে দেখে মন খারাপ হয়েছিল আমার। মনে হয়েছিল, এই পৃথিবীতে আর কেউ রইল না মানুষটার।

হোসে অ্যাঞ্জেলিকো ছিল একজন হালকাপাতলা চেহারার মানুষ, যে সব সময় নিচু গলায় কথা বলত। এক ধনী লোকের বাড়িতে হাউসবয় হিসেবে কাজ করে সে-এর বেশি কিছু কখনও জানার সুযোগ হয়নি আমার। ভোরবেলায় আমার দরজায় এসে হাজির হয়েছিল সে, দেখে মনে হচ্ছিল অনেক দিন ধরে ভালমতো ঘুমায় না। আমাকে বলল, ওই দিন সকালের মধ্যেই কবরফলকটা বানিয়ে দিতে হবে-যেটা বেশ অস্বাভাবিক। কিন্তু হোসে আমাকে বলল, ফিউনারেল হোমের খরচ মেটানোর মতো টাকা নেই তার কাছে, তাই আজই ওখান থেকে নিয়ে আসতে হবে কফিনটা। খুব সাধারণ একটা শেষকৃত্য অনুষ্ঠান হবে, বলল সে। আত্মীয়স্বজনদের কেউ আসবে না।

যতটুকু পারি তাকে সাহুনা দিলাম আমি। অগ্রিম হিসেবে আমাকে দুই শ পেসো দিল সে। কাজ লেগে পড়লাম।

“পিয়া দান্তে অ্যাঞ্জেলিকো : প্রিয় সন্তান আমার, বীজ হতে ফসলে পরিণত হওয়ার কাজ শেষ হলো”—এই কথাগুলো কবর ফলকে লিখতে বলেছিল সে।

লেখাগুলো আমি নিজে খোদাই করিনি। আমার ছেলের বয়স দশ বছর, আর ইতোমধ্যেই পাথর কাটার কাজে দক্ষ হয়ে উঠেছে ও। মূল কাজটা ও করত আগে, আমি পালিশ করতাম। কিন্তু ইদানিং সবটুকুই ও নিজে করতে পারে, আর ওর নিজের স্টাইলও তৈরি করে নিয়েছে এর মধ্যেই—ছোট ছোট মোচড়, যেগুলো গম্ভীর শব্দগুলোর মধ্যে আরেকটু গাম্ভীর্য এনে দেয়। চার ঘন্টার মধ্যেই লেখার কাজ শেষ করে ফেলল ও। অফিসের একপাশে ফলকটা রেখে দিলাম আমরা।

কিভাবে জানব আমি, কথাগুলো ছিল মিথ্যে? অত্যন্ত সাদাসিধে, ভালমানুষ বলে মনে হয়েছিল লোকটাকে—চেহারায মিথ্যে বলার কোনো চিহ্নই ছিল না। সমাধিফলকটা নিয়ে নিজের ছোট্ট লেদার ব্যাগটা থেকে টাকা বের করে আমাকে দিয়েছিল সে। কফিনটাও ছিল তার সাথে—দুটো কমবয়েসী ছেলে বহন করে নিয়ে এসেছিল। দেখে মনে হচ্ছিল ঝাড়ুদার গোছের কেউ। কোনো পাদ্রী ছিল না প্রার্থনার জন্য। ওদের সাথে গেলাম

আমি, দেখলাম কফিনটা ঢুকিয়ে দেয়া হলো বাস্তবের মধ্যে। মৃত শিশুটির জন্য একটু প্রার্থনা করলাম আমরা। তারপর কবরের মুখ বন্ধ করে বসিয়ে দিলাম ফলকটা। লোকটার মুখে দুশ্চিন্তা আর শোক ছাড়া আর কিছুই ছিল না, সর্বস্ব হারানো একজন মানুষের মুখ যেমন হওয়া উচিত। মিথ্যের কোনো চিহ্ন ছিল না তার চেহারায়।

খবরের কাগজে যখন পড়লাম যে পুলিশ স্টেশনে মারা গেছে লোকটা, শুধু ভেবেছিলাম-আহা, বেচারী। খবরটা আমার ছেলেকে পড়ে শুনিয়েছিলাম আমি, তার জন্য প্রার্থনাও করেছিলাম দুজন মিলে।

স্টার এক্সট্রা :

পুলিশের অগ্রগতি

শহর পুলিশের একজন মুখপাত্র গতকাল রাতে জানিয়েছেন যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সূত্রে ‘যত্নের সাথে, পেশাদার উপায়ে এবং বিরতিহীনভাবে’ তদন্ত করা হচ্ছে, আর ভাইস প্রেসিডেন্টের বাড়ি থেকে যে অজানা অংকের টাকা চুরি হয়েছে তা শীঘ্রই উদ্ধার করা হবে। ‘এই পরিমাণের টাকা কখনও লুকিয়ে রাখা যায় না। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, কেউ না কেউ, কোথাও না কোথাও সব ফাঁস করে দেবেই। আর তখনই আমরা তাদের আক্রমণ করব।’

এর বেশি কিছু জানতে চাইলে তা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়। ‘আমরা অত্যন্ত নাজুক এক অবস্থায় রয়েছি। এমন সব মানুষের সাথে কথা বলছি যাদের পরিচয় গোপন রাখা জরুরি। এখন শুধু এটুকুই বলতে পারি যে খুব শীঘ্রই বড় কোনো অগ্রগতি হবে।’

ভাইস প্রেসিডেন্ট জাপান্টাকে ঘিরে রহস্যের ধূমজাল এই প্রথম দেখা যাচ্ছে না। এর আগেও তার বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযোগ এবং কেলেক্কারি উঠে এসেছে। পেশায় একজন প্রাক্তন উকিল হওয়ায় তার কাজ এবং আচরণের বিপক্ষে যে-সব আঙুল উঠে এসেছে তার অনেকের বিরুদ্ধেই দ্রুত মামলা করেছেন তিনি-আর আজ পর্যন্ত সে সব মামলার কোনোটায় তাকে হারতে দেখা যায়নি। সিনেটরের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, তিনি ‘বেশ দৃষ্টিভ্রান্ত থাকলেও এখনও আশা হারাননি।’

অন্যান্য সূত্র থেকে জানা গেছে, অপরাধি ছিল সিনেটরেরই গৃহ কর্মচারীদের একজন। প্রেসিডেন্ট নিজে গত বৃহস্পতিবার জাপান্টার বাড়িতে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, ‘আমাদের যে কোনো সহকর্মীর ক্ষতিকে আমরা সহানুভূতির সাথে গ্রহণ করি। চুরি হচ্ছে চুরি; আর যার কাছ থেকে চুরি হয় সে নিজেকে বিপদগ্রস্ত ভাবতে বাধ্য।’

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভাইস প্রেসিডেন্ট জাপান্টার মালিকানাধীন কোম্পানি “ফিড আস!” এর বিরুদ্ধে চলমান মামলায় তিনি একজন প্রধান সাক্ষি। কোম্পানিটি বিশ লক্ষ ডলার ঋণ রেখে নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করে, আর গত বছরের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সময় এই কোম্পানির বিরুদ্ধে আমদানিকৃত চালের দাম বৃদ্ধি করণে ভূমিকা রাখার অভিযোগ আনা হয়।

বর্তমানে বিচারটির চতুর্থ বছর চলছে। স্টার পত্রিকা জানাচ্ছে যে ভাইস প্রেসিডেন্ট পূর্বের মতোই এখনও সকল অভিযোগ অস্বীকার করে চলেছেন।

ইনকয়ারার

জাপান্টা শোকাভিভূত!

ভাইস প্রেসিডেন্ট সিনেটর রেজিস জাপান্টা, যিনি “আমরাই জনগণ” স্লোগান দিয়ে বিখ্যাত হয়েছেন-তার বাড়ি থেকে অজানা অংকের টাকা চুরির ঘটনায় অত্যন্ত শোকাহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। তার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের কাছ থেকে জানা গেছে, এই ঘটনার পর থেকেই তিনি প্রায় নিশ্চুপ হয়ে গেছেন, আর কখনও কখনও শুধু কষ্টের দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কোনো শব্দ তার মুখ থেকে বের হচ্ছে না। তার আরও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের বরাত দিয়ে জানা যায়, আমাদের প্রিয় ভাইস প্রেসিডেন্ট এতে অত্যন্ত ‘দ্রুত’, আর আমরা সকলেই জানি, সিনেটরের ক্রোধের ফলে অতীতে কি ঘটেছে।

তিন বছর আগে যখন সিনেটর জাপান্টা তার বিশাল সিনেমা/শপিং কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য একটি বস্তি উচ্ছেদ করতে পুলিশকে নির্দেশ দেন, তখন থেকেই তার কুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া তিনি অশিক্ষিত মানুষদের কাছে পৌছাতে যে নির্বাচনী পোস্টারটি ব্যবহার করেছিলেন সেটিও বিতর্ক ছড়ায়। পোস্টারে দেখানো হয়েছিল, হাস্যমুখ এতিম ছেলেরা তার নামের বানান সম্বলিত প্ল্যাকার্ড তুলে ধরে রেখেছে, যদিও সেই ছেলেদের এ কাজের জন্য কোনো সম্মানী দেয়া হয়নি।

ভাইস প্রেসিডেন্ট বরাবরই শিক্ষার বিস্তারের পক্ষে কথা বলে এসেছেন, যদিও তার গত দুই বছরের মেয়াদে শিক্ষার বাজেট ১৮ শতাংশ কমে গেছে।

এ ব্যাপারে তার কাছ থেকে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

“হায় হায়...!”

ডেইলি স্টার

মোহনের ডায়রি

সদাহাস্যময় রেজিস জাপান্টার চেহারায়ে এখন ভুকুটির চিহ্ন একটু বেশিই দৃশ্যমান, কারণটা সম্ভবত এই যে বাতাস আর তার অনুকূলে নেই! গুজবগুলো কি তাহলে সত্যি? সারা জীবন ধরে নিজেকে নিষ্পাপ দাবি করে আসা আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট কি তাহলে দুর্নীতির সাগরে গলা পর্যন্ত ডুবে আছেন?

সত্যিই যদি এক কোটি ডলার হারিয়ে থাকেন তিনি, তাহলে কেউ না কেউ এই প্রশ্ন নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে : আপনার বাড়িতে এক কোটি ডলার এলো কোথা থেকে, স্যার? নগদ টাকা আমাদের সবার দরকার, ঠিক, আমরা সবাই কিছু টাকা হাতের কাছে রাখি...কিন্তু তাই বলে, এটিএম মেশিন ঝামেলা করতে পারে এই ভয়ে কি কেউ এক কোটি ডলার নগদ রেখে দেয়?

যখন কারও বিছানার নিচে এক কোটি ডলার পাওয়া যাবে, তখন বুঝতে হবে হয় সে ট্যাক্স দিচ্ছে না, অথবা অন্যের দেয়া ট্যাক্সের টাকায় ভাগ বসচ্ছে।

আমি কিন্তু কথাটা বলিনি, স্যার-দয়া করে এই খবরের কাগজটা বন্ধ করে দেবেন না, আমার পরিবারকে গুলি করে মারবেন না!

ইউনিভার্সিটি ভয়েস

যথেষ্ট হয়েছে! বলছে ছাত্ররা

ভাইস প্রেসিডেন্ট সিনেটর রেজিস জাপান্টা যদি তার বাড়িতে কোটি কোটি ডলার নগদ রেখে থাকেন তাহলে তার অর্থ একটাই—তিনি এক দুর্নীতিগ্রস্ত পৃথিবীর সদস্য, আর কোনোভাবেই তাকে পুনর্বার নির্বাচিত করা উচিত হবে না। লোভি, দুর্নীতিপরায়ন বৃদ্ধদের সরাতে না পারলে এই দেশ কখনোই সামনে এগিয়ে যেতে পারবে না।

এখন সময় তরুণ রক্তের!

ডিপ্লোমা প্রোগ্রামে অধ্যয়নরত তরুণদের উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতার সময় এভাবেই নিজের মতামত ব্যক্তি করেন ছাত্র ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট চারুভি অ্যাডার্ম।

‘পাঁচ বছর আগে,’ তিনি বলেন, ‘জাপান্টা এই স্লোগানে জয়ি হয়েছিলেন—সবচেয়ে উজ্জ্বল হাসি, সবচেয়ে বুদ্ধিমান মন। আমি তার সাথে এই কথাগুলো যোগ করতে চাই—সবচেয়ে প্রশ্নবদ্ধ বিবেক, আর সবচেয়ে অন্ধকার হৃদয়। তিন দশক ধরে নিজের পকেট ভারি করে আসছেন তিনি, আর তার সবচেয়ে বড় অর্জন হলো এই দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আরও বেশি দুর্বল আর মূল্যহীন করে তোলা।’

এই দেশের এখন কি দরকার?

তিনটে জিনিস :

একটা বিপ্লব।

তারপর আরেকটা বিপ্লব।

আর যখন সব ঝামেলা মিটে যাবে—আরও একটা বিপ্লব।

অধ্যায় ১

রাফায়েল, গার্দো এবং জুন-জুন (র্যাট) :

আমাদের এখানে বছরের সবচেয়ে বড় উৎসবটা হচ্ছে ডে অফ দ্য ডেড-ক্রিসমাস আর ইস্টারকে একসাথে করলে যা হবে তার চাইতেও বড়। লক্ষ লক্ষ মোমবাতি জ্বালানো হয় এই সময়। মৃতদের অশরীরি আত্মারা ঘুরে বেড়ায় চারপাশে, সবাই যায় তাদের মৃত স্বজনদের সাথে দেখা করতে। কবর থেকে যেন উঠে আসে তারা, সম্ভাষণ জানায় সবাইকে।

সে কারণেই খুব দ্রুতই কমে এল আমাদের গাড়ির গতি। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল লম্বা এক ট্র্যাফিক জ্যামে আটকে গেছি আমরা। শেষ পর্যন্ত কবরস্থানের দিকে যে রাস্তাটা চলে গেছে তার মুখে নেমে পড়তে বাধ্য হলাম আমরা, তারপর হেঁটে হেঁটে এগোলাম সামনে। বাতাস ভারি হয়ে আছে ফুলের গন্ধে।

চারপাশে অসংখ্য মানুষের ভিড়।

বাচ্চা কোলে নিয়ে হাঁটছে লোকজন, বড় বড় পরিবার নিয়ে। পুরুষদের কারও কারও মাথায় টেবিল আর চেয়ার; বস্তা বা ট্রেলির উপর বিয়ারের কেস, বড় বড় পানির বোতল, সাথে বরফভর্তি ক্যারিয়ার। রাস্তা করে নেয়ার জন্য হইচই জুড়েছে সবাই। ছোট ছোট স্টোভ, খাবার, ভালো পোশাক পরা লোকজন-যেন মেলা বসেছে এখানে। নতুন জামা পরেছে বাচ্চা মেয়েরা, ছেলদের গলায় টাই-যদিও সকালটা আজ বেশ গরম। আজকের দিনে একসাথে হয় পরিবারের সবাই। কবরের পাশে সব কিছু গুছিয়ে বসে, মাঝরাত পর্যন্ত একসাথে খাওয়া হয়, পান হয়, আড্ডা হয়। সন্ধ্যা নাগাদ পুরো গোরস্থানে জ্বলে ওঠে মোমবাতি-আর তখনই নাকি দরকার হয় একটা অতিরিক্ত চেয়ার, একটা অতিরিক্ত টেবিল। তখন ঘাড় ঘোরালেই দেখা যায় মৃত দাদীমাকে, পাশেই বসে আছেন। যে পোশাকে কবর দেয়া হয়েছিল সেই পোশাকই পরনে, মুখে হাসি। শত শত গল্প বলার আছে তার। হারানো সন্তান তখন চারপাশে খেলে বেড়ায়। মৃত ভাইয়ের জীবদ্দশায় তার সাথে কোনো ঝগড়া হয়েছিল? শুধরে নেয়ার এটাই সময়।

ফাদার হুলিয়ার্ড একবার পুনরুত্থানের দিনের কথা বলেছিলেন র‍্যাটকে। আমাদের ধারণা, আজকের কথাই হয়তো বলেছিলেন তিনি।

র‍্যাট বলছে :

আমি নিজে কখনও দেখিনি, কিন্তু আমার পরিবারের কেউ তো এখানে নেই।

ভুতে বিশ্বাস করি অবশ্য আমি। সামপালো দ্বীপের লোকজন বলে ওরা নাকি কখনও কখনও সাগর থেকে উঠে আসে। বিশেষ করে যদি নৌকাডুবি হয়। গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে, সারা রাত বসে থাকে দরজার সামনে। অবশ্য আমি কি জানি? আমি নিজে কখনও দেখিনি।

আমাদের চারপাশে ধীরে ধীরে বাড়ছে ফুলের পরিমাণ। এক সময় এত বেশি হলো যে ফুলের গন্ধে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। বাইবেলের ছোট ছোট বাণী, প্লাস্টিকের মূর্তি, পোস্টকার্ড ইত্যাদি বিক্রি হচ্ছে অনেকগুলো দোকানে। লটারির টিকেট মুঠোয় নিয়ে চেষ্টা করে বেড়াচ্ছে বিক্রেতার দল। সব কিছুর পরে এলাম মোমবাতির দোকানের কাছে। কোনটা এত বড় যে বয়ে নেয়াই মুশকিল, কোনোটা আবার আঙুলের মতো সরু। তার পর থেকে শুরু হয়েছে খাবারের দোকান, চুটিয়ে ব্যবসা করছে। মাছ দিয়ে তৈরি কয়েকটা খাবার খেলাম আমরা। খিদে পেয়েছে, সকালে নাস্তা করা হয়নি।

রাফায়েল বলছে :

হাত থেকে রক্ত পরিস্কার করলাম আমি। গার্দো বলল, এবার একটা পরিকল্পনা করার সময় হয়েছে। বাইবেলটা খুলে খেতে খেতে পড়তে লাগলাম আমরা। রাস্তার তিনটে ছেলেকে অল সোলস' দ্রোঁতে বাইবেল পড়তে দেখলে কে-ই বা কি বলবে? আমাদেরও কেউ বিরক্ত করতে এল না। বাতাসের গতি বাড়ছিল আস্তে আস্তে। টাইফুন এগিয়ে আসছে, বুঝতে পারছিলাম। মোমবাতিগুলো জ্বালিয়ে রাখা বেশ মুশকিল হবে, তাই অনেককেই কাচের জার কিনতে দেখা গেল।

মাথা চুলকালাম আমি, বললাম, 'হোয়ার উই লে। লোকটাকে হয়তো এখানেই কবর দেয়া হয়েছে। কি মনে হয়?'

'কবরই জোটেনি তার কপালে,' বললাম আমি (গার্দো বলছে)। 'পুলিশ যদি তাকে খুন করে থাকে তাহলে এতক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে লাশ। তাছাড়া, এসব তো মারা যাওয়ার আগে লিখেছে সে।'

কথাটা ঠিক, একমত হলাম আমরা। কিন্তু সেই সাথে মনে হলো, যদি লোকটার স্ত্রীর কবর হয়ে থাকে এখানে? হোয়ার উই লে কথাটা দিয়ে হয়তো পারিবারিক গোরস্থানের কথা বুঝিয়েছে। তাই এমন কিছুই খুঁজব বলে ঠিক করলাম।

আবার র‍্যাট বলছি :

খারাপ লাগছিল আমার। বুঝতে পারছিলাম, এই কাজটা করতে হলে পড়তে জানতে হবে। পড়তে পারি না আমি, ফলে কোনো কাজে আসব না। তবে কিছু করার নেই, তাই খাওয়া শেষ করে কাজ শুরু করলাম আমরা। কাগজগুলো আর বাইবেলটা রইল আমার হাতে।

আগেই বলেছি, গোরস্থানটা অনেক বড়। গেট থেকে ভেতরের দিকে ডান এবং বামে চলে গেছে অনেকগুলো সরু সরু রাস্তা, মাইলকে মাইল লম্বা। একটু পরেই কবর, গাছপালা আর স্মৃতিস্তম্ভের আড়ালে হারিয়ে গেলাম আমরা। ঝোপঝাড় আর গাছপালা ভর্তি। মাঝে মাঝেই তাদের মধ্য থেকে উঁকি দিচ্ছে ডানাওয়ালা, সৌম্য চেহারার দেবদূত। উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ম্যাডোনা, ছোট্ট ক্রসের উপর কাঁদছে যিশু। এর আগে কখনও এত বেশি মূর্তি দেখিনি আমি, দেখতে গিয়ে আরেকটু হলেই আলাদা হয়ে যাচ্ছিলাম বাকিদের কাছ থেকে।

টেবিলগুলো সাজিয়ে ফেলা হয়েছে। খাবার-দাবার দিয়ে বসছে সবাই। পার্টিও শুরু হয়ে গেল। একটু পরেই রাফায়েল আর গার্দো বুঝে গেল যে এত নামের মধ্যে একটা বিশেষ নাম খুঁজে পাওয়ার কোনো উপায় নেই।

‘খোঁজ নিয়ে দেখা যেতে পারে,’ বলল রাফায়েল। ‘কবরস্থানের অফিসে নামের তালিকা পাওয়া যাবে। খুব বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলব নাকি তাহলে?’

‘এখন সবই ঝুঁকির ব্যাপার,’ এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বলল গার্দো। ‘তাই ছিল বরাবর।’

তখন বললাম, কাজটা আমি করব। বললাম, ‘ভান করব যে মিসেস অ্যাঞ্জেলিকো আমার খুব উপকার করেছিলেন, তাই তাকে ধন্যবাদ দিতে এসেছি।’

গার্দো কিছুটা টাকা দিল আমার কাছে-মার্কোর ওই ঘটনাটার পর টাকাগুলো ওর কাছেই থাকে। ‘কিছু ফুল কিনে নিও,’ বলল ও। ‘ভাল দেখাবে।’

তাই করলাম আমি। প্রায় তিন ঘন্টা সময় লেগে গেল। লোকজনের বিশাল লাইন লেগে আছে, আর কয়েকবার আমাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়া হলো। শেষ পর্যন্ত এক গার্ডের সাথে দেখা হতে সে বলল, নামের তালিকা খুঁজতে হলে বিশ পেসো লাগবে। কথাটা মিথ্যা, তবুও দিলাম আমি। তারপর বসেই রইলাম ফুল নিয়ে। লোকটা গেল তো গেলই, আর আসে না। নানা রকম লোকজনের সাথে প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে বিকেল শেষ করে আনল প্রায়, তারপর শেষ পর্যন্ত তার কাছ থেকে পাওয়া গেল একটা কাগজের টুকরো। আর গার্দো ভেবেছিল আমি মদ গিলছিলাম।

‘বি চব্বিশ বাই আট,’ বললাম রাফায়েলকে। ‘লোকটা বলেছে, “ঢালের উপর উঠে একটা গোলাপি দেবদূত খুঁজতে হবে।”’

‘অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে,’ বলল গার্দো। ‘অন্ধকারে গোলাপি রঙ দেখা যায় তো?’

আবারও সামনে এগোতে শুরু করল রাফায়েল, শক্তি ফিরে পেয়েছে।

রাফায়েল বলছি :

চারপাশে ব্যস্ততা ক্রমে বাড়তে শুরু করেছে কারণ দিনের সবচেয়ে ব্যস্ত সময়টা শুরু হবে এখন। আগুন জ্বালিয়ে বারবিকিউয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে, নানা রকম খাবারও বিক্রি হচ্ছে তার পাশাপাশি। ভালো ভালো পোশাক পরা ধনী লোকজন রয়েছে এমন একটা এলাকায় চলে এসেছি আমরা। নিজেদের আরও বেশি নোংরা মনে হতে লাগল। কিন্তু কিছু করার নেই। তাছাড়া আমাদের দিকে কেউ একবার ফিরেও দেখছিল না। এনে হচ্ছিল আমরাই যেন ভুত।

বিশ মিনিট পর ঢালের মাথায় পৌছাতে পারলাম।

চারপাশে অসংখ্য দেবদূত দাঁড়িয়ে আছে। রাতের অন্ধকার নেমে আসতে শুরু করেছে, এদের মধ্যে গোলাপি মূর্তি খুঁজে বের করা খুব কঠিন। আমাদের সময় নষ্ট করানোর জন্য গার্ডটাকে গালি দিয়ে উঠতে যাচ্ছি, এই সময় গার্দোর চোখে পড়ল একটা মূর্তি-প্রায় ট্রাকের সমান বড় একটা কবরের উপর দাঁড়িয়ে আছে। মোমবাতির আলোতেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে

উজ্জ্বল গোলাপি রঙ। শহরের দিকে তাকিয়ে আছে মূর্তির চোখ, হাত উপরে—যেন এইমাত্র দারুণ একটা গোল দিয়ে এল। চারপাশে বসে আছে বেশ বড় একটা পরিবার। তাস খেলছে তারা। ব্র্যাণ্ডির বোতল ছড়িয়ে আছে এখানে ওখানে। আরও লোকজন এসে যোগ দিল তাদের সাথে, আলিঙ্গন করল পরস্পরকে।

তাদের দিকে না গিয়ে আশপাশের কবরগুলোর মধ্য দিয়ে হাঁটতে লাগলাম আমরা। ভাবছি, বি চব্বিশ বাই আট মানে কি বোঝানো হতে পারে। সেই সাথে খুঁজছি ‘অ্যাঞ্জেলিকো’ নামের কোন কবর পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু তেমন কিছুই চোখে পড়ছে না।

একটু পরেই পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে এল। নামগুলো আর পড়তে পারছিলাম না আমরা। তাই আবার ফিরে গেলাম গোলাপি মূর্তিটার কাছে। তারপর কাছের একটা দেয়ালে উঠে বসে ভাবতে লাগলাম, এবার কি করা যায়।

তখনই হঠাৎ বুঝতে পারলাম, সবচেয়ে উজ্জ্বল আলো বলতে আসলে কি বোঝানো হয়েছিল।

রাফায়েল, গার্দো এবং জুন-জুন (র্যাট) :

ভুল জায়গায় খুঁজছিলাম আমরা। আর ওই বোকা গার্ডটা সম্ভবত ভেবেছিল, কবরস্থানটা আমাদের পরিচিত, তাই ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন বোধ করেছিল। অথবা সে খুব বেশি অলস। গোরস্থানটা আসলে মাঝখানে একটা দেয়াল দিয়ে দুই ভাগে ভাগ করা। একপাশে রয়েছে ধনীদের জায়গা, যেখানে মৃতদের সত্যিকারভাবে কবর দেয়া হয়। আর আরেক পাশটা দরিদ্রদের জন্য নির্দিষ্ট, তাদের কেবল একটার উপর আরেকটা বাক্সের মতো কবরে শুইয়ে রাখা হয়।

ধনীদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সারা দিন হেঁটে হেঁটে সময় নষ্ট করেছি আমরা, অথচ আমাদের থাকা উচিত ছিল দেয়ালের ওই পাশে। সবচেয়ে উজ্জ্বল আলো বলতে বোঝানো হয়েছে ওই অংশকেই। সারা দিনের কাজের পর সবাই জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে ভিড় করেছে ওখানে। দিনের আলোর মতো উজ্জ্বল চারপাশ, মনে হচ্ছে অসংখ্য মোমের নদী বয়ে আসছে এই অংশের দিকে।

বি চব্বিশ বাই আট নিশ্চয়ই ওখানকার কোনো একটা কংক্রিট বাক্সের নাম্বার।

রাফায়েল বলছি :

আমার মনে আছে, আমার দিকে তাকিয়ে হাসল গার্দো। আর র্যাট আবার জড়িয়ে ধরল আমাকে, কারণ রহস্যের সমাধান করে ফেলেছি আমরা। লাফ দিয়ে নেমে এলাম আমরা, তারপর একটা ছোট দরজা দিয়ে চলে গেলাম গোরস্থানের ওপাশে। সাথে সাথেই একটা ছাইন চোখে পড়ল, মোমবাতির আলোতে পড়লাম-জি নয়। তাই ওটার পাশ কাটিয়ে সামনে এগোতে শুরু করলাম, বুঝতে চাইছি কিভাবে সাজানো হয়েছে সব।

জায়গাটা একটা শহরের মতো; লোকজন এখানে বাস করে, আর তাদের বাড়িও আছে এখানে। ছোট ছোট বস্তি, কবর-বাক্সগুলোর পেছন

দিকে গড়ে উঠেছে। বাস্তুগুলোর একদম উপরেও আছে কিছু-ছোট ছোট ছাউনি আর কুঁড়েঘর। মই দিয়ে বানানো হয়েছে উপরে ওঠার ব্যবস্থা। নিচ থেকে দেখলাম, ঘুড়ি নিয়ে কয়েকটা শিশু দৌড়ে বেড়াচ্ছে উপরে। আন্টির বলা একটা কথা মনে পড়ে গেল আমার : এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে মানুষ বসতি করবে না।’

অনেকগুলো কবর পার হয়ে এলাম আমরা।

সবচেয়ে মন খারাপ হয় ওই কবরগুলোকে দেখলে-যেগুলোর মুখ খোলা। ভেঙে ফেলা হয়েছে সেগুলো। গল্পটা সবাই জানে। চোখ সরিয়ে না নিয়ে পারলাম না আমি। প্রতিটি বাস্তু ভাড়া দেয়া হয় পাঁচ বছরের জন্য, আড়াই হাজার পেসোর বিনিময়ে। কেনা যায় না এগুলো, শুধু ভাড়া করা যায়। পাঁচ বছর পর আবার টাকা দিতে হয়, না হলে ফিরিয়ে দিতে হয় বাস্তু। মানুষ তো সারা জীবন এক জায়গায় থাকে না, আবার কেউ কেউ হয়তো টাকা খরচ করে ফেলে, বা অন্য কোনো কারণে ভাড়া মেটানো হয় না। তখন কি হয়? হাতুড়ির বাড়ি পড়ে। সিল ভেঙে মৃতদেহটা বের করে আনা হয়। কবরস্থানের একটা জায়গা আছে, পুরনো হাড়গোড় ফেলে দেয়া হয় সেখানে। কারও সন্তান, কারও দাদীমা-চলে গেল আবর্জনার মধ্যে। ফাঁকা গর্তগুলো ভয় পাইয়ে দিল আমাকে, কারণ এর চাইতে বিষন্ন আর কিছু হতে পারে না। কখনও কখনও কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত মৃতগুলো রেখে দেয়া হয়, আশা করা হয় যে কেউ হয়তো ভাড়া নিয়ে আসবে। এভাবে মানুষকে ফেলে দিতে কি কারও ভালো লাগে?

গার্দো বলছি :

মোটামুটি বুঝতে শুরু করেছি এবার।

গোরস্থানের পেছন দিক দিয়ে এগোলাম আমরা, মাঝখানে কথা বললাম কবরগুলোর উপরে বসে থাকা কয়েকটা ছেলের সাথে। আঙুল তাক করে আমাদের ডি সারিটা দেখিয়ে দিল ওরা। তার পরেই পেলাম সিঁড়ি আর বি। তারপর গুনতে গুনতে এগোলাম সামনে-পনেরো, বিশ, ত্রিশ। চারটে কবর পরে পাওয়া গেল তাকে : ছোট্ট একটা ফলকের উপর লেখা : মারিয়া অ্যাঞ্জেলিকো, হোসে অ্যাঞ্জেলিকোর স্ত্রী। রাফায়েল আর আমি কবরটার উপরে উঠে ঝুঁকে এলাম সবটুকু পড়ে দেখার জন্য, কারণ এর পরের লেখাগুলো খুব ছোট। সেখানে লেখা : সবচেয়ে উজ্জ্বল আলো। ঠাণ্ডা হয়ে এল আমার শরীর, কারণ এই কথাগুলোই অনুসরণ করে এসেছি আমরা।

এখন পর্যন্ত যা দেখেছি তাতে বুঝতে পারছি যে শেষের খুব কাছাকাছি চলে এসেছি। লেখাগুলোর চারপাশে কালি লেগে আছে, নিচে জ্বালানো মোমবাতিগুলোর কারণে। লেখাগুলো র্যাটকে পড়ে শোনাল রাফায়েল। চার পাশে অনেক মানুষের কোলাহল, তাই জোরে কথা বলতে হলো তাকে। বক্সের নিচে তাকিয়ে আরেকটা কবর চোখে পড়ল, সেটা পড়লাম আমিঃ

‘ইলাদিও জো অ্যাঞ্জেলিকো। আমার প্রিয় পুত্র।’

আমার কাঁধ চেপে ধরল রাফায়েল, বলল, ‘সঠিক জায়গাতেই এসেছি আমরা! এটা হলো তার ছেলের কবর।’

‘বললাম, ‘বুঝতে পেরেছি।’ এতটুকু তো পরিষ্কার। কিন্তু সেই সাথে আরেকটা চিন্তা ঘুরছে আমার মনে...কি পাওয়া যাবে এখানে? বেচারী লোকটার পরিবারের সদস্যদের কবর খুঁজে পেয়েছি আমরা, ঠিক-কিন্তু তাতে কি আসে যায়? যে লোকটার ওয়ালেট আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম ময়লার ভাগাড়ে, স্ত্রী আর সন্তানকে হারিয়েছে সে। আর আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি তার টাকাগুলো। সেগুলো কি এখানে কোথাও লুকিয়েছে সে? মনে হয় না।

‘যেখানে থাকা উচিত সেখানেই আছি আমরা,’ বললাম আমি। ‘কিন্তু টাকাগুলো কোনো কবরের মধ্যে ঢোকাতে পারে না সে।’

‘তা ঠিক,’ বলল র্যাট। ‘কিন্তু তাহলে আর কি হতে পারে?’

‘ওটা কি?’ উপরের দিকে তাকিয়ে বলল রাফায়েল। ‘ওটা কি তার কবর?’

লোকটার স্ত্রীর উপরের কবরটার দিকে তাকিয়ে আছে সে। নামটা পড়তে বেশ কসরত করতে হলো আমাকে। আলো বেশ কম, তাই লেখাগুলো পড়া কঠিন। একটা মোমবাতি এগিয়ে দিল র্যাট। ধীরে ধীরে লেখাগুলো স্পষ্ট হলো, রাফায়েলও সাহায্য করল।

‘ফসলের...’ পড়লাম আমি। ‘আবার সেই ফসলের কথা বলছে...তারপর : বীজ। আমার। সন্তান। ইহা...লেখাটা অনেক বড়, ঠিক দেখতে পাচ্ছি না।’

‘সমাপ্ত হইল,’ তিনজন একসাথে পড়লাম আমরা।

‘ইহা সমাপ্ত হইল,’ বললাম আমি। ‘ইহা সমাপ্ত হইল। ভালোবাসা, আর...আশা। আর তারপর একটা নাম-ছোট্ট একটা নাম,’ বলে সেটার উপর আঙুল রাখলাম আমি।

রাফায়েল ।

নামটা হলো পিয়া । তারপর দান্তে । পিয়া দান্তে । র্যাটের দিকে তাকালাম আমি, প্রচণ্ড মন খারাপ হয়ে গেছে আমার । ‘এটা হলো লোকটার মেয়ে ।’

ছবিটার কথা মনে পড়ল আমার-গম্ভীর চোখের সেই স্কুলড্রেস পরা মেয়েটা । কি যে খারাপ লাগল! আমরা সবাই ভেবেছিলাম ও বেঁচে আছে, অন্তত তেমনই আশা করেছিলাম ।

র্যাট বলল, ‘লোকটা সবাইকে হারিয়েছে...’

‘মেয়েকে তো স্কুলে পাঠিয়েছিল সে,’ বললাম আমি । ‘খবরের কাগজে তেমনই পড়েছিলাম ।’

‘চিঠিতেও ছিল কথাটা,’ বলল গার্দো । ‘মি. ওলেন্দ্রিজের কাছে যে চিঠিটা লিখেছিল সে । “যদি চিঠিটা তোমার হাতে যায়, তাহলে বুঝবে ধরা পড়ে গেছি আমি । আমার মেয়ের খোঁজ কোরো-তোমার সবটুকু ক্ষমতা কাজে লাগিও ।”’

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলাম আমরা, তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠলাম আমি ।

‘এখন?’ প্রশ্ন করলাম ওদের । ‘কি ঘটবে বলে আশা করছি আমরা? কি করব এখন?’

‘আমি জানি না,’ জবাব দিল গার্দো ।

‘কোনো ম্যাসেজ, হয়তো?’ বললাম আমি । ‘কোথাও কোনো ম্যাসেজ আছে কিনা...’

‘কোথায়?’ প্রশ্ন করল র্যাট । ‘কোথায় মেসেজ রাখবে সে?’

সবাই এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম, ভাবছি হয়তো কোনো সূত্র পাওয়া যাবে । কিন্তু কোনো লাভ হলো না । শেষ পর্যন্ত একটা কানাগলির মধ্যে পড়ে গেছি আমরা ।

‘এত দূর তো আসলাম,’ স্বভাব অনুযায়ী রেগে উঠতে শুরু করেছে গার্দো । ‘কিছু তো নিশ্চয়ই আছে!’

‘কিছুই নেই,’ বলল র্যাট । ‘কোথায় খুঁজব জানি না, কি খুঁজব তা-ও জানি না । আমার মনে হয় কিছু করতে পারার আগেই লোকটাকে ধরে নিয়ে

খুন করে ফেলেছিল ওরা।’

‘পুলিশ এখানে আমাদের আগেই চলে এসে থাকলে?’ বললাম আমি।
‘অন্য কোনো উপায়ে হয়তো হৃদিস বের করে ফেলছিল ওরা।’

মাটিতে বসে পড়ল গার্দো। ‘এত ঝামেলা কেন এই ব্যাপারটায়?’

ওর পাশে বসলাম আমি। অনেকক্ষণ বসে বসে কেবল ভাবলাম, কিন্তু কোনো কুল কিনারা পেলাম না। আমাদের পাশে কিছুক্ষণ পর একটা বড় পরিবার এসে জমায়েত হলো। হাতে অনেকগুলো মোমবাতি আর রান্নার স্টোভ। তাদের কাছ থেকে সরে আরেকটু নির্জন, নিস্তব্ধ জায়গায় চলে এলাম আমরা।

‘দেখো,’ বললাম আমি। ‘লোকটার যদি সত্যিই এতগুলো টাকা নিয়ে পালিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সে তার স্ত্রী আর ছেলেমেয়ের সাথে টাকাগুলো কবর দেবে কেন এখানে?’

‘যাতে পরে এসে নিয়ে যেতে পারে,’ বলল র‍্যাট। ‘যে কবরের ভাড়া মেটান আছে সেটা নিশ্চয়ই কেউ খুলে দেখতে যাবে না?’

‘পুলিশ দেখবে,’ বলল গার্দো। ‘যদি ওদের সামান্যতম সন্দেহও হয়ে থাকে। সে জন্যই সব কিছু কোডে লিখেছে লোকটা। পুলিশ যদি আমাদের আগে চিঠিটা পেয়ে যেত, আমরা যা করেছি তাই করত...মানে কারাগারে গিয়ে গ্যাব্রিয়েলের সাথে দেখা করত, তাহলে তাদের কাছে কিছুতেই চিঠি আর বাইবেলের কথা বলত না সে। যার অর্থ হলো, ওদের এই পর্যন্ত পৌঁছানোর কোনো সম্ভাবনা ছিল না।’ হাসল ও। তারপর আমাদের সবার মনের কথাটাই মুখে উচ্চারণ করল : ‘লোকটার মাথায় বুদ্ধি ছিল।’

‘ঠিক আছে,’ বলল র‍্যাট। ‘তাহলে হোসে অ্যাঞ্জেলিকো জানত যে গ্যাব্রিয়েল ওলেন্দ্রিজকে বিশ্বাস করা যায়। গ্যাব্রিয়েলকে অনেকটা এই টাকার রক্ষাকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। তাকে ছাড়া কিছুতেই এর সন্ধান পাওয়া সম্ভব হতো না। অবশ্য, টাকাটা যদি এখানে থেকে থাকে তো।’

‘আছে বলে মনে হয় তোমার?’ বললাম আমি।

‘ওগুলোর কোনোটাতেই আছে,’ বলল গার্দো। ‘হয়তো।’

‘কবর তিনটে খুলে দেখতে চাস?’ বললাম আমি। এমন একটা কাজের কথা বলছি সেটা ভাবতে আমার নিজেরই বিস্ময় লাগছে। কাজটা করতে পারব না, জানা আছে আমার।

উঠে দাঁড়াল গার্দো। পায়চারি করতে শুরু করল। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, চোখগুলো বিস্ফারিত হয়ে উঠছে ওর, প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে রাগের পরিমাণ। ‘এটা হতে পারে না!’ বলে উঠল ও। ‘এমন কাজ করা মোটেই উচিত না! পরিবারের সদস্যদের কবর কখনও খুলে দেখতে যায় না কেউ। আচ্ছা, যদি খালি কবর হয়? হয়তো কাছের ভাঙা কবরগুলোর কোনোটাতে...’

চারপাশে তাকালাম আমরা। বেশ কয়েকটা এমন কবর দেখা গেল। ভেতরে উঁকি দিল আবর্জনা, অথবা হাড়গোড় চোখে পড়ে। কে ঘাটাঘাটি করতে যাবে ওর মধ্যে? একটা ব্যাপার নিশ্চিত, মূল্যবান কিছু ওখানে রাখতে যাবে না কেউ। সত্যিই রেগে উঠতে শুরু করেছে গার্দো—কারণটা বুঝতে একটুও অসুবিধে হচ্ছে না আমার। এত দূর এসেছি আমরা, বারবার পালাতে হয়েছে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার হাত থেকে—একটুর জন্য ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে গার্দো, মারামারি করে এসেছে এক গার্ডের সাথে...এই সব তাহলে বৃথা যাবে? আমার দিকে তাকাল ও। বলল, ‘এবার কি করব আমরা, রাফায়েল?’

উত্তর দিতে পারলাম না আমি। শুধু তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। আমাদের দুজনের উপর পালা করে ঘুরে বেড়াতে লাগল র্যাটের চোখ।

মাথা নিচু করে বসে আছি আমরা, ঠিক এই সময় ভেসে এল কণ্ঠস্বরটা।

নিচু গলা, বাচ্চাদের মতো। আমাদেরকেই ডাকছে, কিন্তু বাতাস প্রায় উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইল শব্দটা। তবুও কোনো রকমে ডাকটা পৌঁছাল আমাদের কানে। মুখ তুলে তাকালাম সবাই। একটা ছোট্ট মেয়েকে দেখতে পেলাম।

‘কি খুঁজছ তোমরা?’ প্রশ্ন করল সে।

রাফায়েল, গার্দো এবং জুন-জুন (র্যাট) :

আমাদের সামনে, কবরগুলোর একদম উপরে বসে আছে মেয়েটা, মাথা নিচু করে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। দেখাই যাচ্ছে না প্রায়। এমনতেই মেয়েটা আকারে ছোটখাট, তারপর আবার মোমের আলোও পৌঁছাচ্ছে না ভালভাবে। লম্বা কালো চুল মেয়েটার। চুপচাপ বসে আছে, হাতদুটো কোলের উপর। স্কুল ডেস পরে আছে সে।

‘কি বললে?’ প্রশ্ন করল র্যাট।

‘কাকে খুঁজছ তোমরা?’ বলল ছোট মেয়েটা।

রাফায়েল জবাব দিল : ‘হোসে অ্যাঞ্জেলিকো।’

‘মনে হয় আসবে না,’ বলল মেয়েটা।

কি বলব কেউই বুঝতে পারলাম না এক মুহূর্তের জন্য। তারপর গার্দো জিজ্ঞেস করল, ‘সে কি আসবে বলেছিল? কখন?’

সবাই মুখ তুলে তাকিয়ে আছি তার দিকে। আর আমাদের দিকে মাথা নিচু করে চেয়ে আছে মেয়েটা, মূর্তির মতো স্থির। বাতাসে উড়ছে চুল, সে নড়ছে না।

‘এক সপ্তাহ আগে,’ নিচু গলায় বলল মেয়েটা। ‘আমি অপেক্ষা করছি তার জন্য।’

গার্দো বলল, ‘আমারও তাই মনে হয়-আসবে না সে। তুমি নেমে এসো না কেন এখানে?’

‘তোমার নাম কি?’ নরম গলায় জানতে চাইল র্যাট। ‘কি খুঁজছ তুমি?’

‘আমি কিছু খুঁজছি না,’ জবাব দিল মেয়েটা। ‘আমি এখানে তার জন্য অপেক্ষা করছি।’

‘কিন্তু তুমি থাকো কোথায়?’

‘এখানে। এখন আর জানি না আমি কোথায় থাকি।’

‘একাই? নাম কি তোমার, খুকি?’

‘পিয়া দান্তে,’ বলল মেয়েটা। ‘আমার নাম পিয়া দান্তে অ্যাঞ্জেলিকো।’

আমার বাবা, হোসে অ্যাঞ্জেলিকোর জন্য অপেক্ষা করছি আমি ।’

এখন, আমি (রাফায়েল) শুধু আমার কথা বলতে পারি-বাকিদের কি হয়েছিল জানি না, কিন্তু আমার মনে হলো যেন পুরো শরীর বরফ হয়ে গেল। র‍্যাটও চমকে উঠল সশব্দে, শুনতে পেলাম। এক পা পিছিয়ে গেল ও। এখনও চুল উড়ছে মেয়েটার, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তাকে। বাচ্চাদের মতো চিকন গলা। কিন্তু আমার মাথায় প্রথম যে চিন্তাটা এল তা হচ্ছে-নিশ্চয়ই ভুতের সাথে কথা বলছি আমরা। এই মেয়েটার কবরই দেখেছি একটু আগে!

নিজের কবরটার ঠিক উল্টো দিকেই বসে আছে মেয়েটা-বি পঁচিশ বাই আট, যে কবরে তার নিজের নাম লেখা, নতুন সমাধিফলকে। ডে অফ দ্য ডেড আজ, আর সেই দিনেই নিজের মৃত বাবার জন্য অপেক্ষা করছে সে। এ কেমন আশ্চর্য ঘটনা!

রাফায়েল, গার্দৌ এবং জুন-জুন (র্যাট) :

মেয়েটা অবশ্য ভুত ছিল না। একটু সামলে উঠে তাকে নিচে নেমে আসতে সাহায্য করলাম আমরা। উপরে গিয়ে ওকে সাহায্য করল র্যাট। মেয়েটা একেবারেই বাচ্চা। ঠিক করলাম, সবার আগে ওকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যেতে হবে। সব কিছু কেমন অদ্ভুত দিকে মোড় নিয়েছে। আমাদের সবার মাথাতেই একই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। কিন্তু আগে কিছুটা পরিস্কার করে নিতে হবে মাথাটা। ছোট্ট পিয়া খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে, দাঁড়াতেই পারছে না ঠিক মতো। আমাদেরও মনে পড়ল, পেটে তেমন কিছু পড়েনি সারা দিন। ভাবলাম, এত দূর যখন চলে এসেছি-পুলিশ আর এখানে আমাদের খোঁজ পাবে না। এবার চিন্তা করার জন্য একটু সময় নেয়া যেতে পারে।

টাকাগুলো গুনে দেখল গার্দৌ। প্রায় ফুরিয়ে এসেছে-কয়েক শ পেসো বাকি আছে শুধু। কিন্তু আমাদের সবারই খাবার দরকার-সবচেয়ে বেশি দরকার পিয়ার। গায়ে হাড় আর চামড়া ছাড়া কিছুই নেই, ময়লা হয়ে আছে কাপড়-দুর্গন্ধ বের হচ্ছে শরীর থেকে। কবরস্থান থেকে বের হয়ে একটা দোকানে বসে মুরগি আর ভাত কিনে খেলাম আমরা। একটু ভালো খাবার দরকার এবার। পথের শেষে চলে এসেছি আমরা। কাউকে কিছু বলার দরকার হলো না, কারণ সবাই বুঝতে পারছি কি হতে যাচ্ছে সামনে। উত্তেজিত বোধ করছি, ভয় লাগছে, সব মিলে অদ্ভুত অবস্থা তখন আমাদের। ঘামছি, অথচ শরীর ঠাণ্ডা-যেন জ্বর এসেছে।

র্যাট আর পিয়ার উচ্চতা প্রায় সমানই হচ্ছে। আমার আর গার্দৌর চাইতে মেয়েটার অবস্থা অনেক বেশি খারাপ। এটা সবার আগে ও-ই বুঝতে পারল। ওকেও এমন না খেয়ে থাকতে হয়েছে, তাই ওর জানা আছে এখন কি করতে হবে। খাবারে মুরগির ঝোল মিশিয়ে খুব ধীরে ধীরে মেয়েটাকে খাইয়ে দিতে লাগল র্যাট। পানি খাওয়াল, ছোট ছোট টুকরো করে একটা কলা খাওয়াল তারপর-যেন একটা বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে। এক দিক দিয়ে

চিন্তা করলে মেয়েটা শিশুই। ভয় পেয়েছে, কিন্তু শরীর এত বেশি দুর্বল যে কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। আমাদের ধারণা, র‍্যাটই ওর জীবন বাঁচিয়েছে।

মেয়েটা বলল, এক সপ্তাহ ধরে বাবার জন্য নারাভোতে অপেক্ষা করছে ও। ওর বাবা ওকে প্রায়ই নিয়ে আসত এখানে, কারণ ওর ছোট্ট ভাই আর মা-ও এখানে আছে।

কয়েকটা ছেলেমেয়ে ওকে খুঁজে পেয়ে কুঁড়েগুলোর একটায় নিয়ে গিয়েছিল। ওখানে একটু খেতে দিয়েছিল ওকে লোকজন, পরিচয় জানতে চেয়েছিল। মায়ের কবরের সামনে গিয়ে বসে থাকত ও। হয় নিজের উচ্চতার কারণে মায়ের কবরটার উপরের কবরের গায়ে নিজের নাম দেখতে পায়নি, অথবা দেখতে পেলেও কিছু বোঝেনি। ওর বাবা ওকে খবর পাঠিয়েছিল এখানে দেখা করার জন্য। ওকে যারা দেখাশোনা করত তারা ওকে এখানে রেখে চলে যায়। মেয়েটার বাবার মৃত্যুর খবর নিশ্চয়ই জানতে পেরেছিল তারা, বুঝতে পেরেছিল যে টাকা আসার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই মেয়েটার দিকেও আর কোনো আগ্রহ ছিল না তাদের।

পিয়া দান্তে এখন সম্পূর্ণ একা।

গার্দো বলছি :

দোকানের একটা ছেলের সাথে কথা বললাম আমরা, তারপর পঞ্চাশ পেসোর বিনিময়ে তার দোকানের পেছনের জায়গাটা ভাড়া নিলাম রাতের জন্য। ওখানে মেয়েটাকে শুইয়ে দিল র‍্যাট, তারপর একটা অতিরিক্ত চাদর এনে ঢেকে দিল। বাতাস এখন অনেক বেশি ঠাণ্ডা। মেয়েটার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দেখলাম ওকে, নিচু স্বরে কথা বলল ওর সাথে, সাহস দিল। তারপর আমার আর রাফায়েলের কাছে এগিয়ে এল-পানি দেখলাম ওর চোখে। কথাটা বলছি এই কারণে যে, ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ-এই একবারই র‍্যাটকে কাঁদতে দেখেছি আমরা।

আমরা জানি, এবার সময় সব কিছুর শেষটা দেখার। চায়ের অর্ডার দিলাম আমরা, আর আমি এবং গার্দো ব্র্যাণ্ডির একটা বোতল কিনলাম সত্তুর পেসো দিয়ে। তিন আঙুল করে খেলাম সবাই, কারণ সামনে অপেক্ষা করছে

সবচেয়ে কঠিন কাজটা। কিন্তু আরেক দিক দিয়ে ভাবলে যা হওয়ার তা হয়েই গেছে, এখন শুধু পরিণতিটা বাকি। পরিকল্পনাটা এত সহজ, এর বাইরে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই আমাদের। তিন আঙুলের বেশি দরকার হবে না, কারণ পরের কাজটার জন্য সাহস লাগবে আমাদের। এমনকি আমার ভাই, বন্ধু রাফায়েল যেমন সাহস দেখিয়েছিল পুলিশ স্টেশনে, তার চাইতেও বেশি-কারণ মধ্যরাতের পর কেউ কবরের কাছে যায় না আজকের রাতে। তখন থেকেই বাড়ি ফিরতে শুরু করে সবাই, একা হয়ে যায় প্রেতাত্মারা। আবারও বিষন্ন হয়ে ওঠে তারা তখন। তবে কি করতে হবে সে ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন নেই আমাদের মনে, কারণ এই প্রথমবার এমন একটা কাজ করতে যাচ্ছি যেটা সম্পর্কে কোনো সন্দেহও নেই আমাদের। একটু মদ খেয়ে নিলে নিশ্চয়ই দোষ দেয়া উচিত হবে না আমাদেরকে।

‘যন্ত্রপাতি লাগবে,’ বললাম আমি। পরামর্শ করে ঠিক করে নিলাম কি কি দরকার।

‘বের হওয়ার একটা রাস্তাও লাগবে,’ বলল রাফায়েল। যাওয়ার পথ ঠিক করে নিলাম আমরা।

আমি বললাম, ‘ষাট লক্ষ ডলার দেখতে কেমন হতে পারে?’ ব্র্যাডি সম্ভবত কাজ করতে শুরু করেছে, হাসি পাচ্ছে শুধু আমার। আমরা সবাই হাসতে শুরু করলাম-বেশ অনেকক্ষণ পর এই প্রথম। আর, ঠিক ওই মুহূর্তেও আমরা বুঝতে পারছিলাম যে টাকাগুলো আসলে আমাদের নয়, আমাদের হতে পারে না। ওর একটা অংশ আমরা চাচ্ছিলাম, এটা ঠিক। বুঝতে পারছিলাম, খুব কাছাকাছি চলে এসেছি। বাতাস যেন ফিসফিস করে বলে যাচ্ছিল সেই কথা। মাথার উপর যেন ভেসে বেড়াচ্ছিল প্রেতাত্মারা! এতগুলো টাকা-অবশ্য যদি সত্যিই থেকে থাকে ওখানে-ষাট লক্ষ ডলার। কিন্তু আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, আমরা কেউই ওগুলোকে নিজেদের মনে করিনি। সামান্য একটু অংশের চাইতে বেশি কিছু নেয়ার ইচ্ছা কখনই ছিল না আমাদের।

যন্ত্রপাতি খোঁজার জন্য আলাদা হয়ে গেলাম আমরা। ঠিক হলো, যত তাড়াতাড়ি পারি আবার এই কবরের কাছে মিলিত হবো সবাই। মুখে না বলেই সবাই বুঝতে পারছিলাম যে কবরের ফলকটা ভেঙে ভেতরে ঢুকতে হবে। রাফায়েল গিয়ে একটা বস্তা, আর একটা পুরনো ভাঙা ছুরি নিয়ে

এল। আমি গেলাম বস্তিগুলোর কাছে, যেখানে কবরস্থানের সীমানা শেষ হয়ে জলাভূমি, আর তারপর সাগরের সীমানা শুরু হয়েছে। শক্ত একটা লোহার রড পেলাম সেখানে। একটা নৌকা বেঁধে রাখা হয়েছিল ওর সাথে। তাই প্রথমে নৌকাটা একটা কাঠের গজাল দিয়ে বাধলাম, তারপর রডটা তুলে নিলাম। একটা দড়ি আর প্লাস্টিকের পাতলা শিট জোগাড় করে আনল র্যাট। এর বেশি কিছু দরকার হবে না আমাদের।

রাফায়েলকে বললাম আমি, ‘কাজটা দ্রুত করতে হবে। আর একবার শুরু করার পর আর থামা যাবে না।’ তার তিনজন জড়িয়ে ধরলাম পরস্পরকে।

রাফায়েল বলছি। গার্দোকে আমি বললাম, ‘অনেক শব্দ হবে কাজটা করার সময়। দ্রুত কাজ করব আমরা, ঠিক আছে?’ বলে ব্র্যান্ডির বোতলটা শেষ করে ফেললাম। আগের চাইতে বেশ চনমনে মনে হলো নিজেদের।

গার্দো বলছি, আবারও :

ছোট্ট পিয়ার কবরটার উপর উঠে এলাম আমি আর রাফায়েল। মনে হলো চারপাশ থেকে প্রেতাআরা তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। লোহার রডটা উঁচু করে ধরল রাফায়েল। একটা পাথর এগিয়ে দিল র্যাট।

সবাই চলে গেছে, আর নিভে গেছে বেশিরভাগ মোমবাতি। টাইফুনটা আরও কাছে চলে এসেছে আমাদের। বাতাসটা আগের চাইতেও বেড়েছে, ঠেলে ফেলে দিতে চাইছে আমাদের। গায়ে শার্ট নেই আমার, তাই সাগর থেকে উঠে আসা বাতাসটা সরাসরি লাগছে শরীরে। শপথ করে বলছি, চারপাশ থেকে মৃত মানুষগুলো সব যেন বড় বড় চোখে দেখছিল আমাদের। মনে হচ্ছিল মুখ তুললেই দেখতে পাব ওদের, তাই মাথা নিচু করে ছিলাম।

পাথরটা বেশ ভালো সাইজের। কবরফলকের এক কোণে রডের সূচালো প্রান্তটা চেপে ধরল রাফায়েল। পাথর দিয়ে গায়ের জোরে বাড়ি মারলাম আমি। বেশ ভারি, জোরালো, গম্ভীর একটা শব্দ শোনা গেল। ফলকটা সম্ভবত নতুন লাগানো হয়েছে, এখনও বেশি শক্ত হতে পারেনি। তবে দ্বিতীয় আঘাত লাগল পুরোপুরি ভাঙতে-তিন টুকরো হয়ে নিচে পড়ে গেল জিনিসটা। একটুর জন্য র্যাটের পায়ের উপর পড়ল না, কারণ লাফিয়ে

সরে গেল ও। তারপর দড়ি আর মোমবাতি নিয়ে উঠে এল উপরে। দ্রুত হাতে মোমবাতিগুলো জ্বালিয়ে কবরের ভেতর রাখতে লাগলাম আমরা, যাতে বাতাসে নিভে না যায়।

ভেতরের বাতাস গুমোট, কিন্তু কোনো দুর্গন্ধ নেই তাতে। একটা কফিন আছে সেখানে—ধবধবে সাদা রঙের, বাচ্চাদের আকারে তৈরি। আমার ধারণা আমরা সবাই ভয় পেলাম ওই মুহূর্তে। কফিনের উপর ধুলোর আস্তরণ পড়েছে—উপরে যে ফুলগুলো রাখা হয়েছিল সেগুলো শুকিয়ে গেছে সব। তাছাড়া আর কোথাও পচনের কোনো চিহ্ন নেই। কোনো দুর্গন্ধ লাগল না নাকে—আর মৃতদেহ থেকে কেমন গন্ধ আসে তা আমাদের সবারই জানা আছে, কারণ ময়লার ভাগাড়ে অনেক মৃত জীবজন্তুও ফেলা হয়। একবার একটা বাচ্চা ছেলের মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছিলাম আমি। ওই দুর্গন্ধের কথা আমার আজীবন মনে থাকবে।

ভাঙা পাথরের টুকরোগুলো ভেতর থেকে সরিয়ে ফেললাম আমরা, তারপর টেনে বের করে আনলাম কফিনটা।

রাফায়েল বলছি আবারও। গার্দো আগেই বলেছে যে বাতাস বাড়ছিল। সে কারণে আমরাও দ্রুত হাত চালাতে লাগলাম। কফিনের চারপাশে দড়ি বাধল র‍্যাট। তারপর নিজেও ঢুকে পড়ল কবরটার মধ্যে, যাতে ভালভাবে ধরতে পারে কফিনটাকে। কাঠের বাস্কে ভর্তি ষাট লক্ষ ডলারের ওজন আছে বেশ, বলে রাখি এই ফাঁকে। তবে এখনও আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না সেটা। শুধু আন্দাজ করছি যে টাকাগুলো এখানেই আছে। তবে ওই মুহূর্তে কফিনটার ওজন অনুভব করে আমাদের ধারণা আরও শক্তিশালী হলো। যদিও আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম যে দ্রুত কাজ সারতে হবে, কিন্তু ওই মুহূর্তে কফিনের মধ্যে কি আছে তা দেখার লোভ কেউই সামলাতে পারলাম না।

ছুরিটাকে ব্যবহার করলাম স্কু ড্রাইভারের মতো করে। আটকে দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে ডালাটা। আর আমি জানি, কফিনের ডালা তোলার কথা ভাবলেই পৃথিবীর সব ভূতপ্রেতের কথা ভিড় করে আসে মনে—মধ্যরাতে, এক গোরস্থানের মধ্যে—কিন্তু ওই মুহূর্তে আমাদের সবার মনেই একই কথা খেলা করছিল—তাই কোনো কথা না বলে ডালাটা উঁচু করলাম আমরা। গার্দো যেমন বলেছে, আমাদের দিকে যেন একদৃষ্টে চেয়ে রইল ভূতের দল।

আর হ্যাঁ, ইশ্বরকে ধন্যবাদ। টাকাগুলো রয়েছে ভেতরে।

টাকাগুলো রয়েছে কফিনে। এত সুন্দরভাবে এঁটে গেছে ভেতরে, যেন কফিনটা এই টাকা রাখার জন্যই বানানো হয়েছিল।

ষাট লক্ষ ডলার দেখতে কেমন, জানতে চান? ঠিক আছে, বলার চেষ্টা করি।

টাকাগুলোর পাশে বসে থাকা আমার কাছে ওগুলোকে দেখতে লাগল খাবার আর পানীয়ের মতো। এমন কিছু, যা আমার জীবন বদলে দেবে, এই শহর ছেড়ে চিরতরে চলে যাওয়ার সুযোগ করে দেবে। এক মুহূর্ত হতবাক হয়ে চেয়ে রইলাম আমরা তিনজন। পরিকল্পনা করা ছিল আগে থেকেই, আর আমাদের কেউই এক মুহূর্তের জন্যেও ভাবল না—টাকাগুলো আমরাই রেখে দেবো। পরিকল্পনার শেষ অংশটুকু বদলানোর কথা বলল না কেউই। গ্যাব্রিয়েল ওলোন্দ্রিজ নামের মানুষটার কথা জানার আগেই আমরা জানতাম যে টাকাগুলো আমাদের নয়। গার্দোর মুখ থেকে যা শুনেছি তাতে বুঝতে পেরেছি লোকটা একজন সত্যিকারের ভালো মানুষ ছিল। আজ অল সোলস' নাইট, আর আমি বিশ্বাস করতে চাইলাম যে সে-ও ছিল ওখানে, আমাদের সাথে! আমার ধারণা, হোসে অ্যাঞ্জেলিকোর হাত ধরে ওখান থেকে বাকি পথটুকু আমাদের এগিয়ে দিয়েছে সে।

জুন-এখন থেকে আর র্যাট নয়। আমার নাম জুন-জুন।

ওরা দুজন ঠিক করেছে যে গল্পের শেষ অংশটা আমি বলব-হয়তো শেষ অংশটুকু আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়েছে বলেই। তবে এ নিয়ে দুজনের তর্ক হয়ে গেছে-গার্দো বলছে এটা ওর বুদ্ধি ছিল। কারণ আমাদের মধ্যে কেবল ওর সাথেই মি. গ্যাব্রিয়েলের দেখা হয়েছে, কিন্তু শুধু আমিই জানতাম যে কাজটা কিভাবে করতে হবে। আর আমি যেখানে থাকি তার উপর থেকেই করা হয়েছে কাজটা।

তাছাড়া, রাফায়েল-গল্পের পুরো প্রথম অংশটুকু তো ওর ভাগেই ছিল। আর ও নিশ্চয়ই জানে যে গল্পটা একসাথে বলতে হবে আমাদের, কারণ আমরা এখন একই দলের সদস্য। শেষ পর্যন্ত কার কি আসে যায়, যখন মূল কথাটা হচ্ছে-সব কিছু আমরা একসাথে করেছি?

নিজেদের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়েছে আমাদের; একই প্রশ্ন ঘুরে ফিরে এসেছে বারবার : ষাট লক্ষ ডলার দিয়ে কি করা যায়? কিভাবে খরচ করব টাকাগুলো? কি করব এখন আমরা তিনজন? আগামীকাল সকালে ব্যাংকে গিয়ে বলব টাকাগুলো একটা সেফ-এর মধ্যে রেখে দিতে? নাকি অন্য কোথাও মাটি চাপা দিয়ে রাখব?

তবে একটা ব্যাপার নিশ্চিত জানতাম তিনজনই-টাকাগুলো থাকবে না আমাদের কাছে। ষাট লক্ষ কেন, এক লক্ষ ডলারও নিজেদের কাছে রাখতে পারার কোন সম্ভাবনা নেই আমাদের। তাই ঠিক করলাম, টাকাটা বেহালায় নিয়ে যাব আমরা, তারপর ফেলে দেবো ভাগাড়ে; যাতে অন্য কেউ কুড়িয়ে পায়।

হয়তো ব্র্যাডির প্রভাবেই বলেছিলাম কথাটা। কিন্তু আমার মনে আছে, কথাটা শুনে হেসে উঠেছিল ওরা দুজন। নিজেদের দিকে তাকিয়ে হাসতে শুরু করেছিলাম আমরা।

কফিন থেকে সব টাকা বের করে বস্তার প্লাস্টিকের শিটে ভরলাম। হোসে অ্যাঞ্জেলিকোর টাকা; সিনেটর ভাইস প্রেসিডেন্টের দুর্নীতির টাকা, যে

টাকা সে তার দেশেরই মানুষের ভাগ থেকে মেরে দিয়েছে। বস্তা আর প্লাস্টিকের শিটের মুখ বেঁধে পিঠে তুলে নিলাম সেগুলো। গোরস্থানের গেটে পাহারা থাকতে পারে...এই শহরের সব দরজাতেই পাহারা থাকে। তাই দেয়াল টপকে বের হয়ে এলাম গোরস্থান থেকে। তার আগে অবশ্য পিয়াকে নিয়ে আসতে ভুললাম না। ঘুমে বিভোর হয়ে ছিল ও, তাই ওকে পিঠে তুলে নিতে হলো। গার্দো নিল একটা বস্তা, আর রাফায়েল অন্যটা। ঝোড়ো বাতাসের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললাম আমরা। একঘেয়ে কান্নার মতো সুর তুলে বইছে বাতাস, রাস্তার ময়লাগুলো উড়ছে তাতে।

কার সাথে দেখা হলো পথে? কয়েকটা ছোট ছোট ছেলে, রাতের রাস্তায় একটা গাড়ি নিয়ে ময়লা ঘেটে বেড়াচ্ছে। ওদের একটা নোট দেখাল গার্দো, সাথে সাথে জাদুমন্ত্রের মতো কাজ হলো। আধ মিনিটের মধ্যেই আমাদের বস্তাগুলো আর পিয়াকে তুলে নিলাম গাড়িতে, তারপর প্যাডেল মেরে এগিয়ে চললাম। গান ধরেছি গলা ছেড়ে। এক দল ময়লা কুড়ানো ছেলেকে রাতের বেলা কে অনুসরণ করতে যাবে? পথে একটা পুলিশের গাড়ির সাথে দেখা হলো, সেটাকে উদ্দেশ্য করে এমনকি হাতও নাড়লাম আমরা। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে বেশ আগেই, নির্জন রাস্তায় আর কোনো মানুষ নেই। শুধু ঝড়ের বাতাসকে সঙ্গি করে নিস্তব্ধ রাস্তা পেরিয়ে চললাম, যতক্ষণ না বেহালায় যাওয়ার রাস্তাটা চোখে পড়ল। এবার পিয়াকে সিটে বসিয়ে আমরা ঠেলতে শুরু করলাম গাড়িটা, যত জোরে পারি দৌড়াচ্ছি। হাসছে পিয়া।

পুলিশের গাড়ি দেখা গেল না আর কোনো-কিন্তু তাই বলে ঝুঁকি নিলাম না আমরা। সঙ্গি হওয়া ছেলেগুলোকে বিদায় জানিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চললাম খালের পাশ দিয়ে।

প্রথমেই গেলাম মিশন স্কুলে। বড় এক মুঠো নোট তুলে নিয়ে ভরলাম শার্টের ভেতর, তারপর গার্দো যা বলেছিল ঠিক তাই করলাম। স্কুলের কোণ দিয়ে চলে এলাম পেছন দিকটায়, তারপর জানালার গরদ দিয়ে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। মনে হচ্ছে আমার প্রিয় বন্ধু, ফাদার হুনিয়ার্ড এখনও জানালাগুলো ঠিক করেনি, কারণ ঢুকতে কোনো অসুবিধে হলো না। আপনি হয়তো আশা করছিলেন যে, আমি ফিরে আসব, ফাদার হুনিয়ার্ড-কিছু মনে করবেন না, মজা করছি। টাকাগুলো তার টেবিলের উপর রাখলাম আমি, তারপর একটা কলম টেনে নিলাম। নিজের নাম ছাড়া আর কিছু লিখতে

পারি না, তাই অনেকগুলো ফুল আঁকলাম যত তাড়াতাড়ি পারি। তারপরই একটা দারুণ বুদ্ধি এল আমার মাথায়। কে জানে, হয়তো এই বুদ্ধিটাই পরে আমাদের সবাইকে বাঁচিয়েছিল। গার্দো বলে যে আমি নাকি শুধু বড়াই ছাড়া আর কিছু পারি না। এটা ঠিক যে, আমাদের সবার মাথা থেকেই কখনও না কখনও দারুণ সব বুদ্ধি বেরিয়েছে। কিন্তু এই বুদ্ধিটা ছিল খাঁটি, তা না হলে সকালবেলা কিভাবে সবার নজর এড়াতাম আমরা?

বুদ্ধিটা কিভাবে এল আমার মাথায় জানি না। হয়তো ভবিষ্যতের চিন্তা করতে করতে আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে, অথবা গ্যাব্রিয়েল আর হোসে হয়তো এখনও আছে আমাদের সাথে—হয়তো গাড়িটা ঠেলার সময় ওরাও আমাদের সাহায্য করছিল। অথবা এমনও হতে পারে যে কাপবোর্ডটা চোখে পড়ার পরেই বুদ্ধিটা এসেছিল মাথায়। এটা ফাদার হুলিয়ার্ডের অফিস, আর নানা রকমের জিনিসপত্রে তার কাপবোর্ডগুলো ভর্তি। তার মধ্যে একটার ভেতর থরে থরে সাজানো আছে স্কুলের ইউনিফর্ম।

ছোট ছোট শার্ট, আর হাফপ্যান্ট! বেশ কয়েক বছর আগে এক দাতব্য সংস্থার পক্ষ থেকে ওগুলো দান করা হয়েছিল আমাদের, যারা ভেবেছিল যে স্কুলের সবাইকেই একই রকম দেখানো উচিত। কিন্তু তাদের সেই আশা আর বাস্তবায়িত হয়নি। আমাদের স্কুলটাকে আসল স্কুলের মতো দেখানোর উদ্দেশ্যে কম করেও শ খানেক সাদা শার্ট, শ খানেক নীল হাফপ্যান্ট, আর শ খানেক আনুষঙ্গিক কাপড় দিয়েছিল ওরা। ছোট ছোট প্যাকেটে ভর্তি সব, আর ছোট ছোট স্লিপারও আছে সেগুলোর পাশাপাশি। সেই সাথে আছে ব্যাকপ্যাক, যেগুলোর মধ্যে স্কুলের ছেলেমেয়েরা তাদের বই রাখে। কিন্তু এখানে বইয়ের সংখ্যা খুবই কম! এখানকার ছেলেদের কাছে ময়লা ছাড়া আর তেমন কিছুই বহন করার যোগ্য নয়। ব্যাকপ্যাকগুলোর উপর সেই সংস্থার নাম লেখা বড় বড় অক্ষরে, যাতে কেউ কখনও তাদের দানশীলতার কথা ভুলে না যায়।

সবগুলো কয়েকটা করে তুলে নিলাম আমি, তারপর ফেলে দিলাম জানালা দিয়ে। তারপর সেগুলোকে অনুসরণ করে নেমে এলাম নিচে। কারও কোনো কথা বলার দরকার হলো না—আমরা সবাই জানি এবার কোথায় যেতে হবে।

প্রথমে চারটে ব্যাকপ্যাক খুলে সেগুলোতে ডলার ভর্তি করলাম। তারপর চেইন টেনে বন্ধ করে দিলাম মুখ।

তারপর বাকি যা ছিল সেগুলোর দিকে নজর দিলাম। বেশিরভাগই পড়ে রয়েছে এখনও। প্রত্যেকটা বাভিল থেকে কাগজের ব্যান্ড খুলে ফেললাম আমরা-যেগুলো দিয়ে এক শ ডলারের নোটগুলো বেঁধে রাখা হয়েছিল। বাতাসে উড়তে শুরু করল টাকাগুলো, তাই আবার বস্তায় ভরে মুখ বেঁধে ফেললাম। ঝোড়ো বাতাসে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে আবর্জনার পাহাড়। ধুলো আর ময়লা উড়ছে চারপাশে, ঘুরপাক খাচ্ছে। প্লাস্টিকের ছাদ দেয়া কুঁড়েঘরগুলো ফড়ফড় আওয়াজ তুলেছে, ধাতব শিট বাড়ি খাওয়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। আকাশে আলো বলতে প্রায় কিছুই নেই-শুধু ডক ক্রেনগুলোর দিক থেকে হালকা আলোর আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু এখনও কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি, তাই কেউ আমাদের দেখতে পেল না। ভোর হতে আর দশ কি পনেরো মিনিটের মতো বাকি। তারপরই অশরীরি আত্মারা বিদায় জানিয়ে ফিরে যাবে তাদের নিজের ঠিকানায়। সব কিছু আমার পুরনো বাড়িতে নিয়ে এলাম আমরা-সেই ভাঙা বেন্টটার কাছে, যার নাম্বার হলো চোদ্দ। বিশাল এক আঙুলের মতো আকাশের দিকে তাক করে দাঁড়িয়ে আছে যার অবশিষ্ট অংশ।

ভাববেন না যে আমার বন্ধু হুঁদুরগুলোর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম! পিয়া রইল নিচে, কাপড় চোপড় আর ব্যাকপ্যাকগুলো নিয়ে। প্রথমে আমি উপরে উঠলাম, তারপর দড়িটা বেঁধে দিলাম উপরে। এরপর এলো গার্দো আর রাফায়েল। বস্তাদুটো সাথে করে নিয়ে এল ওরা। আরও উপরে উঠলাম আমি। বাতাস আরও বেড়েছে, আমার শার্ট পতপত করে উড়ছে পতাকার মতো। মনে হলো যেন জাহাজের মাস্তুলে চড়ে বসেছি আমি। পুরো কাঠামোটা দুলছে হালকা হালকা। প্রথম বাভিলটা একদম উপরে নিয়ে এলাম আমরা। এখান থেকে বেহালা ছাড়িয়ে, শহর ছাড়িয়ে, সেই সাগর পর্যন্ত দেখা যায়! তারপর রাফায়েল উঠে এল আমার পাশে, আনন্দে চিৎকার করছে। তার সাথে গলা মেলালাম আমিও। এবার মুঠো মুঠো নোট তুলে নিতে শুরু করলাম আমরা, আর উড়িয়ে দিতে লাগলাম বাতাসে। চারপাশে উড়ে যেতে শুরু করল টাকাগুলো। পরে জানতে পেরেছিলাম যে টাইফুনটার নাম হচ্ছে টেরেসে, আর এসেছিল দক্ষিণ চীনের দিক থেকে। পর দিন সকাল থেকেই শুরু হয়েছিল বৃষ্টি। তবে ওই মুহূর্তে কেবল উন্মত্ত বাতাস ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমাদের ছুঁড়ে দেয়া নোটগুলো নিয়ে লোফালুফি খেলতে লাগল বাতাস, তারপর উড়িয়ে নিয়ে গেল সর্বত্র।

একটু পরেই ব্যথা হয়ে গেল আমার হাত ।

চিৎকার করা বন্ধ করে দিল রাফায়েল, ক্লান্ত হয়ে গেছে। পরের বাডিলটা আরও আস্তে আস্তে উড়ালাম আমরা। একটু পর গার্দোও উঠে এল বেণ্টের উপর। ওর হাতগুলো আমাদের চাইতে শক্তিশালী, আর বাকি টাকাগুলো উড়িয়ে দিতে ও আমাদের সাহায্য করল। গার্দো উঠে আসার পর বাতাস বাড়ল আরও, ফ্রেন আঁকড়ে ধরে রাখতে হলো আমাদের। ঝড় বইছে চারপাশে, টাকার ঝড়। পঞ্চগন্না লক্ষ ডলার বাতাসে উড়িয়ে দিলাম আমরা, ময়লার পাহাড়ের উপর। বুনো উল্লাসে মেতে উঠে বাতাস সেই টাকাগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে গেল আমাদের বিশাল, সুন্দর, বিষন্ন শহরের মধ্যে।

আর সব টাকা ওড়ানো শেষ হয়ে যাওয়ার পর কি পেলাম? আরেকটা চিঠি, একদম নিচে রাখা ছিল। হোসে অ্যাঞ্জেলিকোর লেখা চিঠি। সেটা নিজের শার্টের মধ্যে ভরে রাখল গার্দো। বস্তাগুলো নিচে ফেলে দিলাম আমরা, তারপর নিজেরাও নেমে এলাম। মাথা ঘুরছিল আমাদের।

ব্যাকপ্যাকগুলোর পাশে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল পিয়া। কাপড়গুলো প্যাকেট থেকে বের করে এনেছে সে, তারপর প্যাকেটগুলো এক করে সেগুলোর উপর বসেছে। কাপড় বদলে নিলাম আমরা। স্কুলের ট্যাপ থেকে হাত মুখ ধুয়ে নিলাম, তারপর রওনা দিলাম বেহালা থেকে বের হওয়ার পথে।

অপেক্ষা করতে চেয়েছিলাম আমি, দেখতে চেয়েছিলাম। সকালবেলা প্রথম যে ছেলেটা ময়লা কুড়াতে আসবে, তার হাতে যখন স্ট্রপের বদলে একটা এক শ ডলারের নোট ধরা দেবে—তখন তার চেহারায় কেমন হয় দেখার খুব ইচ্ছা ছিল আমার। কিন্তু গার্দো কিছুতেই রাজি হলো না। আর আমিও এত দিনে শিখে গেছি যে গার্দো কোনো কিছুতে না বললে তার বিরোধিতা করা কখনও ঠিক হবে না।

রাফায়েল কয়েকজনের কাছে বিদায় শিখে চেয়েছিল, গার্দোও তাই। কিছুক্ষণ দোটানায় ভুগতে দেখলাম ওদের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা সম্ভবত উপলব্ধি করল যে কখনও কখনও বিদায় না নিয়ে চলে যাওয়াই ভাল। আর কোনো উপায় নেই আমাদের। গার্দো ওর হাতটা রাখল রাফায়েলের কাঁধে, তারপর এগিয়ে চলল।

একটা ট্রেন ধরতে হবে বলে জানাল গার্দো। তাই করলাম আমরা।

রাফায়েল, গার্দো, জুন, পিয়া।

সবাই মিলে লিখছি শেষ অধ্যায়টা।

ধন্যবাদ, ফাদার হুলিয়ার্ড এবং সিস্টার অলিভিয়া। আপনাকে ধন্যবাদ গ্রেস, আর আপনাকেও-মি. গঞ্জ, এই গল্পটা বলায় সাহায্য করার জন্য। শেষে চলে এসেছি আমরা, যেখান থেকে শুরু করেছিলাম প্রায় সেখানেই আবার-ট্রেন ধরতে যাচ্ছি...

বেহালার দক্ষিণ ঘিরে যে মোড়টা সেখানে ট্রেন ধরলাম আমরা। গতি কমে আসে বেশ এখানে। হ্যাঁ। তিনটে স্কুলের ছেলে আমরা, আর একটা মেয়ে-জানালা দিয়ে উঠে পড়লাম ভেতরে। খুব বেশি মানুষ নেই ভেতরে। কিন্তু সেন্ট্রালে অনেক ছেলেমেয়ে উঠল, বেশিরভাগের গায়ে আমাদের মতোই পোশাক। শেষ পেসোগুলো দিয়ে টিকেট কিনলাম আমরা।

ওদের মতো আমাদের কাছেও স্কুল ব্যাগ। ওদের ব্যাগে বই, আমাদের ব্যাগে ডলার। একটু পরেই স্কুলের জন্য নামতে শুরু করল সবাই। আমরাও চললাম তাদের সাথে।

সামপালো অনেক দূর। কিন্তু সেখানে পৌঁছাবই, জানতাম। রাতের মধ্য দিয়ে আমাদের নিয়ে চলল ট্রেন। ভোর হওয়ার ঠিক আগে আগে নামিয়ে দিল ফেরি ঘাটে। নয় ঘন্টা সাগর পাড়ি দিয়ে ফোর্ট বার্টন নামের একটা ছোট্ট জায়গায় পৌঁছালাম। সেখান থেকে বাসে চড়ে পাড়ি দিলাম পূর্ব উপকূল পর্যন্ত। সেখান থেকে সাইকেল রিকশায় জেটিতে, আরেকটা ছোট্ট নৌকায় আরও কিছু দূর-যেখানে পানির রঙ বদলে গেছে, গাঢ় নীল-নিচে সব কিছু দেখা যায়। স্বর্গ।

শেষ পর্যন্ত সৈকতে নামলাম আমরা, হাঁটছি।

হ্যাঁ। একটু হাঁটলেই মাটি এখানে বদলে যায় সাদা বালিতে। সৃষ্টির সবচেয়ে সুন্দর একটা জায়গায় চলে এসেছি আমরা।

সে বেশ আগের কথা। তারপর নৌকা কিনেছি আমরা, মাছ ধরতে শিখেছি। সত্যি কথাটা বলতে পারি, কারণ মিথ্যে বলার সময় শেষ হয়েছে। সারা জীবন মাছ ধরব আমরা, সুখে থাকব। এটাই আমাদের ইচ্ছা। কেউ থামাতে পারবে না আমাদের।

সংযুক্তি

হোসে অ্যাঞ্জেলিকোর লেখা একটা চিঠি

যার জন্য প্রযোজ্য :

এই চিঠি যখন অন্য কারও হাতে যাবে তখন আমি মৃত, অথবা খুব তাড়াতাড়ি মারা যাব। এই টাকাগুলো আমি নিয়েছিলাম এই ভেবে যে টাকার সত্যিকার মালিকদের কাছে পৌঁছে দিতে পারব। কাজটা কিভাবে করব তাও ঠিক করে রেখেছিলাম। কিন্তু যদি মারা যাই তাই এই চিঠি লেখা। কারণ, আমাকে ওরা ধরতে পারলে বাঁচতে দেবে না।

আমার মেয়ের নাম পিয়া দান্তে অ্যাঞ্জেলিকো। পৃথিবীতে কেউ থাকবে না ওর। আপনার কাছে কি এই অনুগ্রহটুকু পেতে পারি-ওকে সাহায্য করবেন আপনি, নিরাপদে রাখবেন? ও আর সব শিশুর মতোই নিষ্পাপ। ওকে বিপদে ফেলছি আমি, জানি। পিয়া, যদি কখনও এই চিঠি দেখে তাহলে জেনো যে আমার লক্ষ্য ছিল সাধারণ। আমি যা করেছি, তুমি এবং তোমার মতো আর সব শিশুর কথা ভেবে করেছি। যে দিন থেকে আমি মি. গ্যাব্রিয়েল ওলোন্দ্রিজকে জেনেছি-আর সেটা ছিল আমার অনেক ছোটবেলার কথা-সে দিনই আমার মধ্যে একটা আগুন তৈরি হয়েছে। যে আগুন তিনি আরও অনেকের মধ্যেই জ্বালিয়েছিলেন। আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন তিনি। কিন্তু সবচেয়ে বেশি জানিয়েছেন সিনেটর জাপান্টার অপরাধের কথা। যে অপরাধ উন্মোচনের দায়ে তাকে জেলে পাঠানো হয়েছিল। ভয়ঙ্কর সেই অপরাধ। একটি জাতিকে মাঝপথে থমকে দিয়েছে সিনেটর জাপান্টা। আমাদের দেশের উন্নতি থামিয়ে দিয়েছে। তার চাইতেও খারাপ যেটা-অন্য দেশকেও অযুহাত দিয়েছে আমাদের সাহায্য না করার। যত লক্ষ টাকা সে চুরি করেছে, তার চেয়েও বেশি টাকার সাহায্য বন্ধ হয়ে

গেছে তার কারণে। আর তার চাইতে অনেক, অনেক বেশি খারাপ যেটা-অন্য রাজনীতিবিদ, কর্মকর্তা, কেরানি, শিক্ষক, দোকানদার, প্রতিবেশিদের সে শিখিয়েছে, চুরি করা মানাই উন্নতি। আর গরীবের মুখে পা দিয়ে উপরে ওঠা হলো স্বাভাবিক নিয়ম। এমনকি গরীবরাও তাই বিশ্বাস করে, আর সে জন্যই আমরা গরীব রয়ে যাচ্ছি।

পিয়া, অপেক্ষা করতে করতে আমি ক্লান্ত। সেন্ট ম্যাথিউয়ের একটা কথা আছে, ‘কড়া নাড়ো, দরজা খুলে যাবে’-হয়তো বিধাতার জন্য কথাটা সত্যি। কিন্তু মানুষের জন্য নয়। তালা চাবি দিয়ে বন্ধ করা রয়েছে সব, আমি দেখেছি। আমাদের সারা জীবন দরজা বন্ধই থাকে। সে জন্যই নিজের জীবন উৎসর্গ করছি সিনেটর জাপান্টার চাকরিতে, এই আশায় যে, এক দিন সে তার দরজা খোলা রেখেই চলে যাবে। আর ভেতরে ঢুকব আমি।

অনেক বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে আমাকে। তাই সরাসরি খুলে বলছি সব, কোনো রহস্য না রেখে। যাতে তুমি জানতে পারো যে আমাদের সব যারা কেড়ে নিয়েছে, তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া কত সহজ।

সিনেটর জাপান্টা একজন ভীতু লোক। মুখে নকল হাসি ঝুলিয়ে রাখে, কিন্তু মাথায় চলতে থাকে দুশ্চিন্তা। বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার। ব্যাংক জিনিসটা দুই চোখে দেখতে পারে না। তার বাবার অনেক টাকা মার গিয়েছিল এক ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যাওয়ায়। তাই সিনেটর জাপান্টা শুধু নগদে ভরসা করে। সে জন্যই নিজের বাড়ির বেসমেন্টে একটা ভল্ট বানিয়েছে সে। সব পাপের টাকা গিয়ে জমা হয় ওই ভল্টে।

নিচের ভল্ট থেকে উপরের আরও ছোট একটা ভল্টে টাকা এনে রাখে সিনেটর জাপান্টা। একবারে বেশি টাকা আনে না, আর নিচের ভল্টে তালা মেরে রাখে সব সময়। একটা চাবি লাগে, আর একটা কন্সিনেরাম। আমি কিভাবে জানলাম? কারণ আমাকে বিশ্বাস করত জাপান্টা, দুটোই জানিয়েছিল আমাকে। বিশ্বাস ছাড়া বেঁচে থাকা কঠিন আর ক্লান্তিকর। আমার মিষ্টি, বোকা বোকা আচরণকে বিশ্বাস করেছিল সে। হাসিমুখে তার হুকুম পালন করতাম আমি। বাধ্যগত কর্মচারি হয়ে থাকেছি আমি অনেক বছর। কোনো কাজে কখনও ব্যর্থ হইনি। সে জন্যই তার কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি আমি। সিনেটর জাপান্টার একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছি, যাকে সে বিশ্বাস করত।

আট বছর আগে আমাকে নিচের ভল্টে প্রথম নিয়ে যায় সে। দরজাটা

ধাতব, আর এত ভারি যে চাকা লাগে খুলতে। ঘরের ভেতর তালামারা বাস্র আছে অনেকগুলো। তবে টাকাগুলো রাখা থাকে শেলফে, বাভিল করে। আসে আর যায় ওগুলো। আমাকে বলেছিল, এখানে বরাবর ষাট লক্ষ রাখতে পছন্দ করে সে, কারণ শেলফগুলো সব ভরতে ষাট লক্ষ ডলারই লাগে। যখন টাকা ফুরিয়ে আসে তখন ব্যাংক থেকে আবার টাকা নিয়ে আসে। প্রথমে সব সময় সাথে নিয়ে যেত আমাকে। তারপর এক দিন-তিন বছর আগে-আমাকে চাবি আর কম্বিনেশন দিয়ে একা নিচে পাঠায়। প্রতিবারই অবশ্য আমি ফিরে আসার পর কম্বিনেশন বদলে ফেলত সে, যাতে অনুমতি ছাড়া কখনও যেতে না পারি আমি। পরে জানতে পারি, শুধু পাঁচটা কম্বিনেশন ব্যবহার করে সে। পাঁচ ছেলে আছে তার, তাদের পাঁচজনের জন্মদিন। সে ভেবেছিল আমি এত বোকা যে সংখ্যাগুলো মনে রাখতে পারব না। আর চাবিটা বাড়ির বাইরে না নিয়ে গিয়ে কপি করা সম্ভব নয়। কিন্তু সে ভাবতেও পারেনি আমার ঘরে আমি নোট রাখতাম, মুখস্ত করতাম। এভাবেই এক সময় সংখ্যাগুলো মিলিয়ে ফেলি। পিয়া, কেউ যাতে জানতে না পারে সে জন্য নোটগুলো পুড়িয়ে ফেলেছি আমি। গ্যাব্রিয়েল ওলোন্দ্রিজের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েছি যে এসব রেখে দেয়া উচিত নয়।

চাবির ব্যাপারটা ঠিকই ধরেছিল সে, কিন্তু ভাবতে পারেনি তার হাউসবয় চাবির নকশাটা কাগজে ঐঁকে নিয়ে যাবে। তালচাবির মিস্ত্রির কাছ থেকে সেই চাবির নকল বানাই আমি। জাপান্টা এটাও ভাবেনি, ওই নকল চাবি দিয়ে ভল্ট খুলতে ব্যর্থ হয়েও আমি হাল ছাড়ব না। বারবার নকশা একেছি আমি, তারপর সেগুলোকে দলা পাকিয়ে ময়লা হিসেবে নিয়ে গেছি বাইরে। আমার পালক পিতার মতো আমিও সুদীর্ঘ সময় পেয়েছি পরিকল্পনা সাজানোর। আমি, হোসে অ্যাঞ্জেলিকো চিন্তা করতাম বছরের হিসাবে, দিন বা ঘন্টার হিসাবে নয়। ষোলবার এভাবে নকল চাবি দিয়ে চেষ্টা করার পর সাফল্য ধরা দেয় আমার হাতে। তারপর ছিল শুধু সঠিক পরিস্থিতির অপেক্ষা। সিনেটর জাপান্টা যখন তিন মাসের জন্য ইউরোপে যাওয়ার কথা বলল, তখনই সুযোগ বুঝে নিলাম আমি। বাড়িতে কর্মচারির সংখ্যা তখন কমে গেল। কয়েকটা ঘরের মেরামত আর নতুন কয়েকটা সাজানোর কাজ শুরু হলো-যার অর্থ হলো, প্রচুর বাইরের লোক আসা যাওয়া করবে তখন। চাকরদের অংশে থাকা ফ্রিজটা নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করলাম আমি। দুইবার ভেঙে রাখলাম থার্মোস্ট্যাটটা, আর নিজেই ঠিক করলাম প্রতিবার।

যখন একজন বলল, মিস্ত্রি ডাকা দরকার, আমি বললাম, ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছি আমি, নতুন একটা কিনে আনব-নিজের বেতন থেকেই। হাউসকিপার বলছিল সে বাড়ির খরচ থেকে ওটা কেনার চেষ্টা করবে। কিন্তু আমি বললাম, এই গরম দেশে একটা ভালো ফ্রিজ থাকা খুব দরকার, তাই আর অপেক্ষা করতে রাজি নই।

হাউসকিপার আমাকে বিশ্বাস করত। গার্ডরাও আমাকে বিশ্বাস করত। আমার সবচেয়ে বড় চিন্তাটা ছিল যে ফ্রিজটা একবার টাকা দিয়ে ভর্তি করার পর যখন বের হবো, গেটে থামিয়ে তল্লাশী করা হবে আমাদের-সব সময়ই করা হয়। কিন্তু আমার, হোসে অ্যাঞ্জেলিকোর কাছে সব কাগজপত্র তৈরি ছিল। সারা সকাল ধরে অনেকগুলো ডেলিভারির গাড়ি এসেছে আর গেছে। ফ্রিজটাকে প্লাস্টিক দিয়ে মুড়ে বেঁধে নিয়েছিলাম আমি। শেষ পর্যন্ত নির্বিঘ্নে শেষ হলো সব।

ভল্ট থেকে ফ্রিজ পর্যন্ত টাকাগুলো এনেছিলাম কিভাবে? দুবার যেতে আসতে হয়েছিল। বৃহস্পতিবার দিনটা বেছে নিয়েছিলাম আমি। বাড়ির সব আবর্জনা জড়ো করে রেখেছিলাম ময়লার ট্রাক আসার জন্য। হাউসবয় লোকটাকে কয়েক ব্যাগ ভর্তি আবর্জনা টেনে নিতে দেখে কেউ সন্দেহ করেনি-বিশেষ করে চারপাশে যখন মিস্ত্রিরা হাজার রকমের জঞ্জাল ছড়াচ্ছে। সিনেটর জাপান্টা যখন জানতে পারবে যে কত সহজে তার ষাট লক্ষ ডলার চুরি হয়ে গেছে, নিশ্চয়ই তীব্র আতর্নাদ করে উঠবে সে। মনে রেখো, পিয়া-আর মনে রাখবেন, সিনেটর-আমার বিরুদ্ধে যাই বলা হোক না কেন, আমি চোর নই। আমি শুধু আমাদের টাকা ফিরিয়ে নিয়েছি। সেই টাকা এখন রেখে দিচ্ছি এই কফিনে।

একটা বিকল্প রাস্তা অবশ্যই রেখে দিয়েছি আমি। যদি এই পথে চলেন আপনি, তাহলে তা সম্ভব হবে শুধু মি. ওলেন্ড্রিজের সহায়তায়। তাই আশা করছি, আপনি আমার বন্ধু। ১০১ নাম্বার বক্সে রাখা থাকবে তার কাছে আমার শেষ চিঠি, সেই সাথে নির্দেশনা-যদি শুধু তিনিই বুঝতে পারবেন। বক্স খোলার চাবি থাকবে আমার কাছে।

বড় ক্লান্ত আমি।

কফিনটা তোমার নামের একটা কবরে রেখে যাচ্ছি আমি, পিয়া। যাদের কাছ থেকে এই টাকা চুরি করা হয়েছে, তাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার ইচ্ছা আমার। কিন্তু কেউ যদি এই চিঠিটা পড়ে তাহলে বুঝতে হবে যে

আমি খুব সম্ভবত আর বেঁচে নেই। আর টাকাগুলো চলে গেছে ওদের হাতে। সেক্ষেত্রে শুধু এটুকুই বলতে পারি, ‘সাবধান, কারণ এই টাকা দরিদ্রদের। এই কথাকে অবজ্ঞা করার কোনো সুযোগ নেই।’

ডে অফ দ্য ডেড ক্রমেই এগিয়ে আসছে। আবার দেখা হবে আমাদের, পিয়া দাস্তে, সবচেয়ে উজ্জ্বল আলোয়।

আমার কাজ সমাপ্ত হলো।

...